গল্পসংগ্রহ

(২য় খণ্ড)

প্রতিভা বসু

সমকাল প্রকাশনী

৮/২এ গোয়ালটুলি লেন,

কলকাতা-৭০০০১৩

প্রথম প্রকাশ :
ডিসেম্বর : ১৯৬৫
অগ্রহায়ণ : ১৩৭২

প্রকাশক :
প্রসূন কুমার বসু
সমকাল প্রকাশনী
৮/২এ, গোয়ালটুলি লেন
কলকাতা-৭০০০১৩

মুদ্রাকর :
মানসী প্রেস
৭৩, মানিকতলা স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬

মল্লিকাকে

সূচী

প্রতিভূ	...	৯
ভালোবাসার জন্ম	...	২১
ঘাস মাটি	...	৩৪
বিকেল বেলা	...	৪৪
স্বর্গের শেষ ধাপ	...	৫৪
রূপান্তর	...	৬৮
খণ্ড কাব্য	...	৭৯
বিচিত্র হৃদয়	...	৮৮
অন্তহীন	..	১০৭
স্বামী-স্ত্রী	..	১৩১
ইষ্টিশনের মিষ্টি ফুল	...	১৪৫
সেইদিন সকালে	...	১৫৪
গুণীজনোচিত	...	১৬৩
উৎস	...	১৭২
শব্দব্রহ্ম	...	২০৯
নিখাদ সোনা	...	২১৭
আয়না	...	২৪৭

প্রতিভূ

একদিন সন্ধ্যাবেলা এক ভদ্রমহিলা বেড়াতে এলেন আমাদের বাড়ি। মাথার চুল এতো সাদা হয়ে গেছে যে, প্রথমটায় চিনতে পারিনি, একটু পরেই ও, আপনি? বলে তাড়াতাড়ি আদর-যত্ন করে বসালাম, কক্ষান্তরে গিয়ে চায়ের জল চাপাতে বলে মিষ্টি আনতে দিলাম।

মহিলাটি বললেন, প্রায় দশ বছর বাদে, না?

আমি বললাম, তা তো হবেই।

তোমার চেহারা তো ঠিক আগের মতোই আছে।

হেসে বললাম, আপনার চুল ছাড়া আপনিও প্রায় তেমনি আছেন।

ঠিক তেমনি?

পাড়-ছাড়া কাপড়ে অবশ্য এই প্রথম দেখছি।

বড়ো ছেলের বিয়ে দিয়েই এটা ধরলাম। তারপরে বুলির বিয়ে হলো, রঞ্জনের বিয়ে হলো—

সবাই কলকাতায় আছে তো?

কেউ না। আমি নিতান্তই নিঃসঙ্গ। দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, ছোট্ট একটা বাড়ি করেছি নিউ আলিপুরে, একা থাকি।

ওঁরা কে কোথায় আছেন?

বড়োটি পুণায়, ছোটটি জলপাইগুড়ি, মেয়ে দিল্লিতে।

সবাই দেখছি খুব দূরে দূরে। যান না মাঝে মাঝে?

যাই, কিন্তু থাকি না।

ঘুরে ঘুরে থাকলে পারেন, তা হলে এতো একা একা লাগে না।

একটু হাসলেন। যাদের নতুন জীবন, নতুন সংসার, পুরোনো মানুষ সব সময়েই সেখানে অবান্তর। এক গ্লাশ জল দেবে?

নিশ্চয়ই।

জল এনে দিলাম। খেয়ে গ্লাশটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, তোমার 'সংগ সুধা' গল্পটা আমি পড়েছি।

বলামাত্রই আমার ত্রাস হলো, জানি, এরপর তিনি কী বলবেন।

তোমার তো ঐ একটাই বিষয়—প্রেম।

আপনার জন্য চা করে নিয়ে আসি আমি ওঠবার চেষ্টা করেছিলাম, তিনি বসিয়ে দিলেন, চা পরে হবে, কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই যে, গল্পটায় তুমি যা লিখেছ তা কি সত্যি বিশ্বাস করো?

আমি আমতা-আমতা করছিলাম। আমার লেখা নিয়ে চিরকাল আমি এঁর কাছে তিরস্কৃত। অনেকবার অনেক গল্প বা উপন্যাস পড়ে উত্তেজিত হয়ে তিনি ছুটে এসেছেন, মুখ লাল করে বলেছেন, হাজার হোক, তুমি তো একজন মেয়ে, তোমার হাত দিয়ে কী করে এই সব অসংগত অন্যায় ভালোবাসার গল্প বেরিয়ে আসে, ছি! এ রীতিমতো সমাজবিরোধী কাজ, কতো মেয়ের এতে চরিত্র নষ্ট হতে পারে তা তুমি জানো?

আমার মুখটা তখন বোকা-বোকা হয়ে গেছে।

ভুরু কুঁচকে বলেছেন, মনে হয় তোমার জীবন খুব মসৃণ নয়, সত্য করে বলো দেখি কতো পুরুষের সঙ্গে প্রেম করেছ?

মিনমিন করে বলেছি, গল্প তো গল্পই, তার সঙ্গে কি নিজের জীবনের মিল থাকে কোনো?

থাকে। নিশ্চয়ই থাকে। অন্তত তোমার গল্প পড়লে নিশ্চিত বোঝা যায় সেটা। নইলে অত খুঁটিনাটি জানো কী করে? নায়ক-নায়িকার সংলাপ পড়তে পড়তে তো মনে হয় কাগজের পাতা থেকে বুঝি এখুনি উঠে আসবে। এ বয়সে আমাদেরই বুক কাঁপে।

সাহসভরে হাসি হাসি মুখ করে বলেছি, তাহলে বলুন ভালো লাগে আপনার, নইলে বুক কাঁপবে কেন?

ঐ জন্যেই তো বলছি নিজের অভিজ্ঞতা না থাকলে কেউ ও রকম লিখতে পারে!

ঠাট্টা নয়, আমার ধারণা উনি সত্যি আমাকে কখনো বোধ হয় খুব সচ্চরিত্র বলে ভাবতেন না। তবু আমি ভালোবাসতাম এই মহিলাটিকে। এক সময় আমরা প্রতিবেশী ছিলাম, বয়সে অনেকটা বড়ো হওয়া সত্ত্বেও অদ্ভুত একটা বন্ধুতার সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলাম। অল্প বয়সের বিধবা, কিছুটা যে পিউরিটান হবেনই এ তো ধরাধার্য, কিন্তু তার বাইরে—সঙ্গটা অতি লোভনীয় ছিলো। অনেক বই পড়তেন, রসিকতা করতেন, নিজের দুঃখ-বেদনা নিয়ে কখনো অন্যকে এতোটুকু বিব্রত করতেন না। থাকতেন ভায়েদের সংসারে, একমাত্র মোছামোছা পাড়ের শাড়ি পরা ছাড়া আর অন্য সব বিষয়েই বৈধব্যে নিষ্ঠাবতী ছিলেন। দেখতে সাধারণ হলেও শ্যামলা রংয়ের উপরে সুন্দর একটা সহজাত লালিত্য ছিলো।

পাড়া বদলে আসার পরও আসতেন তিনি, এবং যখনি আসতেন তখনি বুঝতাম কপালে আছে কিছু। কেননা, লক্ষ্য করে দেখেছি, যতোবারই এসেছেন, কোনো লেখা পড়ে উত্তেজিত হয়েই এসেছেন। এসেই তীরন্দাজ হয়ে শেলবিদ্ধ করেছেন। আমি রাগ করিনি, ওঁর পছন্দমতো বেশি দুধ চিনি দিয়ে চা করে উত্তেজনা প্রশমিত করেছি। তারপর লেখার প্রসঙ্গ চুকে গেলেই অন্য মানুষ।

সেদিনও চা মিষ্টি দিয়ে মুখ মিষ্টি করতে তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম। দশ বছর বাদে হলেও ভয় পেলুম। প্রবল ঢেউটা সামলাবার

জন্য অপেক্ষা করছিলুম। বললেন, বিলিতি স্ত্রী-পুরুষ নিয়ে তোমার আরো অনেক গল্প আমি পড়েছি, কিন্তু এদের একেবারে চরমে নিয়ে পেঁছে দিলে? শেষে একজন ষাট বছরের মহিলা একজন পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধকে বিবাহ করলো?

কান চুলকিয়ে বললুম, মানে, ঐ আর কী, এই বয়সে বিবাহের মানে তো—

একজন সঙ্গী, এই তো?

ঠিক তাই।

আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থেকে বললেন, তোমরা কদ্দিন বিদেশে ছিলে?

বললুম, তা মন্দ কী। বছর তিন-চার তো হবেই।

অনেক সাহেব-মেমদেব সঙ্গেই নিশ্চয় বন্ধুতা হয়েছে?

তা তো হয়েইছে।

এ-রকম দেখেছ বুঝি?

দেখেছি।

তা হলে আমার বয়সী মহিলাও সেখানে বিয়ে করে?

আপনার বয়সী একজন বন্ধুকে নিয়েই আমার ঐ গল্প।

বলেই ভয়ে-ভয়ে তাকালাম।

ভদ্রমহিলা হাসলেন, এখন আর কী করে বলি এটাও তোমার জীবনেব গল্প। তোমাব তো সে বয়েসে আসতে ঢের দেরি।

এই সময়ে আমার গৃহসেবিকা চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘবে ঢুকলো। আমি নিচু হয়ে চা ঢালতে লাগলাম। তিনি বললেন, দ্যাখো, আমি কিন্তু তোমার একজন ভক্ত পাঠিকা।

অ্যাঁ! হাত থেকে চা প্রায় ছলকে পড়েছিলো।

তোমাকে আমার একটা গল্প বলতে ইচ্ছে করছে।

বলুন না।

গল্পটা ব্যক্তিগত। শেষ বয়সের একটা স্বীকৃতিমাত্র। বিরক্ত লাগলে বোলো, থামিয়ে দেব।

আমি উৎসুক হলাম।

এক চুমুক চা খেলেন, থেমে থেকে বললেন, জানো তো সারাটা জীবন কীভাবে কাটালাম। স্বামী যখন মারা যান, আমার বয়েস মাত্র তেইশ। তার মধ্যেই তিন সন্তানের জননী। ম্যাট্রিক পাস করে বিয়ে হয়েছিলো, তারপর তো সব শিকেয় উঠেছে। স্বামী টাকাকড়ি কিছুই রেখে যেতে পারেননি, একটা লাইফ ইনসিওর করবো করবো ভাবছিলেন, ভগবান তার আগেই তুলে নিলেন। কাজেই শ্বশুর ভাসুর তৎক্ষণাৎ অলক্ষ্মী বলে বাপের বাড়ি ঠেলে দিলেন, আমিও বাপহীন বাপেরবাড়িতে গিয়ে দুই দাদার গলগ্রহ হয়ে বসলাম। বলাই বাহুল্য, কেউ আমাকে আদর করে জায়গা দেয়নি, নিতান্ত ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারেনি বলেই থাকতে দিয়েছে। খাওয়া

বিষয়েও ঠিক তাই। আমার আর কী! আমি তো একটা বিধবা মানুষ, মায়ের ভাতের সঙ্গে দুটি ভাত আর কিছু সেদ্ধ, তার উপরে উপোস-কাপাস তো লেগেই আছে, কিন্তু মুশকিল হতো বাচ্চাদের নিয়ে। তারা তো আর আমার মতো খিদে হজম করে থাকতে পারতো না? কাঁদতো। ছোটটাকে বুকের দুধেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করাতে চেষ্টা করতাম, বোঁটা টেনে ছিঁড়ে ফেলেও এতোটা খাদ্য সে পেতো না যাতে তার ঐ ছোট্ট পেটটুকুও ভরানো যায়।

আমি কারো দোষ দিচ্ছি না, সত্যি তো আমার পরিবার নেহাৎ ছোটো নয়? তিনটে বাচ্চা, একটা মা, চারটে পেট, ওঁরাই বা পারবেন কেন? সেজন্য আমি দিনরাত খাটতাম, ভাবতাম কাজের লোকটিকে তুলে দিলে সেটুকু তো ওদের সাশ্রয় হবে? তার মাইনেটা তো বাঁচবে? আর সে একা যা খেতো, তাতে আমাদের চারজনের পেট ভরে যাবে। আমার বড়ো ছেলেটা তখন পাঁচে পা দিয়েছে, মেয়েটা তিন, আর ছোট ছেলে মাস দশেকের।

কিন্তু তাতেও খুব সুরাহা হলো না, আমি কাউকেই খুশি করতে পারলাম না। অতিষ্ঠ হয়ে শেষে কাজের চেষ্টায় বেরুলাম। আমার মতো একজন যুবতী মেয়ের বেরুনো নিয়েও আপত্তি উঠেছিলো, সেটা আমি মানিনি, কেননা মানবার কোনো উপায়ই ছিলো না। ইস্কুলে ইস্কুলেই ঘুরতাম, আমাদের সময়ে ভদ্র মেয়েদের ঐ একটা পেশাই মাত্র ছিলো। আমি সেখানে একটা আয়ার কাজের জন্যও চেষ্টা করেছিলাম, হয়নি। একদিন দৈবাৎ একজন লাইফ ইনসিওরেন্সের ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এই ভদ্রলোকই আমার স্বামীকে ইনসিওর করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

আমার দুঃখ দৈন্য দেখে, সব শুনে উনি আমাকে ওঁদের কোম্পানিতে এজেন্ট হবার পরামর্শ দিলেন। সেই এজেন্সি নিয়ে পরিচিত, অর্ধ-পরিচিত, অপরিচিত, আত্মীয়-কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব, কোনো দরজাতেই ধরনা দিতে বাকি রাখিনি। সে যে কী কষ্ট, কী অপমান, আমি কেমন করে বোঝাবো! শেষে আমাকে দেখলে লোক আঁতকে উঠেছে। আমার গলায় দড়ি দিয়ে মরতে ইচ্ছে করতো, কিন্তু ঐ তিনটি পেটের শত্রুই তো ছিলো আমার আসল দড়ি, আমি আর পালাবো কোথায়?

এই করে করেই দু-চার বছরে আয় হতে লাগলো কিছু। অন্তত আমাদের খোরাকিটা আমি ভালোভাবেই আমার বউদিদের হাতে তুলে দিতে পারতাম। কিন্তু তাতেও তাঁরা সন্তুষ্ট ছিলেন না। বলতেন, জাতও গেছে পেটও ভরে না এমন কাজ করে লাভটা কী? দুঃখের সঙ্গী এক বৃদ্ধা মা, কিন্তু তাঁর আর কতোটুকু ক্ষমতা? তিনিও তো পরাধীন।

এই পাথারে ভাসতে ভাসতেই হঠাৎ একজনকে আমি একদিন ভালোবেসে ফেললাম।

আপনি ভালোবেসেছিলেন! আমি প্রায় চমকে উঠলাম এ কথা শুনে।

প্রায় ষাট বছর বয়সের মহিলাটি তাঁর চেয়ে অনেক কনিষ্ঠ আমার দিকে অপরাধী দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, খুব কি অন্যায়? খুব কি অসম্ভব?

তুমি তো এই, আমাদের মতো দুঃখিনীদের জীবনকেই আলোতে নিয়ে যাও। ভালোবাসার সততা নিয়েই তো তোমার কারবার, বলো, সে কি ভয়ানক একটা অবাস্তব ঘটনা আমার পক্ষে? জগৎ-সংসার থেকে আমি কতোটুকু পেয়েছি? বিয়ে হয়েছিলো ষোলো বছর বয়সে, তার পরের সাত বছরে এক দমকে তিন সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে, কোন সুখেব অমরাবতীতে আমি বাস করছিলুম?

তাইতো।

মানুষটির সঙ্গে আমার খুব অদ্ভুতভাবে চেনা হয়েছিলো। বোঝোই তো যে কাজ আমি নিয়েছি তাতে কেমন তাকে তাকে থাকতে হয়? সারাদিন কেবল কাকে ধরি আর কাকে ধরি এই চিন্তা। আসন না পেয়ে একদিন ট্রামে এই ছেলেটি লেডিস সীটে আমার পাশে বসেছিলো, চেহারাটি বেশ শিক্ষিত শিক্ষিত, চোখে মুখে বুদ্ধির ছাপ। একটু তাকিয়ে কেমন মনে হলো এর সঙ্গে একটা ছুতো ধরে পরিচয় করলে হয়। বয়েস অল্প আছে—ধরাপড়া করলে একটা ইনসিওর করলেও করতে পারে। কিন্তু কী-ভাবে আলাপটা শুরু করা যায় ভেবে পাই না। হঠাৎ গুরুগম্ভীব আওয়াজে সে নিজেই বললো আমার জন্য আপনাব বসতে অসুবিধে হচ্ছে না তো?

আমি বিগলিত হয়ে বললাম, কী আশ্চর্য! অসুবিধে কেন হবে?

সে বললো, অন্যমনস্কভাবে আপনার অনুমতি না নিয়েই বসে পড়েছিলুম।

বলতে যাচ্ছিলুম, তাতে কী হয়েছে? তার আগেই সে আমার দিকে ফিরে তাকালো, আমিও তাকালুম, সঙ্গে সঙ্গে বুকটা কেঁপে উঠলো আব মনে হলো আমাব একটা সর্বনাশ হয়ে গেল।

সর্বনাশ কেন?

সর্বনাশ নয়? আমি বিধবা না? আমার তিনটে বাচ্চা আছে না? পাপ-পুণ্য বলে একটা কথা আছে না?

পাপ-পুণ্য!

নিশ্চয়ই। আর তো কোনোদিন এরকম হয়নি? কতো তো ঘুরে ঘুরে কাজ করি। তাড়াতাড়ি রাস্তা দেখতে লাগলাম। বুকটা তখনো ধুকধুক কবছিলো। সেই আমার জীবনে প্রথম প্রেম অথবা প্রথম পাপ।

আমি হেসে বললাম, পাপ তো নয়ই, প্রথম প্রেমও নয়, তার আগে নিশ্চয়ই স্বামীর সঙ্গে প্রেম ছিলো?

তা ছিলো। তিনিও হাসলেন, তবে সে ছিলো জুটিয়ে দেয়া প্রেম। অবশ্য তাও কম খাঁটি ছিলো না। আমার স্বামীকে আমার খুব ভালো লেগেছিলো, কিন্তু তার মধ্যে তো কোনো বাধা-বিরোধ ছিলো না। আমার ধর্মই ছিলো তাঁকে ভালোবাসা। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের মিলন একটা বাধ্যতামূলক ঘটনা মাত্র। ঐ বয়সে স্ত্রী-পুরুষ মিলিত হলে শরীরে তো আগুন ধরবেই! অন্তত কয়েকদিন পর্যন্ত সে-আগুনের তাপ ঊর্ধ্বমুখী

থাকবেই। সেখানে মনের চেয়ে দেহের প্রশ্নই বেশি। আর তারপরে দুটো মানুষের স্বার্থসংঘাত, সন্তান, একত্র বসবাস সবটা মিলিয়ে এমন একটা আলাদা জগৎ তৈরি হয়ে যায় যে. সেটা প্রায় অবিচ্ছেদ্য হয়ে ওঠে। বলো ঠিক কিনা ?

আমি মনে মনে অতীতের সেই শুচিবায়ুগ্রস্তা বিধবাটির সঙ্গে এই মহিলাটিকে মেলাবার চেষ্টা করতে করতে বলি. একদিক থেকে সে তো ঠিকই।

তিনি চশমার কাচ মুছলেন। চা শেষ করলেন। বসবার ভঙ্গি বদলে নিয়ে বললেন, আসলে ভবিতব্য কেউ ঠেকাতে পারে না। মানুষের সাধ্য আর ভগবানের সাধ্য তো এক নয়? তিনি যা করেন তা হতেই হয়। সেদিন ওর সঙ্গে আমার যোগাযোগ হবারই দিন ছিলো, নইলে আমি যেখানে নামলাম. সেও কেন সেখানে নামলো ?

আমি বললাম. ওটা বোধ হয় উনি ইচ্ছে করেই নামলেন।

না। মোটেও না। মহিলা মাথা ঝাঁকালেন, সে আমার আগেই নেমেছিলো, ফিরেও তাকায়নি। কিন্তু খুব আশ্চর্য যে, সে যে গলিতে ঢুকলো, আমারও সেই গলিতেই কাজ ছিলো। একটু দূরে গিয়ে একটা একতলা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে এই প্রথম সে আমাকে লক্ষ্য করলো। আমার রকমসকম দেখে জিজ্ঞেস করলো. কোনো বাড়ি খুঁজছেন নাকি ?

অপ্রস্তুতভাবে বললাম, হ্যাঁ।

এখানকার নম্বর বড় গোলমেলে। কার বাড়ি বলুন তো ?

চোদ্দোর-এক-মহিমারঞ্জন সেন।

ও. মহিমবাবু। কিন্তু ওঁরা তো কেউ নেই এখানে, ওঁর মৃত্যুর পরে ওঁর পরিবার তাঁর পিত্রালয়ে চলে গেছেন।

মহিমবাবু মারা গেছেন ? আমি একেবারে থ। দিন কয়েক আগে এই নাম-ঠিকানা আমার এক আত্মীয়া আমাকে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, মস্ত চাকরি করেন, নিজের দুঃখ-দুর্দশার কথা বলে যদি তেমন ধরে পড়তে পারো, বেশ মোটারকম ইনসিওর করবেন দেখো। ছোটো ছেলেটার অসুখ ছিলো. আসতে পারিনি, এর মধ্যেই মরে গেল লোকটা ! আমি একেবারে শোকের পাথারে ভেসে গেলাম।

ছেলেটি বললো, আপনার আত্মীয় ছিলেন ?

বললাম, না।

বন্ধু ?

তখন বললাম, দেখুন, আমি ইনসিওরেন্সের এজেন্সি করি, উনি করবেন এরকম একটা খবর পেয়ে এসেছিলাম, এই মৃত্যু আমি কল্পনাও করতে পারিনি।

হার্টস্ট্রোকে মারা গেছেন। ছেলেটি বেশ ভারভারিক্কি। কোন্ কোম্পানিতে আছেন আপনি ?

জেনারেল।

ও, জেনারেল, আমার এক আত্মীয় আছেন সেখানে, আমার কাছে এসেছিলেন একদিন।

আপনি করবেন? আমি আশান্বিত চোখে তাকালাম মুখের দিকে। আবার সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। আবার আমি চোখ সরিয়ে নিলাম। আবার বুকটা কাঁপলো।

ছেলেটি তার স্বভাবসুলভ গম্ভীর ভঙ্গিতে জোর দিয়ে বলল, করবো।

আমি ঢোঁক গিয়ে ফেললাম, তা হলে কি আমি একদিন আসবো? আপনার ঠিকানাটা—

এই তো আমার বাড়ি, আপনি ইচ্ছে করলে এখনো আসতে পারেন।

দেখলাম তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েই কথা বলছিলাম আমরা। চট করে একজন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে অপরিচিত ঘরে ঢুকতে প্রথমে আমার দ্বিধা হয়েছিলো। অল্প বয়সের বিধবা, কতো পুরুষের কতো জঘন্য লোভের হাত থেকে রক্ষা পেতে পেতে এই বয়সে এসে পৌঁচেছি। কাজেই ভয়টা অমূলক ছিলো না। সে কড়া নাড়লো না, তালা খুললো, সহজভাবে বললো, আসুন।

আমি সম্মোহিতভাবে তাকে অনুসরণ করলাম। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি ঘর, ঘরটি বড়ো, এক কোণে বসবার ব্যবস্থা, অন্য কোণে একটি খাটে ঢাকা বিছানা। মাথার কাছে লেখাপড়ার টেবিল।

বসুন, বলে ভিতরে চলে গেল। ফিরে এলো তক্ষুনি—বললো, চা খান একটু।

আমি সন্ত্রস্ত হয়ে বললাম, না, না।

সে বললো, ব্যস্ত হবেন না, চা-টা আমিই খাবো, আপনি সঙ্গ দিলে খুশি হবো, এই পর্যন্ত। সিগারেট খেতে পারি?

নিশ্চয়ই।

এখন বলুন, আপনার নিয়মকানুন, আমি কিন্তু খুব বেশি করতে পারবো না

কতো? খুশিতে আমি থর থর করছিলাম।

ধরুন হাজার দশেক। পনেরো পর্যন্তও হতে পারে।

আমি চুনোপুঁটি, সারাদিন ঘুরে ঘুরে সাধ্যসাধনা করে একটা লোককে পাঁচ হাজারে রাগাতেই নাকের জলে চোখের জলে এক হয়ে ঘরে ফিরি, আর লোকটা এক ডাকে পনেরোও হতে পারে বলে দিল! থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম। তারপরেই সামলে নিয়ে নিস্পৃহ মুখে দালালির মুখস্থ বিদ্যেটা ঝেড়ে দিলাম।

চুপ করে শুনে নিয়ে বলল, কবে আসবেন বলুন, আমি প্রস্তুত থাকবো।

আমি ভাবলাম শুভস্য শীঘ্রম্। বিচলিত গলায় বললাম, কাল আসবো?

কখন?

যখন বাড়ি থাকবেন।

তবে এই সময়েই আসুন।

গেলাম। শুধু সেদিনই নয়, সমস্ত কাজটা নিষ্পত্তি করতে বেশ কয়েকদিনই আসা-যাওয়া করতে হলো। আর সেই আসা-যাওয়াই কাল হলো আমার। কখন যেন বুঝে ফেললাম আর উপায় নেই দেখা না করে।

আমি বিধবা, বয়স্ক, তিন ছেলেমেয়ের মা সবই বলেছিলাম তাকে, তাতে তার কিছুই উনিশ-বিশ হয়নি। আর সত্যি বলতে আমি তো দেখতেও ভালো না? এ-কথাও বলেছিলাম। শুনে তাকিয়ে থেকে নিঃশব্দে অনেকক্ষণ হাসলো, তারপর আস্তে আস্তে বললো, তাই নাকি?

আমি বললাম, ঠাট্টার কথা নয়।

সে বললো, আমিই কি ঠাট্টা করেছি? আমি শুধু বলছিলাম যে, আমার যা পাবার তা আমি পেয়েছি, এখন তোমার বিবেচনা।

বিবেচনা মানে কী জানো? বিবাহ। আসলে সেই সময়ে বড়ো অশান্তিতে ছিলাম। বাড়িতে সব সময়ে ঝগড়াঝাঁটি চলছিলো। ভাইয়ে-ভাইয়ে বনছিলো না, বউয়ে বউয়ে নিত্য কলহ। আর আমি তো একটা জগদ্দল পাথর সকলের কাছে। যদিও সেই সময়ে আমার উপার্জন বেশ ভালোর দিকে যাচ্ছিলো, আমি ভালো টাকাই দিচ্ছিলাম, তবু আমার ছেলেমেয়েকে ওরা দেখতে পারতো না, আপদ-বালাই ছাড়া ভাবতো না, দুঃখের কথা কী বলবো, নিজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া সব কিছুতেই এতো তফাৎ করতো যে. প্রায়ই মনে হতো বস্তিতে গিয়ে থাকি, তবু এদের সঙ্গে নয়। আর মাকে তো একটা মনুষ্য হিসেবেই জ্ঞান করতো না।

এই সব শুনেছিলো বলেই বিয়ের প্রস্তাবটা দিয়েছিলো। বলেছিলো, ঐ নোংরার মধ্যে থেকো না, কষ্টের মধ্যে থেকো না, আমার কাছে, তোমার নিজের সংসারে চলে এসো, ছেলেমেয়ের সব দায়দায়িত্ব আমার। বলো তো প্রতিজ্ঞা করতে পারি যে, তাদের নিয়ে কখনোই তোমার কাছে আমি কোনো বেদনার কারণ হবো না। বরং বিনা চিন্তায় বিনা খরচে তিনটি বড়ো বড়ো সন্তানের পিতা হবো ভাবতে আমার ভালোই লাগছে। আমি ছেলেপুলে ভালোবাসি।

ততোদিনে আমাদের বয়েস আরো দু' বছর এগিয়ে এসেছে। আমি বললাম, কেন তুমি এতোদিন বিয়ে করোনি? তবে তো এই বিপদ তোমার হতো না।

সিগারেটে ধোঁয়ার রিং তুলতে তুলতে বললো, যখন দেখা হয়েছিলো তেত্রিশ পূর্ণ করেছিলাম, খুব কি বেশি দেরি করেছি? তাছাড়া যাকে চাই তাকে পাবো তবে তো বিয়ে?

আমি কেঁদে ফেললাম, শেষে কি এই তোমার পাওয়া? মাথায় হাত রেখে বলল, পরিপূর্ণ পাওয়া।

একটা কলেজে পড়াতো সে, মা-বাবা ছিলো না, কিন্তু তাঁদের রেখে

যাওয়া কিছু অর্থবিত্ত ছিলো। আর ছিলো একটি পঙ্গু বোন। ছোটবেলায় পোলিও হয়ে তার পা দুটি অকেজো হয়ে যায়। সারাদিন শুয়ে থাকতে হতো তাকে। এই দাদাই লেখাপড়া শিখিয়ে, গান শিখিয়ে এক ধরনের সহনীয় করে রেখেছিলো তাঁর জীবন। যে বাড়িটিতে থাকতো, নিজেদেরই বাড়ি। পিছনের অংশটায় এক গরিব আত্মীয় প্রায় বিনাভাড়ায় ছিলো। সামনের দু'খানা ঘরের একখানাতে সে নিজে অন্যটিতে তার বোন।

এই প্রেম আমি অতি সাবধানে লুকিয়ে রেখেছিলাম। নিজেকে সব সময়েই কঠিন শাসনে বেঁধে রেখেছিলাম, কিন্তু বিয়ের প্রস্তাবের পরে আমার মনে হলো, লাথিঝাঁটা খেয়ে পড়ে আছি কিসের আশায়? কী আমি আর পাবো এই সমাজ থেকে? ভাইয়েরাই বা কী দেবে যার বিনিময়ে এই সম্মান আমি প্রত্যাখ্যান করবো। কিন্তু ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে বুক হিম হয়ে যায়। ততদিনে তারা তো বেশ বড়ো হয়ে উঠেছে। পাঁচ বছরের ছেলে বারোতে পা দিয়েছে, তিন বছরের শিশু দশ বছরের বালিকা, ছোটটি পর্যন্ত সাত।

এরই মধ্যে কী করে যেন উড়ে-উড়ে এই খবরটা পৌঁছে গেল আত্মীয়-পরিজনদের কানে। দাদা-বউদিরাও শুনলেন. মার কানেও গেল। দপ করে জ্বলে উঠলো আগুন, আর সেই আগুন আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিল। দুটি বালক-বালিকাই জ্বালালো সবচেয়ে বেশি। রাত্রিবেলা একা হয়ে চোখ বড়ো-বড়ো করে বললো, মা, মামীরা বলেছে তুমি নাকি আমাদের ফেলে রেখে একটা লোকের সঙ্গে কোথায় চলে যাবে? একথা শুনে আমার আপাদমস্তক থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো। বড়ো-বড়ো নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে বললাম, মামীরা বলেছে?

ছোটো ছেলেটা শুয়েছিলো, ফট করে উঠে বসলো, কচি-কচি ঘুমগলায় বললো, বড় মামী বলেছে তার নাম নাগর।

কী বলবো তোমাকে, সারারাত আমি আর ঘুমুলাম না। পরের দিন ভোর না হতে উঠেই বেরিয়ে পড়লাম, ফিরলাম একেবারে বাড়ি ঠিক করে। বাড়ি মানে টালিগঞ্জ বস্তিপাড়ায় একটা ঘর, ভাড়া পনেরো টাকা। মাকে বললাম মা, আমি আর দাদাদের সঙ্গে থাকবো না, তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে?

মা কী খুঁজছিলেন, ভুরু কুঁচকে বললেন, কেন, এখানে থাকলে বুঝি ইচ্ছে মতো জীবনযাপন করা যায় না?

মার কাছে এই জবাব আমি আশা করিনি। চুপ করে থেকে বললাম, এখানে যে কী সুখে আছি তা তো তুমি জানো। কিন্তু নিজের জীবন যে-ভাবেই কাটুক, যাদের জন্য উদয়াস্ত রোজগারের ধান্দায় আমার জিভ বেরিয়ে যাচ্ছে, যাদের মানুষ করে তোলবার আশায় আমি নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছি, তাদের জন্য সরে যাওয়া দরকার।

এবার মা যা খুঁজছিলেন তা পেয়েছেন। একটা পঞ্জিকা।

বুদ্ধ চোখে মনোযোগ সহকারে সেই পঞ্জিকার পৃষ্ঠায় একাদশীর

তারিখটা দেখতে-দেখতে, নিষ্ঠুর হয়ে বললেন, তাদের জন্যে ঘোরো, না কিসের জন্য ঘোরো কে জানে। মেয়েমানুষের চরিত্রই হলো আসল, সেই চরিত্রই যার খোয়া গেছে তার আর ছেলেপুলের কথা ভাববার দরকার কী?

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের ঘরে চলে এলাম। গুছিয়ে নিলাম জিনিসপত্র, খেলাম না, স্নান করলাম না, চলে এলাম ট্যাক্সি ডেকে।

মা ভাইয়েদের সঙ্গেও ওই শেষ, রমেনের সঙ্গেও ওই শেষ।

কার সঙ্গে? আমি কুঁচকোনো চোখে তাকালাম।

তিনি শান্ত গলায় বললেন, ওঁর নাম রমেন।

সে আমি বুঝেছি, কিন্তু ওর সঙ্গেও শেষ কেন?

তা ছাড়া উপায় কী বলো? আমার ছেলেমেয়েদের জীবন নিশ্চয়ই আমার জীবনের চেয়ে অনেক বেশিই মূল্যবান। তাদের মনে এক ফোঁটা কালিও আমি ঢালতে পারি না।

কিন্তু উনি তো ওদের সব ভারই গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন।

সে চাইতে পারে, কিন্তু ওরা যে ওকে কী ভাবে গ্রহণ করবে তা তো আমি জানি না! তাই অনন্যচিত্ত হয়ে ওদের মানুষ করার চেষ্টায় নিজেকে উৎসর্গ করে কঠিন শৃঙ্খলে বেঁধে ফেললাম। আমার ঠিকানা আর কে জানে? কে আমাকে খুঁজে পাবে এত বড়ো একটা শহরে?

পরিজনেদের সঙ্গে এই বিদ্রোহটা করতে পেরে আমি সুখীই হয়েছিলাম। আমার ছেলেমেয়েরাও সুখী হয়েছিল। একটা নিরাপদ স্বাধীন জীবনের স্বাদ পেয়ে ভালো স্কুলে ভর্তি হয়ে, ভালো মাস্টারের শিক্ষা পেয়ে ওরা বেশ যোগ্য হয়ে উঠতে লাগলো। লেখাপড়ার কেউ খারাপ ছিল না, সময় মতো সবাই ভালোভাবে পাশটাশ করে চাকরিতেও ঢুকলো, বিয়েও করলো, আর কাজ ফুরিয়ে আমিও একা হয়ে গেলাম। এখন শুধু ঘাটের আশায় বসে থাকা!

কথা শেষ করে আমার দিকে তাকালেন ভদ্রমহিলা। আমি বললাম, মা ভায়েদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন, সে তো উচিত কাজই করেছিলেন, ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষা ছাড়া আপনার নিজেরও একটা আত্মসম্মানের দায় ছিলো। কিন্তু ওই ভদ্রলোককে কেন আপনি কষ্ট দিলেন?

মহিলা ঠোঁটে জিভ বুলোলেন, কেশে নিয়ে বললেন, তাঁকে কতোটা কষ্ট দিয়েছিলাম তাতো জানি না, নিজের হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলতে আমার যে খুব লেগেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ওই তো একজন মাত্রই ছিল যার কাছে আমি চোর-জোচ্চোরের মতো ছাপ মারা বিধবা নামের একটা দাগী আসামী ছিলাম না। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, সে সবকিছু উড়িয়ে দিয়ে বলতো, যারা তোমাকে তোমার চরিত্র নিয়ে নির্যাতন করে তাদের তুমি বুঝিয়ে দিয়ো চরিত্রের অর্থ কেবলমাত্র ঐ একটি কিছুতেই সীমাবদ্ধ নয় এবং ভালোবাসা জিনিসটা কোনো অর্থেই পাপাচরণ হতে পারে না। তুমি তো কাউকে ঠকাচ্ছো না, বঞ্চিত করছ না, এর মধ্যে হিংসা স্বার্থপরতা কুশ্রীতা মিথ্যা কিছুই নেই। শুধু নিজের দুঃখময় জীবনে একটা ছেদ টানার

চেষ্টা, অপমান অসম্মানের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া। তোমার স্বামী মারা গেছেন সেটা তো তোমার অপরাধ নয়? তোমাকে থান পরিয়ে মাথা মুড়িয়ে খেতে না দিয়ে কী লাভ হবে? উনি কি বেঁচে উঠবেন তাতে। না কি তুমি তাঁকে খুন করেছ যে এই শাস্তিবিধান? তাছাড়া যারা তোমাকে একটা বোঝা ছাড় আর-কিছু ভাবেন না তাদের উপর নিজেকে চাপিয়েই বা রেখেছ কেন? আলাদা হয়ে যাও না, বাচ্চাদের শিক্ষার দায়িত্বও তো একটা আছে তোমার? তারা কী শিক্ষা পাচ্ছে সেখানে? কী অন্ধকারে বড়ো হচ্ছে, ভেবেছ কখনো? একটু যুক্তিবুদ্ধির দাস হও, নিজেকে মানুষ বলে ভাবতে শেখো, মেয়েদের জলের তলায় ঠেসে ধরাই যে-সমাজের একমাত্র কর্তব্য তার সঙ্গে লড়াই করতে শেখো। আমি তো আছি, ভয় কী তোমার?

তবু ভয়। জন্মেছিলাম একটা গোঁড়া পরিবারে, আমার মেরুদণ্ড ছিল না, এতো কথা শুনেও আমি অবিশ্রান্ত আমার অপরাধবোধে এমন সচেতন হয়ে থাকতাম যে শেষ পর্যন্ত কেমন শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে উঠলাম। আজ আমি সত্য বলছি, তোমার লেখা পড়ে আমার ভিতরকার আসল সত্তাটা এমনভাবে জাগ্রত হয়ে উঠতে চাইতো যে আমার ক্রোধের সীমা থাকত না। রমেনের সঙ্গে অনেক সময়েই আমার যে ধরনের কথাবার্তা হতো সেই সব কথা যেন তুমি ব্লটিং পেপারের মতো শুষে নিয়ে তুলে ধরতে। আমি থাকতে পারতাম না, তোমাকে ভালবাসি বলেই ছুটে এসে ওরকম ভাবে বকে যেতাম। কিন্তু এটাও খুব সত্য কথা যে সেই লেখা পড়ার জন্য আবার আমি উন্মুখ আগ্রহে অপেক্ষা করতাম।

কিন্তু যাদের জন্য নিজের জীবনের সবকিছু অপচয় করে চুল পাকালাম আজ সেই সন্তানরা আমার কোথায়? আমার কথা তারা কতটুকু ভাবে? প্রয়োজন ফুরোনো মাত্রই জীর্ণ বস্ত্রের মতো মাকে ত্যাগ করে কেমন যার যার সংসার নিয়ে সে সে উধাও। আমার কি মনে হয় জানো, ওই যে ছেলেবেলায় তার মামীরা আমার বিরুদ্ধে তাদের মনে এক অবিশ্বাসের বীজ বুনে দিয়েছিল, সেই কণ্টক প্রত্যক্ষে না হোক, পরোক্ষে বিঁধেই ছিল শেষ পর্যন্ত। নইলে মানুষ হওয়া মাত্রই এমন পাখির মতো উড়ে গেল কেন? তারা তো দেখেছে কী ভাবে আমি তাদের খাইয়েছি, পরিয়েছি সুখে রাখার চেষ্টায় আপ্রাণ হয়েছি? কিছু তো পিছুটান থাকা স্বাভাবিক ছিল? না কি এই-ই জগৎ সংসারের নিয়ম? এ ভাবেই চলতে থাকে চাকা। হয়তো তাই। কিন্তু আমি তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে আমার জন্য অনেক বিশ্রাম খুঁজেছিলুম, পাইনি।

সারাজীবন কাজ করেছি, খেটে খুটে অনেক উঁচুতেই উঠেছিলাম শেষ পর্যন্ত তা বলে আমি তো কিছু ভোগ করিনি? সেই তো এক বেলা কোনো রকমে সেদ্ধ পোড়া দিয়ে দুটি আতপ চালের তণ্ডুল ভক্ষণ আর বারো মাসে তেরো পার্বণের তেত্রিশ রকমের উপোস, এই তো জীবন। শেষ বয়সে সব খুইয়ে আবার একটা বাড়িও করে বসলাম। সেও তো ওদের কথা ভেবেই? এখন যখ হয়ে নিজেই আগলে বসে আছি। উঠে দাঁড়ালেন, সজল চোখে

হেসে বললেন, তোমাকে খুব জ্বালালাম আজেবাজে বকে জানি দিদিকে তুমি ভালোবাসো, তাই বিরক্ত হবে না। চলি কেমন ?

আমি সাগ্রহে বললাম, আর একটু বসুন। আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছিল, সেই রমেনের সঙ্গে আর কখনো তাঁর দেখা হয়েছিল কিনা। ইতস্তত করে বললামও সে কথা। তিনি যেতে যেতে দাঁড়ালেন, মাথা নেড়ে বললেন, মাস কয়েক আগে একদিন দেখা হয়ে গেল পথে। তেত্রিশ বছরের যুবক এখন তেষট্টি বছর পূর্ণ করেছে, কিন্তু চোখ মুখ তেমনি সতেজ, তেমনি সুন্দর। স্বভাবও তেমনি বেপরোয়া। তাকিয়েই বললো, লতিকা না ? আমিও অবশ্য পলকমাত্রেই চিনতে পেরেছিলাম। ভোলবার মতো লোক তো সে ছিল না ?

তারপর ?

তারপর আর কী ? গতানুগতিক কুশল প্রশ্নের বিনিময়। শুনলাম, আমাকে অনেক খুঁজেছিল, আমার ভ্রাতাদের কাছে গিয়ে ঘাড় ধাক্কা টাক্কাও হয়তো খেয়ে থাকবে, তারপর উত্তরবঙ্গে না কোথায় অন্য একটা চাকরি জোগাড় করে চলে যায়, শেষে অনেক ঘাটের জল খেয়ে বৃদ্ধ বয়সে আবার ফিরে এসেছে। কপালে আর বিয়ে করা ঘটেনি, বোনটি মারা গেছে বছর দুয়েক আগে, এখন আমার মতোই সীমাহীন সঙ্গীহীন অন্ধকার অবসর।

তারপর ?

তারপর ? আমার মাথার চুল নেড়ে দিয়ে হাসলেন, তারপর আমার কথাটি ফুরোলো, নটে গাছটি মুড়োলো। সোনামণি তোমার 'সঙ্গসুধা' গল্প গল্পেই ঘটে। জীবনে নয়। ষাট বছরের মহিলা কখনোই আর পঁয়ষট্টি বছরের মানুষটাকে বিয়ে করে সুখের ঘর বাঁধতে পারে না সন্তান পরিত্যক্ত হয়ে একা ঘরে শক্ত হয়ে মরে পড়ে থাকলেও না। জানো না, মেয়েরা ঘাস মাটি ? পদদলিত হয়ে বেঁচে থাকাই তাদের ধর্ম।

ভালোবাসার জন্ম

প্রথমে আমরা এই ছবিটা দেখতে পেলাম। একটি যুবতী মেয়ে, পরনে টিয়ারংয়ের শস্তা শাড়ি, গায়ে আঁটো ছিটের ব্লাউস, হাত ভর্তি কাচের লাল সবুজ চুড়ি, বাঁ হাতে চুড়ির পিছনে সাধব্যের চিহ্ন স্বরূপ সরু মোটা চার-পাঁচটা লোহা, (একটা বাপের বাড়ির, একটা শ্বশুর বাড়ির, একটা মানতের, একটা কালীবাড়ির, একটা তারকেশ্বরের), উপর হাতে সুতোয় বাঁধা বড়ো-ছোটো তিনটে মাদুলি, গলায় চিকচিকে সোনার হার। গায়ের রং মাজা-মাজা, নরম কোমল শ্যামল। মুখশ্রী বেশ সুন্দর। বিশেষত চোখ, চোখ বড়ো, কালো, গভীর। মাথার চুল ঈষৎ কটা, কিন্তু ডৌল সুন্দর, সিঁথির দু'পাশে ঢেউ আছে। এই মুহূর্তে সেই চুল পিঠে ছড়ানো, ঘন এবং লম্বা। একটু একটু ভেজা। বোঝা যাচ্ছে স্নান করেছে খানিক আগে. কেননা কপালের সিঁদুরও তাজা টকটকে। সাধব্যের চিহ্ন সেখানেও প্রকট কপালের ফোঁটাটা যেমন বড়ো, সরু সিঁথিটাও তেমনি দগদগে লাল।

মেয়েটি তার অপরিসর শোবার ঘরের অপরিসর জানালার ধারে একটি টুলের উপর বসে নিবিষ্টভাবে বই পড়ছিলো।

ঘরটা জিনিসপত্রে ঠাসাঠাসি। দেয়ালগুলো ছবিতে ছবিতে আকীর্ণ। গান্ধী, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, পাকা মুখের বালগোপাল, লেকের ধারে যুবক যুবতী, গোলাপ ফুল, আকাশচারী বলাকা, ধান বোঝাই নৌকো, কতো যে ভিন্ন ভিন্ন জাতের ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ছবি তার কোনো হিসেব নেই। বেশীর ভাগই ক্যালেণ্ডারের কৃপায় আহৃত। কিছু ছবি পেরেকে ঝুলছে, কিছু-কিছু ময়দার আঠা দিয়ে চেপটে লাগিয়ে দেয়া। এক কোণে এপাশ ওপাশ জুড়ে মস্ত একটা শক্তপোক্ত তক্তপোশে যুগল বিছানা, বিছানা উল্টোনো, বালিশে চাদরে তোশকে পাশ বালিশে পর্বত-প্রমাণ। ঘরটা ছোটো বলে আরো প্রশস্ত দেখায়। তক্তপোশ যেখানে শেষ হয়েছে সেখানেই একটা ছোট জানালা, ঘনঘন মোটা শিক দেয়া, সেই জানালার তলাতেই টুলের ওপর বসে বই পড়ছে মেয়েটি। মেয়েটির নাম পুষ্প।

এখন বেলা দেড়টা। দোকান বন্ধ করে পুষ্পর স্বামী এখন ঘরে ফিরছে। দোকান মানে মুদি দোকান। বেশ চলতি দোকান। মুদির সওদাও থাকে, মনোহারিও থাকে। বর্তমানে মনোহারি বিভাগটাই গমগমে। ব্রজেশ বলে, আজকাল মেয়েগুলিন খুব উইজিয়েছে, সপাংসপাং আইসবে, বইসবে, বইলবে, দিন দিন তাড়াতাড়ি দিন। মাথার কাঁটা দিন, ফিতে দিন, পাউডার

দিন, সোনো দিন, ঝনাৎ কইরে টাকা ফেইলবে ঠমক মেইরে চইলে যাবে। দুইদিন, মাত্র দুইদিন, আবার এইসে বইলবে কাঁটা দিন ফিতে দিন হেনা দিন ত্যানা দিন— আমি মনে মনে বলি, মা লক্ষ্মীরা বাপের পয়সা দেখছি বড়োই শস্তা, নিবে আর হারাবে, হারাবে আর কিনবে। যাচ্চলে, আমার তো তাইতে লাভই। হারাও হারাও, যতো খুশি হারাও, যতো খুশি ছেঁড়ো ফাঁড়ো আমার আর কী? আমার বউ ঠিক থাকলেই হবে।

পুষ্পর তুলনায় পুষ্পর স্বামীর বয়েস অনেকটা বেশী, রং কালো এবং মোটা। বুকে জঙ্গলের মতো লোম, হাতে পায়েও খুব লোম। অনেক সময়েই বনমানুষের মতো দেখায়। মাথার চুল শক্ত এবং ঘন, ভুরু এক আঙুল চওড়া, প্রায় চোখের পাতায় ঝুকে পড়েছে। চোখ ছোটো করমচার মতো লাল।

বিদ্যা না থাক, বুদ্ধি আছে, পরিশ্রমী খুব, দেশ পাকিস্তানের গর্ভে চলে যাবার পরে সর্বস্বান্ত হয়ে এসেও ভেঙে পড়েনি, কলকাতার উপকণ্ঠে রাস্তার ধারে জবর দখল জমিতে ছাউনি তুলে শুরু করেছিলো, এখন সেখানে পাকা ঘর, বড়ো দোকান।

বাড়ি আর দোকান দেয়ালের এপিঠ ওপিঠ। দোকানের নাম মাতৃ-ভাণ্ডার। ব্রজেশ খুব মাতৃভক্ত সন্তান। দোকান ফেঁপে ওঠার পর থেকে নিয়মিত মায়ের পাদোদক খায় সকালে উঠে। যদিও মায়ের দীর্ঘজীবন তার পক্ষে প্রায় দৈনন্দিন যন্ত্রণা, খেতে পরতে দিতে বুক বিদীর্ণ হয়ে যায়, তবু চরণামৃত খাবার বেলায়, 'মা, মাগো, আমায় আশীর্বাদ করো যেন লক্ষপতি হই' বলে গদগদভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। তার ধারণা হয়েছে মায়ের নামে দোকান বলেই আজ এমন চলছি।

সেই ব্রজেশ ঘর্মাক্ত শরীরে ঘরে ঢুকেই তিরিক্ষি হয়ে উঠলো, আবার, আবার তুমি ঐসব নাটক নভেল পইড়তে শুরু করেছ? গেঞ্জিটা খুলে ছুঁড়ে দিল আলনায়। হাজারবার বারণ কইরলেও দেখছি কর্ণে পিরবেশ করছে না, কানের ফুটাটা কি ছোটো? লোহা গরম কইরে কি সেডা বড়ো কইরতে হবে?

পুষ্প ভয়ে-ভয়ে উঠে দাঁড়ালো, অপ্রস্তুত ভাবে হাসলো, নরম করে বলল, পড়ছিলাম না, দেখছিলাম।

দেখছিলে? কী দেখছিলে? দড়ি থেকে গামছা নিয়ে বুকপিঠ বগল মুছতে লাগল, কোনখানে পরপুরুষের সঙ্গে পিরিত আছে সেই সব দেইখছিলে। নাটক নভেলে ঐসব ছেনালি ছাড়া আর কিছু থাকে নাকি? যত্তো সব—।

বই রেখে পুষ্প ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে, ঘরের বাইরে বারান্দা, নিচে উঠোন, উঠোনে নলকূপ। কাপড় চোপড় তেলের শিশি সাবান ইত্যাদি যথাস্থানে গুছিয়ে দিয়ে নলকূপ টিপে টিপে, বড়ো টিনে জল ভরতে লাগলো। ততোক্ষণে ব্রজেশ ধুতি ছেড়ে গামছা পরে বেরিয়ে এসেছে। গামছাটা ছোটো, গামছায় তার লজ্জা ঢাকেনি, কিন্তু তার জন্য

সে ব্যস্ত ছিলো না, লজ্জা আর কার কাছে? বউ তো বউ-ই, আর মা তো সেই বেলা এগারোটায় ভাত খেয়ে ঘুমুচ্ছে তো ঘুমুচ্ছেই। জাবর কাটা আর ঘুমোনো, এ ছাড়া আর কাজই বা কী বুড়াগোরুর। রাগে ব্রজেশের গা পিত্তি জ্বলে।

সে এসে কলতলায় দাঁড়ালো, আঙুল দিয়ে দাঁত মাজছে সে, পোড়া তামাক গুঁড়ো করে রাখে পুষ্প, তাই দিয়ে সে এই সময় দাঁত মাজে রোজ। খুব ভালো করে মাজে আর পিচপিচ থুতু ফেলে এখানে ওখানে। লাল চোখ গরম করে বললো, জলচৌকিটা এনে দাও। পুষ্প তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে নিয়ে এসে বারান্দায় পেতে দিলো। দাঁতে দাঁত ঘষলো ব্রজেশ, এখানে দিচ্ছ কেন? এখানে বইসে আমার কোন ছেরাদ্দ হবে? কলতলায় দাও গা ঘইষবো।

ও জলচৌকি উঠিয়ে কলতলায় নিলো, তারপর দাঁড়িয়ে রইলো আদেশের অপেক্ষায়। পুষ্প জানে এরপর তাকে কী করতে হবে।

ব্রজেশ ধীরে আস্তে দাঁত মেজে ঘটির জল দিয়ে কুলকুচি করে মুখ ধুতে লাগলো। করমচা চোখে তাকাতে লাগলো রোদ্রে দাঁড়িয়ে থাকা স্ত্রীর দিকে। পুষ্প ঘামছে, জ্যৈষ্ঠ মাসের তীব্র রোদে লাল হয়ে গেছে মুখ, চোখের কোলে ক্লান্তি। বেশ তৃপ্তি অনুভব করলো সেই কষ্ট দেখে। নিজেকে রাজা-মহারাজা মনে হলো। তারপর সেই রাজামহারাজার চালেই নেমে এলো উঠোনে, কলতলায়, বসলো জলচৌকিতে, ছোট গামছাটা আলগা দিল কোমর থেকে, লজ্জার আর কিছু রইলো না, শুধু সামনাটুকুতে একটু আবরণ থাকলো, কি থাকলো না।

পুষ্পর সংকোচ হচ্ছিলো, চারদিকে তাকিয়ে অস্ফুটে বললো, ওদের দোতলা থেকে দেখা যাচ্ছে সব।

দেখুক। ব্রজেশ হুমকি দিয়ে উঠলো. বড়োলোকের পিণ্ডিরা যদি দোতলায় বইসে দেখতে চায় তো দেখুক না, শালা হাঙরের জাত সব। তোমার ঐ বইয়ে পড়া মিনমিনে পিনপিনে পুরুষ না আমি, কারা না সব আছে ঐখেনে, সব ব্যাটাবেটিকে দাঁড়িয়ে দেইখতে বলো না বারান্দায়. জানুক পুরুষ কাকে বলে। নাও, নাও ভালো কইরে ঘইষে দাও পিঠটা।

পুষ্প ঘষে দিতে লাগলো। সপ্তাহে একদিন ভালো করে সাবান দিয়ে স্নান করে ব্রজেশ, পুষ্পকে এভাবেই ঘষে দিতে হয়। ব্রজেশ নির্দেশ দিলো হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐখানটা একটু ভালো কইরে, হ্যাঁ, আরো নিচে আরো নিচে আরে কোমরটা ছাড়িয়ে নিচে নেইবে এসো না—। ব্রজেশ চৌকি থেকে ঈষৎ উঁচু হয়ে উবু হলো যাতে পুষ্প আরো নিচের অংশে ভালো করে ঘষতে পারে। পুষ্প ঢোঁক গিললো।

শালীর হাত চইলছে দেখ না, স্বামী না যেন পরপুরুষ, আলগা আলগা, শুতেও আলগা ধুতেও আলগা, নে আয় সামনের দিগে আয় এবার।

পুষ্প সামনের দিকে এলো, ধুন্দুলের খোসায় নতুন করে সাবান লাগিয়ে পায়ের পাতা পরিষ্কার করতে শুরু করলো। পিছনে যেমন ঘাড় থেকে

নেমে নেমে একেবারে বিশ্রী জায়গায় এসে শেষ হয়েছিলো. জানে, এখনও ঠিক একই ভাবে নিচ থেকে উপরে উঠে উঠে এমন জায়গায় এসে শেষ হবে যা পুষ্পর পক্ষে মর্মান্তিক অশ্লীলতা ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না।

কিন্তু ব্রজেশ এই রকমই। তার রুচি বলে কিছু নেই, ভদ্রতা বলেও কিছু নেই। অথচ সে শুচিবায়ুগ্রস্তের মতো চারদিকেই কেবল ছেনালি দেখছে, অনাচার দেখছে. অসতীত্ব দেখছে। তার ভাষায় মেয়েছেলেরা সব্বাই এক একজন মূর্তিমান গণিকা। সেই জন্যই সে বউকে খুব সাবধানে রাখে, হাতে নাটক নভেল দেখলে বন্যবরাহের মতো দাঁতালো হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর নিজে কোথা থেকে সব ন্যাংটো মেয়েদের ছবিওলা বই এনে লুব্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে। বলে, এগুলো তোমাদের বদমাইশ লেখকগুলোর মতো ইইনে বিইনে কাঁদুনি নয়, প্রেম প্রেম খেলা নয়, মেয়েছেলেদের নষ্ট কইরবার ফন্দি নয়, এ হচ্ছে সত্যিকারের বিজ্ঞান। বিজ্ঞান কাকে বলে জানো? এই সব শিইখবে তবে তো খুশি হবে স্বামী। মেয়েছেলের ধর্ম কী? স্বামীকে খুশি করা। সতীত্ব কী? স্বামীকে ইষ্টদেবতা জ্ঞান করা? সেবা কী? পতিসেবা। জানো না পতি পরমগুরু?

আগে তবু স্ত্রীর জন্য কিছুটা মায়া মমতা ছিলো ব্রজেশের এখন তা নেই, এখন পুষ্পব উপর সে ক্রুদ্ধ বিরক্ত। এখন পুষ্পর সুন্দর যুবতী শরীরটা সে নিষ্ঠুরের মতো ব্যবহার করে। পুষ্পর নিরুপায় নিঃশব্দ ধৈর্যের উপর যথেচ্ছ আক্রমণ চালায়। পুষ্পকে যখন বিয়ে করেছিলো, পুষ্পর বয়েস ছিলো প্রায় চোদ্দা, এখন কুড়ি। আর তার নিজের বয়েস পঁয়ত্রিশ। এই ছ' বছরে কোনো সন্তান হলো না তাদের। মা বলেছে আর হবেও না। পুষ্প বাঁজা মেয়েমানুষ। বাঁজা যে সে বিষয়ে একবিন্দু সন্দেহ নেই ব্রজেশের, নইলে তার মতো এমন একটা শক্তিশালী পুরুষ, যার স্বামী তার তো ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী গান্ধারীর মতো শতপুত্রের জননী হওয়া উচিত ছিলো। শত পুত্র অবিশ্যি সে চায় না, তা বলে দুটো চারটেও হবে না, সে কী কথা? তবে সে কাদের উপর কর্তৃত্ব করবে, কারা তার কথায় উঠবে বসবে খাবে শোবে? দোকানই বা চালাবে কার সাহায্যে? সন্তান বড়ো উপকারী জিনিস, সংসারের সর্বময় কর্তা হতে গেলে একমাত্র স্ত্রীর উপর নির্ভর করলেই চলে না, প্রভুত্বের জন্য পুরুষের আরো উপাদান চাই। ব্রজেশের জীবনে কোথায় সে সব? কেনই বা নেই? এই, এই স্ত্রীলোকটার জন্য নেই। একটা নিষ্ফলা গাছ, একটা ডেমনি। যে স্ত্রীর বাচ্চা হয় না, সে স্ত্রী আবার স্ত্রী নাকি? তাকে স্ত্রীলোকই বলে। তবে কেনই বা ভালো ভাবে সেবা নেবে না, নিশ্চয়ই নেবে, ইচ্ছে হলে সারা দিন নেবে।

হ্যাঁ, ভালো করে ঘষো, এইখানটায় এইখানটায়। কে আছে? কে দেখছে? কেউ না। এই নিস্তব্ধ দুপুরে কেউ কোনোখানে নেই, সবাই খেয়েদেয়ে যে যার কাজে গেছে, নয়তো ঘুমিয়েছে। লজ্জা কী? ভয় কী? এ শরীর তো তোমার স্বামীর, মন্ত্র পড়ে বিয়ে করা স্বামীর, সুন্দর নরম

হাত তোমার, এবার খোসাটা ফেলে দাও, সাবান দিয়ে পিঠে বুকে হাত বুলিয়ে দাও আস্তে আস্তে,—আরামে চোখ বুজে খুশি হয়ে প্রায় দেবতার মতো বর দিল ব্রজেশ, শোনো পুষ্প, মা আমাকে আর একটা বিয়ে করার জন্য বড়ো তাগিদ দিচ্ছেন, তুমি তো সবই জানো কেন আমিও সে কথায় রাজী হয়েছি। একটা সন্তান না হলে কি পুরুষের বংশ রক্ষা হয়? বলো? পুন্নাম নরক থেকে আমাকে ত্রাণ করবে কে? তুমি মেয়েমানুষ, যতোক্ষণ আছ আছ, মরলেই গেলে। গরু বাছুরের মতো। কিন্তু পুরুষ? তার মূল্য অন্য রকম। তবু বলছি, তোমাকে আমি ত্যাগ করবো না। বিয়ে করলেও এভাবেই আমাকে সেবা করতে দেব, নতুন বউ রাগারাগি করলেও আমি লুকিয়ে-চুরিয়ে এসে শোবো তোমার সঙ্গে।

ঘটি ভর্তি জল নিয়ে পুষ্প স্বামীর গায়ে ঢেলে ঢেলে এবার সাবানগুলো ধুয়ে দিতে লাগলো. তার শান্ত চোখ মৃতের মতো স্থির এবং শীতল।

দুপুর কাটলো। খেয়ে উঠতে উঠতে আড়াইটে বেজে গিয়েছিলো, ব্রজেশ নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে উঠলো চারটের সময়। এবার দোকান। দোকানেই চা আর হালুয়া পাঠিয়ে দেবার আদেশ দিয়ে গেঞ্জি চাপিয়ে চলে গেল সে।

পুষ্প ঘুমোয়নি। বসেছিলো, উপন্যাসটা শেষ করছিলো লুকিয়ে লুকিয়ে। পড়তে শিখে থেকেই সে নেশাগ্রস্তের মতো যা যেখানে পায় পড়ে। আস্তে আস্তে সেই নেশা তার দুরন্ত ক্ষুধায় পরিণত হয়েছে। এই তো জীবন, মনে মনে সে ভাবে, যদি না বই পড়তে পারতাম কী করতাম আমি? কেমন করে টিকে থাকতাম? দিদিরা বলে, পুষ্প, তুই ভাগ্যবতী খেয়ে-পরে কতো সুখে আছিস, পুজোয় পার্বণে তোর গায়ে সোনাদানাও উঠছে, ছিলো ঘর. এখন পাকা দালানের মালিক, ফেলে ছড়িয়ে রোজগার করছে ব্রজেশ। আহা, ব্রজেশের মতো ছেলে হয় না, যেমন সৎ, তেমনি পরিশ্রমী, আর আমাদের? শুধু নাই নাই আর খাই খাই।

পুষ্প ভাবে, তা ঠিক। ওদের ব্রজেশ আমাকে খেতে দেয়। পুজোয় সোনার হারও গড়িয়ে দিয়েছে। ছেলের মানতে তিনটে সোনার মাদুলিও ধারণ করিয়েছে। না, দুঃখ কোথায়?

স্ত্রী সব পুরুষেরই অধিকৃত সামগ্রী, তারই মধ্যে যে পুরুষ খেতেও দিতে পারে না দাসীপনাও করায়, সে তো নিশ্চয়ই ব্রজেশের চেয়ে খারাপ। সেই হিসেবে দিদিরা তাকে একথা বলতেই পারে।

কিন্তু দিদিরা শুধু এ কথাটাই জানে না, দারিদ্র্য বা মৃত্যুর চেয়েও বড়ো বেদনা আছে সংসারে। সে বেদনা চোখে দেখা যায় না কিন্তু তার অদৃশ্য শেল বক্ষবিদারক।

স্বামীকে চা হালুয়া পাঠিয়ে পুষ্প হাত মুখ ধুলো। শাশুড়ি খ্যাচর খ্যাচর করছিলেন, তাকেও ঠাণ্ডা করলো খাবার দিয়ে তারপর সে ঘরে এসে দেয়ালে ঝোলানো আয়নায় মুখ দেখে মাথা আঁচড়াতে লাগলো। আয়নাটা

ঝাপসা, মুখ ভালো করে দেখা যায়না। গরিবস্য গরীব বিধবা এই আয়নাটা দিয়েছিলেন বিয়ের সময়ে। তখন এই ব্রজেশ তাকে পছন্দ করে বিয়ে করেছিলো, মা কৃতার্থ হয়ে চোদ্দ বছর না পুরতেই নমো বিষ্ণু করে তাড়াতাড়ি গছিয়ে দিলেন। না দিয়ে করবেন কী? খাওয়াবেন কোথা থেকে? মেয়ের উদ্ভিন্নযৌবনই বা রক্ষা করবেন কেমন করে? পাড়ার ছেলেরা তো বখামি করতে কম করেনি?

একটা লাইব্রেরী থেকে বই আনতে যেতো সে, লাইব্রেরীর বুড়ো লোকটা পর্যন্ত একদিন নির্জনে পেয়ে কী বিশ্রীভাবে চুমু খেলো।

ঐশশ! ব্রজেশ যদি সে কথাটা জানতো তা হলে কি বিয়ে করতো? কক্ষনো না। সে সবচেয়ে যা বেশী ঘৃণা করে তা হচ্ছে অসতী স্ত্রীলোক। অন্যের চুমু খাওয়া মেয়ে নিশ্চয়ই অসতী। ব্রজেশ নিজে কিন্তু বিয়ের আগে বেশ্যাবাড়ি যেতো. পরেও যে মধ্যে মধ্যে যায় না কে জানে. কতোদিন তো অনেক রাত্রে বাড়ি আসে।

তা আসুক। যদি প্রতি রাত্রেই আসে তাতেও বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই পুষ্পর, বরং সে নিষ্কৃতি পাবে। আর একটা বিয়ে করলেও আপত্তি নেই, আপত্তি শুধু নিষ্ফলা স্ত্রীলোক আখ্যায়। সেটা সে সহ্য করতে পারছে না। তাছাড়া আর একটা বিয়ে করলে ব্রজেশ যে তাকে থাকতে দিতে চাইবে না একথা অবধারিত। মা বাড়ি বাড়ি ঘোরেন, এর বাড়ি ওর বাড়ি আশ্রিত হয়ে একা ভিক্ষুকের জীবন যাপন করেন। মার কাছে যাওয়া যায় না। পুষ্প তা হলে যাবেই বা কোথায়, খাবেই বা কী? হাজার হোক সে ভদ্রলোকের মেয়ে, ভদ্রলোকের বউ।

টিয়া রং শাড়িটা ছাড়লো, ব্লাউজও ছাড়লো। ট্রাঙ্ক থেকে সাদাখোলের একখানা ভালো শাড়ি বার করে ঘুরিয়ে পরলো, একটা লাল ব্লাউজ গায়ে দিলো, হাতের তাবিজগুলো খুলে খুলে রেখে দিলো বাক্সে, তারপর মুখে ঘন করে পাউডার মেখে স্যাণ্ডেল পায়ে বেরিয়ে এলো বাইরে। পিছন দিক দিয়ে একটু ঘুর পথে বড়ো রাস্তা ধরলে। তার গন্তব্য বেশী দূর নয়, মিনিট দশেক হেঁটেই পেয়ে গেল বাড়িটা। ছিমছাম ছোট বাড়ি, সামনে বাগান, বাগানের পাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে ঘরে। বাইরে নেম প্লেটে অনেকক্ষণ চোখ রেখে, অনেক ইতস্তত করে ঢুকে এলো ভিতরে মস্ত ঘর, দেয়ালের গায়ে সারি সারি গদি আঁটা চেয়ার পাতা. মাঝখানে টেবিলে অনেক বই। বই দেখেই প্রথমে প্রাণটা শক-শক করে উঠলো, তারপর লোভ দমন করে বসলো চুপচাপ। শব্দ পেয়ে একজন পোশাক-আঁটা বেয়ারা বেরিয়ে এলো, নাম লিখিয়ে নিল স্লীপে, তারপর কাটা দরজা দিয়ে ঢুকে গেল পাশের ঘরে, আবার ফিরে এলো তক্ষুনি. বলল, আসুন।

ব্রজেশের সঙ্গে পুষ্প এর আগেও দু-চারবার ডাক্তারের বাড়ি গেছে, কিন্তু এতোবড়ো ঘরে এতো সুন্দর মানুষকে আর কখনো সে বসে থাকতে দেখেনি। তার বুক কাঁপছিলো, গা ঘামছিলো, ভয় করছিলো।

তাকিয়ে থেকে ডাক্তার বললেন, বসুন।

সে বসলো।

কী হয়েছে?

লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

কী অসুখ করেছে?

কম্পিত গলায় বললো, পাড়ার সবাই বলে আপনি খুব বড়ো ডাক্তার।

আর কী বলে?

মেয়েদের ডাক্তার।

আর?

তাই আমি—

সঙ্গে কে এসেছে?

কেউ না।

কোথায় থাকেন?

কাছেই।

বলুন কী হয়েছে।

আমার—আমার—

বলুন, বলুন, লজ্জা করছেন কেন? ডাক্তারের কাছে লজ্জা করতে নেই।

পুষ্প বড়ো বড়ো চোখ তুলে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকালো। কী যে দেখলো কে জানে, প্রাণে জল এলো তার—বললো, আমাকে এমন একটা ওষুধ দিন যাতে আমি মা হতে পারি।

মা হতে চান?

হ্যাঁ।

বিয়ে হয়েছে ক'দিন?

ছ' বছর।

আপনার বয়েস কতো?

কুড়ি।

তার মানে চোদ্দ বছর বয়সে বিয়ে করেছেন?

তেরো বছর ন' মাস।

সদর্ণা আইনে পড়েননি?

কী?

আইন, আইন। জানেন না, চোদ্দ বছরের নিচে বিয়ে দেবার আইন নেই?

জেনে কী হবে? উপায় ছিলো না।

ব্যস্ত হয়েছেন কেন, মা হবার পক্ষে এখনো তো আপনি যথেষ্ট ছোটো।

ছোটো?

কুড়ি বছরের মেয়েরা তো এখন বালিকা?

কোনো ওষুধ নেই, না?

এর কি কোনো ওষুধ থাকে? আমাকে দেখতে হবে কী দোষ আছে, যার জন্য বাচ্চা হয় না।

তা হলে দেখুন।

চলুন।

আর একটা কাটা দরজা দিয়ে ডাক্তার তাকে তার পাশের ঘরটায় নিয়ে এলো। একটা উঁচু লম্বা টেবিলের উপর উঠে শুয়ে পড়তে বললো।

এই পর্যন্ত ঠিক ছিলো। কিন্তু ডাক্তার যখন যথেষ্ট জোরালো আলো জ্বালিয়ে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় উদ্যত হলো, লাফিয়ে উঠে বসলো সে। ঘেমে নেয়ে ক্রন্দনবিজড়িত গলায় বললো, এসব কী করছেন?

মেয়েটির অনভিজ্ঞতায় ডাক্তার প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে গেল, পরে বললো, শুনুন, আপনি আপনার স্বামীকে নিয়ে আসবেন, তারপর আমি আপনাকে দেখবো।

স্বামীকে?

আপনি কিছু জানেন না।

কিন্তু—

নষ্ট করার মতো আমার সময় নেই।

পুষ্পকে বেলেই ডাক্তার ফিরে এলো আগের ঘরে। নিবিষ্ট হয়ে কী কাজে মন দিল।

কাপড় চোপড় ঠিক করে পুষ্পও চলে এলো, ভয়ে ভয়ে বললো, আমার উপর রাগ করবেন না, আমি খুব বিপন্ন হয়েই আপনার কাছে এসেছিলাম।

তাকিয়ে দেখলো ডাক্তার। বললো, কী আপনার বিপদ?

আমার ছেলেমেয়ে না হবার দরুন আমার স্বামী আবার বিয়ে করতে চাইছেন।

হোয়াট। প্রায় চমকে গেল ডাক্তার।

আমার এমন দুরবস্থা যে এ বাড়ি ছাড়া অন্য আশ্রয় নেই, স্বামী বিয়ে করলে নিশ্চয়ই আর আমার জায়গা হবে না এখানে।

কিন্তু স্বামী কি জানেন যে কার দোষে সন্তান জন্মাচ্ছে না?

কী বলছেন?

সন্তান যে হচ্ছে না, সে জন্য যে আপনিই দায়ী এটা কী করে জানলেন তিনি?

আমি ছাড়া আর কে দায়ী হবে?

আপনার স্বামীও হতে পারেন।

পুরুষ মানুষ তো কখনো বাঁজা হয় না, মেয়েরাই হয়।

এবং ওটা আপনাদের মেয়েদেরই একচেটে ধারণা।

পুষ্প আশান্বিতভাবে তাকিয়ে থেকে বললো, সত্যি।

হ্যাঁ, সত্যি।

সেটা তবে কী করে প্রমাণ করা যায়?

পরীক্ষা করে।

আপনি পরীক্ষা করে বলে দিতে পারবেন দোষটা কার।

নিশ্চয়ই।

তবে—

দেখুন, আমার সময়ের মূল্য আছে। আজ আমার শরীর খারাপ। রোগী দেখবো না বলে একটা নোটিসও দিয়েছি বারান্দায়, হয়তো আপনি সেটা লক্ষ্য না করে চলে এসেছেন ভেবে আমি রাজি হয়েছিলাম দেখতে। কিন্তু—

আমাকে দয়া করুন।

কী মুশকিল।

বুঝতেই পারছেন আমাদের মতো লেখাপড়া-না-জানা মেয়েদের কী নিরুপায় অবস্থা—

বসুন। পুষ্প বসলো।

আপনার স্বামী যে আবার বিয়ে করতে চাইছেন তাতে আপনার রাগ হচ্ছে না? অপমান হচ্ছে না?

না। আমার শুধু ভয় হচ্ছে, আমার কী হবে সে কথা ভেবে।

এমন যদি হয় সেই নিরাপত্তা আপনি পেলেন, তা হলে?

আমি সেই মুহূর্তেই এখান থেকে চলে যাবো।

কষ্ট হবে না?

না।

তার মানে স্বামীর সঙ্গে আপনার ভালোবাসার সম্পর্ক নয়?

না।

শুধু খাওয়া পরার?

হ্যাঁ।

আচ্ছা চলুন, দেখা যাক কী ব্যাপার।

দেখলেন ডাক্তার। ভালো করেই দেখলেন। তারপর নিঃসংশয়ে রায় দিলেন হয় দোষটা তার স্বামীর, নয়তো এখন হচ্ছে না পরে হবে, কিন্তু সন্তানস্থলে তার নিজের অর্থাৎ পুষ্পর কোন দোষ নেই।

ডাক্তারকে পুরো দর্শনী দিয়ে পালকের মতো হালকা পায়ে বাড়ি ফিরে গেল পুষ্প। রাত্রিবেলা স্বামীর সঙ্গে নিভৃত হয়ে বললো, আচ্ছা তুমি যে আবার বিয়ে করতে চাইছ, কী করে জানলে যে আমার দোষেই তোমার ছেলে হচ্ছে না।

তবে কার দোষে?

অনেক সময় পুরুষের দোষেও হয়।

নভেল পড়ে পড়ে এই সব জ্ঞান হয়েছে বুঝি?

হ্যাঁ।

কোন্ বদমাইশ লেখক এই সব কথা লিখেছে? আমি মামলা ঠুকবো তার নামে।

কী মামলা?

অশ্লীল কথা লেখার, ঘরের বউ ঝিদের ফুসলে বার করার মামলা।

এটা বার করা হল নাকি?

হলো না ? একথা জানলে ঘরের বউ ঘরে থাকতে পারে ? যত্তো সব হারামজাদার গুষ্ঠি—আমি তোমাকে বইলে দিচ্ছি, আর ছ' মাস দেইখবো, ব্যস, তারপরেও যদি পেটে না ধরতে পারো—

অন্ধকারে তাকিয়ে চুপ করে রইলো পুষ্প, আর ব্রজেশ একটা বুনো মোষের মতো দলিত করতে লাগলো তার শরীর। বলতে লাগলো, দ্যাখ ক্ষমতাটা দ্যাখ একবার, আজ তোকে আমি মেইরে ফেইলবো, তোকে বুঝিয়ে ছাইড়বো কেমন বাঁজা পুরুষ আমি। নিষ্ক্রিয় পরিশ্রমে বিধ্বস্ত হতে হতেও পুষ্প বললো, চলো না, আমরা দু' জনেই একদিন একজন বড়ো ডাক্তারের কাছে গিয়ে পরীক্ষা করিয়ে আসি।

চুপ করো। নিজের গুণ আর ঢাক পিটিয়ে না-বেড়ালেও চইলবে। পুরুষ কখনো বাঁজা হয় না। ওসব মেয়েমানুষেরই নাড়ির দোষ।

পরের দিন পুষ্প আবার ডাক্তারের কাছে গেল। ঘর ভর্তি রোগী। তাকে বসে থাকতে হলো অনেকক্ষণ। তা হোক, বেলা চারটে থেকে রাত আটটা পর্যন্ত ব্রজেশ ঘরে ফেরে না, শাশুড়িকেও যথেষ্ট খাবার দিয়ে রাখা হয়েছে, সুতরাং দেরি হলে খুব বেশী ভয়ের কিছু নেই। বসে থাকলো সে। ডাক পড়লো একেবারে শেষে।

কী ব্যাপার ? ডাক্তার হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে চশমার কাচ মুছলেন

আমার স্বামী বিশ্বাস করে না যে পুরুষও অনেক সময় জন্মদাতা হতে অক্ষম থাকে।

তাকে নিয়ে আসুন না।

আসবে না।

আপনাকে আমি কাল যা যা বলেছি, উনি শুনেছেন সেসব কথা ?

না। আমি তাকে লুকিয়ে এসেছিলাম, আজও লুকিয়ে এসেছি।

লুকিয়ে ?

হ্যাঁ।

কেন ?

আজ আর একবার পরীক্ষা করাতে।

কালকেই তো করলাম।

আমি বইয়ে পড়েছি বিলেতে ইনজেকসন দিয়ে কৃত্রিমভাবে বাচ্চা জন্মানো যায়—

কী বইয়ে পড়েছেন।

একটা উপন্যাসে।

খুব উপন্যাস পড়েন বুঝি ?

আপনার কাছে সে রকম কোনো বন্দোবস্ত নেই ?

ডাক্তার অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ঠিক আছে চলুন দেখি।

দেখলেন, খুব ভালো করে দেখলেন, বুকের কাপড় সরিয়েও দেখলেন। শেষে স্বগতোক্তির মতো করে বললেন, অতিশয় উর্বর জমি, অতিশয় সুন্দর যৌবন। এই যৌবনভূমিতে কার না বীজ ফেলতে ইচ্ছে করে।

পুষ্প টেবিল থেকে নেমে শাড়ি ঠিক করতে করতে বললো, আমার স্বামী আমাকে ছ' মাসের সময় দিয়েছেন, তার মধ্যে যদি সন্তান পেটে না আসে—

আসবে। আমি তার বন্দোবস্ত করে দেবো। সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ডাক্তার এ ঘরে এলেন। বললেন, শুনুন, আজ আর ভিজিট দিতে হবে না, কিন্তু আরো দু' চারদিন আসতে হবে।

আমি গোপনে পাঁচ শো টাকা জমিয়েছি, মা হবার জন্য আমি সেটা খরচ করবো, আপনি ভাববেন না।

এতোটুকু মেয়ের আবার মা হবার শখ—পিঠে হাত চাপড়ে সামান্য আদর করলেন বয়স্ক বলিষ্ঠ ডাক্তার।

পুষ্প বাড়ি চলে এলো।

কিন্তু আবার পরের দিন গেল। আবার বসে রইলো অনেকক্ষণ, আবার ডাক পড়লো সকলের শেষে। আবার সেই উঁচু টেবিলে শুয়ে পরীক্ষা দেয়া। পরীক্ষাটা কিছু দীর্ঘস্থায়ী হলো।

যাবার সময় পুষ্প বলল, ইনজেকশনটা কবে দেবেন?

ডাক্তার ফুর্তির সুরে বললো, দেবো, দেবো, ব্যস্ত কী? যা মনে হচ্ছে বেশ কয়েক দিন নিয়মিত আসতে হবে।

তা এলো পুষ্প। এবং ডাক্তারের নির্দেশমতো দিন পাঁচেক পরে তার দোতলার শোবার ঘরেও উঠে এলো। বিপত্নীক ডাক্তার তাকে বিছানায় শুইয়ে দরজা জানালা বন্ধ করে দিল।

ঘণ্টাখানেক বাদে শাড়ি জামা ঠিক করে পুষ্প যখন বেরিয়ে আসছিলো ঘর থেকে, ডাক্তার বললেন, জানি এরপরে আর তুমি আসবে না এখানে, আমাকে একটা জানোয়ার ভাববে।

পুষ্প জবাব দিলো না।

ডাক্তার হাত ধরলো তার।

পুষ্প সরিয়ে নিলো না।

ডাক্তার কপালে চুমু খেয়ে বললেন, হয়তো ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আমি সত্যি বলছি, তোমার উপর এই লোভ আমার এক ধরণের প্রেমেরই পরিণতি।

পুষ্প দরজার কাছে সরে এলো। ডাক্তারও সঙ্গে সঙ্গে এলেন, বলা যায় না এই পরিণতির ফলেই হয়তো তুমি মা হবে।

চমকে মুখ তুলে তাকালো পুষ্প আর হঠাৎ ডাক্তারের চোখে ভয়ের ছায়া নামলো, না, না, সে যে আমার দ্বারাই হয়েছে তা তুমি বলতে পারবে না, স্বামীর দ্বারাও হতে পারে। অনেকের বিয়ের দশ বছর বাদেও বাচ্চা হয়।

এবার একটু হাসলো পুষ্প, চোখ নামিয়ে বললো, ব্যস্ত হবেন না, আপনাকে আমি বিপদে ফেলবো না।

না, না, সেজন্য নয়, সেজন্য নয়—

পুষ্প সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো।

বাড়ি এসে দেখলো, বিছানার উপর আসন পিঁড়ি হয়ে বসে আছে ব্রজেশ। তাকে দেখেই হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, কোথায় গিয়েছিলে?

সেই বিয়ের রাত থেকেই স্বামীর ভয়ে কাঁটা পুষ্প, নিষ্পৃহ গলায় জবাব দিল, কাছেই।

কেন গিয়েছিলে?

কাজ ছিলো।

কার হুকুমে গিয়েছিলে?

মুখ তুলে তাকালো সে।

বলছি কার হুকুমে তুমি বাড়ির বাইরে পা দিয়েছিলে। ব্রজেশ গর্জে উঠে দাঁড়ালো।

পুষ্প ঠাণ্ডা গলায় বললো, মারবে নাকি?

নিশ্চয়ই। শুধু মারবো না, মেরে ফেলবো, পুঁতে ফেলবো।

স্বভাব অনুযায়ী পুষ্প আবার চুপ করে গেল। রান্না ঘরে যাচ্ছিলো, ব্রজেশ হাত টেনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললো, আমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করো আর কখনো আমার অনুমতি না নিয়ে বাড়ি থেকে বেরুবে না।

পুষ্প শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ঝাঁকানি দিল ব্রজেশ। তবু স্থির। ব্রজেশ ঘাড় ধরে তাকে নিচু করে দিলো পায়ের উপর, চুলের গোছা ধরা রইলো বাঁ হাতে, টানের চোটে উপড়ে আসতে চাইলো।

তারপর ছেড়ে দিয়ে বললো, ঠিক আছে যাও, খাবার আনো, আমি তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়বো. শরীর ভালো না।

অন্য দিন ব্রজেশ আসেই আটটার পরে, খেতে খেতে ন'টা, শুতে শুতে প্রায় দশ। কাজ সেরে আসতে পুষ্পর আরো খানিক দেরি হয়, সেই সময়টায় ব্রজেশ বউর জন্য অপেক্ষা করতে করতে দোকানের হিসেব মেলায়।

আজ পৌনে আটটাতেই খেতে বসলো, সওয়া আটটাতেই শুয়ে পড়ে বললো, ওসব হাঁড়ি-কুড়ি ফেলে রাখ, হাত পা ধুয়ে চলে এসো শুতে, আমার ঘুম পেয়েছে।

ব্রজেশের নিষ্ঠুর হাতের নিপীড়নে ঘাড়ে পিঠে ব্যথা করছিলো পুষ্পর, চুলের গোড়া পাকা ফোড়ার মতো ফুলে উঠছিলো, স্বামীর নির্দেশ মতো সত্যিই হাঁড়িকুড়ি সে ফেলে রাখলো, এঁটো বাসন তেমনিই পড়ে রইলো মেঝেতে, এমন কি পিঁড়িটা পর্যন্ত তুললো না, হাত পা ধুয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই চলে এলো ঘরে, মশারির ভিতর থেকে বউর বাধ্যতায় খুশী হলো ব্রজেশ, লুঙ্গির কসিটা একেবারে খুলে দিল কোমর থেকে।

পিছন ফিরে কী খুঁজছিলো পুষ্প, স্ত্রীকে শয্যায় পাবার জন্য অধীর হয়ে বললো, বাতি নিবিয়ে এসো শিগ্গির।

বাতি নিবে গেল। ঘুটঘুট্টি অন্ধকার ঘরে কতোক্ষণ চোখ চললো না। কিন্তু বিছানায় এলো না পুষ্প, মুখস্ত রাস্তা বেয়ে সেই অন্ধকার হাতড়েই খোলা দরজা দিয়ে নিঃশব্দে বারান্দায় এলো, বারান্দা থেকে উঠোন, উঠোন পেরিয়ে রাস্তা।

এতোদিন তার কতো ভয় ছিলো, চিন্তা ছিলো, দুঃখ বেদনায় জর্জরিত

ছিলো হৃদয়, অনুভব করলো সেই মুহূর্তে একটা দুর্জয় সাহস আর আত্ম-বিশ্বাস ছাড়া কিছু নেই সেখানে। সে অনায়াসেই ভাবতে পারলো তার নিজের জীবন নিজের, নিজের দায়িত্ব নিজের। ব্রজেশের আশ্রয় ভিন্নও তার বেঁচে থাকার পথ আছে। আর এই শরীর, প্রতিদিনের ব্যবহারে যা ক্লেদাক্ত ও কর্দমাক্ত, এখন যা ম্লান ও পবিত্র, ব্রজেশের বলাৎকার থেকে তাকে রক্ষা করার দায়িত্বও তার নিজের।

আকাশে মুখ তুললো সে, বললো, ভগবান, তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই।

কেউ নেই? ডাক্তার, তুমিও নেই? হঠাৎ একটা সুতীব্র ভালোবাসার দুঃসহ যন্ত্রণায় তার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হয়ে গেল।

তাকিয়ে দেখলো তার পা নিজে থেকেই কখন এসে ডাক্তারের দরজায় থেমেছে।

ঘাস মাটি

পাকিস্তান থেকে কয়েকটি ছেলেমেয়ে এলো। ঢাকা থেকে তারা কলকাতা দেখতে এসেছে। শহর দেখা তো আছেই, একজন মানুষকে দেখতে চায়। একদা রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বাধীনতা আন্দোলনে কিছু অবদান ছিলো তাঁর, এখন তিনি নগণ্যা। কোথায় এক অন্ধ গলিতে থাকেন, কোনো এক ছোটো স্কুলে শিক্ষয়িত্রী-গিরি করেন, আর বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে হিন্দুমুসলমানের মিলনের সেতু তৈরির ব্যর্থ চেষ্টায় গলদঘর্ম হন। কোনোরকমে দিন কাটে।

এক সময়ে তিনিও ঢাকানিবাসী ছিলেন, সেখানে অনেকের মনে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। অনেক দুঃসাহসিক কাজের নেত্রী ছিলেন তিনি, লাঠি খেলায়, ছোরা খেলায় দক্ষ ছিলেন, সিদ্ধহস্তে বন্দুক চালাতে পারতেন। দেশ স্বাধীন হবার কিছু আগেই পলাতক হয়ে চলে আসেন, তারপর আর খোঁজ নেই। ইংরেজ সরকার তখন তোলপাড় করেছিলো তাঁর জন্য, তাঁর মস্তকের দাম দশ হাজার টাকা ধার্য ছিলো। নাম মাধবী মিত্র।

মাধবী মিত্র :

আর পাঁচটা দ্রষ্টব্যের মধ্যে ছেলেমেয়েরা যখন মাধবী মিত্রকেও দেখতে চাইলো, তাদের এখানে নিয়ে আসার, মানে পাকিস্তান থেকে ভারতবর্ষে আসবার সমস্ত বন্দোবস্ত করে দেবার মালিক একজন বিখ্যাত সাংবাদিক বন্ধুর ভুরু তখন কুঁচকে গেল। কিন্তু পরিচয়ের বিস্তৃত বিবরণ শুনে মনে পড়ে গেল নামটা। মাথা ঝুলিয়ে বললেন, ঠিক। ঠিক। এবং যেহেতু সাংবাদিকদের পক্ষে কিছুই অসাধ্য নয়, সুতরাং খোঁজখাঁজ করে দুদিনের মধ্যেই বার করে ফেললেন ঠিকানা, তারপর সন্ধ্যাবেলা একটি গাড়ি দিয়ে ছেলেমেয়ে ক'টিকে পাঠিয়ে দিলেন নির্দিষ্ট বাড়িতে।

বাঁশিগঞ্জ স্টেশন ছাড়িয়ে আঁকাবাঁকা এক সরু গলির মধ্যে প্রবেশ করলো তারা, একটি নিচু একতলা বাড়ির দরজার নম্বর মিলিয়ে টোকা দিল।

টোকা শুনে মাধবী মিত্র নিজেই দরজা খুলে দিলেন, অবাক চোখে তাকিয়ে থেকে বললেন, কাকে চান ?

গলার স্বর অত্যন্ত নরম, একখানা সাদা খোলের সবুজ পাড় শাড়ি পরনে, কাঁচাপাকা চুল পিঠ ঢেকে কোমর পর্যন্ত নেমে এসেছে, মৃদু মৃদু চন্দনের গন্ধে বোঝা গেল এই মাত্র স্নান করে এসেছেন। মুখশ্রী বিধুর এবং লাবণ্যে ভরা, ছিপছিপে গড়ন প্রায় রোগার দিকে।

ছেলেমেয়েরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করে বললো, আমরা ঢাকা থেকে এসেছি।

ঢাকা! চোখের স্তিমিত দৃষ্টি সহসা উজ্জ্বল মনে হলো।

আপনাকে দেখতে এসেছি।

আমাকে! আবছা হাসলেন তিনি, বললেন, আসুন। ভিতরে আসুন।

ভিতরে একখানাই ঘর, ঘরখানা বড়ো। সামনের দিকে একটু ছোট বসবার ব্যবস্থা। দেয়াল ভর্তি বই। ডানদিক ঘেঁষে ঐপাশে রঙিন বেডকভার ঢাকা একটি তক্তপোষ, ঐটিই বোধহয় তাঁর শয্যা।

বললেন, বসুন। দুটো বন্ধ করে রাখা জানালা খুলে দিতে দিতে বললেন, ট্রেন যায়, যেমন শব্দ তেমনি কয়লার গুঁড়ো, ঐজন্যে বন্ধ করে রাখি।

জানালা দিয়ে ফুরফুর করে হাওয়া এলো। ছেলেমেয়েরা যার যার নিজের নাম এবং পরিচয় ঘোষণা করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসলো।

একটি মেয়ে বললো, আমাদের যিনি গুরু, পরিচালক এবং নেতা, তিনিই আমাদের আজ আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

আর একটি মেয়ে বললো, তাঁর কথা আমাদের কাছে বাণী। আমরা, মুসলমান মেয়েরা আজ তাঁর দয়াতেই সূর্যের তলায় দাঁড়াবার অধিকার পেয়েছি, স্কুলে কলেজে আমরা প্রায় সমান সংখ্যক হয়ে উঠেছি ছেলেদের সঙ্গে।

এবং আমরা ছেলেরা, একটি ছেলে উঠে দাঁড়ালো, ভাষার জন্য, বাংলা ভাষার জন্য যে লড়াইতে জিতে আজ সগর্বে বলতে পারছি, রবীন্দ্রনাথ আমাদেরও কবি, তাও ওনারই জন্য।

অন্য একটি ছেলে ছোটো ঘরে বসবার জায়গার অভাবে এমনিতেই দাঁড়িয়েছিলো, সে বললো, এবং একথাও ওনার কাছেই বলতে শিখেছি, আমরা দুই বাংলার মানুষ এক প্রাণ, এক আত্মা, বিভেদ সেখানে মূঢ়তার নামান্তর।

কে তিনি? সাগ্রহে প্রত্যেকের মুখে মুখে চোখ ফেললেন মাধবী মিত্র।

এই চিঠিটি তিনি দিয়েছেন আপনাকে, এর থেকেই আপনি সব জানতে পারবেন।

চিঠি। আমাকে?

আপনার ঠিকানা আমরা জানতাম না, খুঁজে বার করতে পারবো জানতাম। এবং পেরেছি।

এখুনি চিঠিটা খুলে পড়লে কি আপনাদের আপত্তি আছে?

একটুও না। এবং আপনি আমাদের তুমি বলুন।

বেশ তো। মৃদু হেসে মাধবী মিত্র খামের মুখ ছিঁড়ে, চিঠিখানা বার করলেন। তারপর পড়লেন, "মাধবী, আমি ইয়ুসুফ। তুমি কোথায় আমি জানি না, এই চিঠি এরা তোমাকে খুঁজে বার করে দিতে পারবে কিনা তাও জানি না, তবু আশা। আশা ঘাসের মতো, হাজার অযত্নেও তার জীবনের ক্ষয় নেই। কিন্তু কথাটা তা নয়, কলকাতায় আমার কিছু সম্পত্তি আছে, আমি মৃত্যুর আগে সেটা তোমার হাতে তুলে দিয়ে যেতে চাই। ইচ্ছা একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, যেখানে সব ধর্মের সব মানুষ সেবা পাবার

অধিকারী হবে। এবং একটি অবৈতনিক স্কুল, সেখানে সব ধর্মের সব শিশুরা বিশ্বমানবতায় দীক্ষিত হবে।

চিঠিখানা পড়ে মাধবী মিত্রের বড়ো বড়ো চোখে ছায়া নামলো, চুপ করে থেকে 'আসছি' বলে উঠে গেলেন।

গলা নিচু করে ছেলেমেয়েরা বলাবলি করলো, কী সুন্দর দেখতে।

আমার অনুমানই ঠিক, ইনিই তাঁর প্রেরণা।

শুনেছিলাম মস্ত বড়োলোকের মেয়ে, ঈশ্। কীভাবে আছেন

প্রায় বন্দি।

বিয়ে করেননি বোধহয়।

ঘরে ঢুকলেই মানুষের রুচি বোঝা যায়, কী ঘরকে কী সুন্দর করে রেখেছেন।

কতো বই।

ওটা বোধহয় অরিজিন্যাল পেইনটিং।

পর্দা সরিয়ে দুহাতে দুখানা বড়ো থালায় খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলেন মাধবী মিত্র। চাপা নিঃশ্বাসে বললেন, কেউ এলে যে অভ্যর্থনা করবো, এমন সঙ্গতিও আমার নেই। থাকি একা, নিঃসঙ্গ, যা এনেছি একসঙ্গে ভাগ করে খেলে আমি খুব কৃতজ্ঞ হবো।

ওমা, কৃতজ্ঞ কী? নিশ্চয়ই—মেয়েরা তাড়াতাড়ি উঠে তাঁর হাত থেকে নিয়ে নিল থালা দুটি।

কিছু কম খাবার আনেন নি। [illegible]টার রুটি, আলুভাজা, পুঁইয়ের শাক, পুদিনার চাটনি—নিশ্চয়ই নিজের রাত্তিরের খাবার। যত্ন করে খাওয়ালেন বসে, একপট কফি করেও নিয়ে এলেন। ছেলেমেয়েরা বললো, আপনাকে একবার ঢাকা নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করবো, যাবেন কিন্তু।

আমি যাবো? দূরে কোথায় চোখ ভাসিয়ে দিলেন, ভেজা-ভেজা গলায় বললেন, যা ছেড়ে এসেছি, ছিঁড়ে এসেছি, আর কি তা ফিরে পাব গিয়ে?

আমরা আছি।

তোমরা! হ্যাঁ তোমরা আছ, তোমাদের জন্যই হয়তো আবার ছেঁড়া তার জুড়ে যাবে। কিন্তু আমি কি বেঁচে থাকবো ততোদিন?

সেদিন সুদূর নয়। দেখবেন আপনি। তারা উঠলো। জিজ্ঞেস করলো চিঠির কোনো জবাব আছে কিনা।

বললেন, তার আগে ভাববার আছে অনেক। কেশে গলা পরিষ্কার করে বললেন, ওঁর স্বাস্থ্য ভালো আছে তো?

ওরা চোখ নিচু করলো, বেদনার্দ্র গলায় বললো, দুবার দুটো স্ট্রোক হয়ে প্রায় অচল। ডাক্তারী মতে মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে।

অ্যাঁ?

আসলে বহু বছর যাবত হার্টের কষ্টে ভুগছেন তো—

হার্টের কষ্ট ?

স্বদেশীর সময় কারা গুলি করেছিলো মেরে ফেলার জন্য, প্রাণে বেঁচেছেন কিন্তু হৃদ্‌যন্ত্রটি বিকল হয়ে গেছে।

ও।

তা হলে চলি। ওরা মাথা নিচু করলো, তিনি তাঁর কম্পিত হাত ওদের মাথায় ছোঁওয়ালেন।

গাড়ি ছেড়ে দিল, অন্ধকারে বাঁক নিয়ে চলে গেল ওরা।

মাধবী মিত্র তবু দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন চুপ করে।

ঘরে এসে আর খাওয়া দাওয়া করলেন না। ওদের পরিত্যক্ত বাসন তুলে নিয়ে ধুয়ে রাখলেন। তারপর শুয়ে পড়লেন আলো নিবিয়ে। মনে হলো অনেকদিন ধরে একটা ওষুধের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে জেগে উঠেছেন।

জেগে উঠেই শুনতে পাচ্ছেন প্রভাসদার গুমগুমে গলা, লোকে বলে, শহরের নতুন ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়িখানা প্রতি সন্ধ্যায়ই তোমাদের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে, এটা কি ঠিক কথা ?

চব্বিশ বছর বয়সের নির্ভীক মাধবী হঠাৎ ভয় পেয়ে চমকে উঠে জবাব দেয়, হ্যাঁ।

কেন ?

পরিচয় ছিলো।

কদ্দিনের ?

একটু লাল হয় সে। অনেক দিনের অনেক কথা মনে পড়ে যায়। চুপ করে থেকে বলে, রাজসাহী কলেজে বাবার ছাত্র ছিলো, আমাদের বাড়ি আসতো।

তোমার বাবা প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন ওখানে। ছাত্ররা তো সাধারণত তাদের প্রোফেসরের বাড়ি যায়, তোমাদের বাড়ি কেন ?

ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিলো, বাবা খুব ভালো বাসতেন।

আর তাঁর মেয়ে ?

প্রভাসদা তাকিয়ে থাকেন স্থির দৃষ্টিকে। যেন সম্মোহন করেন, পরিষ্কার স্পষ্ট উচ্চারণে নিচু গলায় বলেন, এ পরিচয় তোমাকে মুছে ফেলতে হবে।

মুছে ফেলতে হবে ?

যা বলছি নিঃশব্দে শোনো। আমি চাই না আমার দলের কোনো ছেলে-মেয়ের এতোটা অধঃপতন হয় যে ইংরেজ সরকারের একটা পা-চাটা কুকুরের সঙ্গে তাদের কোনো সংস্রব থাকে।

প্রভাসদার আদেশ অমোঘ। তার উপরে কোনো কথা নেই। কোনো যুক্তি তর্ক ভালোবাসার প্রশ্ন নেই। ভারাক্রান্ত মনে মনে বাড়ি ফিরে আসে সে। আর আসা মাত্রই শহরের নতুন কর্তা বংশবদের মতো উঠে দাঁড়ায় হাসিমুখে, কোথায় গিয়েছিলে ? কতোক্ষণ এসে বসে আছি।

মাধবী যথাসম্ভব কঠিন করে তোলে নিজেকে, বাঁকা হেসে জবাব দেয়, কী করে জানবো, হাকিমসাহেব স্বদেশী গুণ্ডা না ঠেঙিয়ে এইসব নির্দোষ গরীব গৃহস্থের বাড়িতে এসে রোজ রোজ হানা দেবেন।

যুবকটি তেমনি হাসি মুখে বলে, স্বদেশী গুণ্ডা তো সর্বত্র, গৃহস্থ-বাড়ি থেকেই তো কারণে অকারণে ঘুরতে বেরোয় তারা।

তা হলে কি এ বাড়িতে তিনি তার গন্ধ পেয়েছেন?

পেয়েছি।

তা হলে তাঁর কর্তব্য কী?

ধরে বেঁধে নিজের কুঠিতে নিয়ে যাওয়া।

গ্রেপ্তার?

হ্যাঁ।

আজকাল বুঝি পরোয়ানা লাগে না?

আমার লাগে না।

উত্তর বাংলার নবাব পরিবারের কন্দর্পকান্তি ছেলেটি দুইচোখ ভরা উত্তাপ নিয়ে তাকিয়ে থাকে মাধবীর দিকে। মাধবী অস্থির বোধ করে সেই দৃষ্টির সামনে।

মাধবী।

মাধবী পর্দা সরিয়ে ভিতরে যাবার ভঙ্গি করে বলে কিছু মনে কোরো না, আমি ক্লান্ত, আমার বিশ্রাম দরকার।

আমারও ঠিক তাই। আমি ক্লান্তি জুড়োতেই এখানে আসি, আমার বিশ্রম্ভালাপের সঙ্গী —

উঃ, কী বাজে বকতে পারো।

আমি তোমাকে একটা কথা মনে করিয়ে দিতে চাই।

কী?

সমাজ সংসার সমস্ত তুমি এক মুহূর্তে ভাসিয়ে দিতে পারো, একথা কি তুমি আমাকে একাধিকবার বলোনি?

আমি তুলে নিচ্ছি সে কথা।

তোমার চিঠিতে আমি তোমার চোখের জল ছুঁয়েছিলাম, বিলেতে বসে। আমি আর কোনোদিকে তাকাইনি।

তার মানে তোমার বয়েস বেড়েছে, বুদ্ধি বাড়েনি। এবার তুমি আসতে পারো, ইরুসুরু।

নিজেকে খুব বাহবা দিয়ে সে ঢুকে যায় ভিতরের দিকে। সোজা শোবার ঘরে। এই আত্মনির্যাতনে তার অশেষ তৃপ্তি হয়। শুধু গলাটা বন্ধ হয়ে আসে বারেবারে।

প্রভাসদার গুমগুমে গলা আবার ড্রাম পিটোতে থাকে বুকের মধ্যে, তুমি কিন্তু সাবধান হচ্ছো না, মাধবী। যদি নিজের সুখকেই বড়ো করে দ্যাখো, তোমাকে আমি সরিয়ে দেব এ পথ থেকে। এটা কোনো ব্যক্তির আশ্রম নয়।

অন্য আর একটি গলাও বলে ওঠে, শোনো মো, তোমার প্রতিবিধি

তোমার মা বাবা না-জানলেও আমি জানি। তুমি কিন্তু ভুল রাস্তায় পা দিয়েছ।

মাধবী ফেটে পড়ে. ভুল তো বটেই, তোমার মতো যখন গোয়েন্দা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি না।

এই গোয়েন্দা হতে তুমিই আমাকে একদিন প্ররোচিত করেছিলে।

তাই নাকি ?

বলেছিলে তোমার বাবা জাত মানেন না, যোগ্যতা মানেন এবং তাঁর কাছে যোগ্যতার সবচেয়ে বড়ো মাপকাঠি হলো বিলেত গিয়ে আই-সি-এস হওয়া। তোমার মা-ও—

বাতুল।

বাতুল আমি নই, তুমি। তুমিই এক শ্বাপদসংকুল রাস্তায় পা দিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছ। তুমি ফেরো।

আমি তোমাকে অসম্মান করতে চাই না, কিন্তু কোনো অনধিকার চর্চার সুযোগও আমি তোমাকে দেব না।

এর পরে বাবা।

মাধু।

বলো।

মুসলমান বলে আমার কোনো আপত্তি নেই, তোমার মাকেও আমি বুঝিয়েছি। মানুষ হিসেবে ওর চেয়ে উঁচুদরের ছেলে আর আমার চোখে পড়েনি। তুমি আমাদের একমাত্র সন্তান. তোমার বিয়ের বিষয়ে আমরা অনেক বাছাবাছি করেছি, অনেক যোগ্য পাত্রও উপস্থিত করেছি তোমার সামনে। তখন বুঝিনি, এখন বুঝতে পেরেছি বিয়েতে তোমার অসম্মতির আসল কারণটা কী? তোমার সুখই আমাদের সুখ, আমি সমাজের মুখ চেয়ে তোমাকে কষ্ট দেবো না।

মাধবী দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে রক্ত বের করে ফেললো। আর ইয়ুসুফ এসে বললো, তোমাদের দলের পাণ্ডাটির খোঁজ পাওয়া গেল এতোদিনে। লোকটি কিন্তু ভালো নয়, মৌ, আমি সত্যি বলছি. তোমার বয়েস অল্প, তোমাকে ও ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে।

ইয়ুসুফ, আমি তোমাকে অনেকদিন সহ্য করেছি, কিন্তু তোমার আত্ম-সম্মান নেই—

আত্মসমান ? ইয়ুসুফ হাসলো, আমার আত্মাতো আমি তোমার কাছেই বন্ধক রেখেছি, আলাদা অস্তিত্বের আর মূল্য কী ?

তুমি যাও যাও,—

যাবো না। আমি গেলে কে তোমাকে বাঁচাবে ? এক হ্যাঁচকা টানে সে নিয়ে এলো তাকে বুকের কাছে। শোনো কান পেতে শোনো, কোথায় তোমার জীবন, তোমার বেঁচে থাকার অর্থ, তোমার জন্য কী উত্তপ্ত অভ্যর্থনা টগবগ করছে এখানে। মাধবী, মাধু আমার মৌ, তুমি দ্যাখো আমি আমার সেই ছাত্র জীবন থেকে এপর্যন্ত এক পা-ও কোথাও গিয়েছি কিনা,

আমি আজো সেখানেই থেমে আছি একভাবে থেমে আছি সেই থেকে যখন তুমি রাজসাহীতে ছিলে, তোমার পনেরো বছর বয়েস আঠারোতে পেঁছিলো, আঠারো বছর—

চুপ। অসভ্য। ইতর। নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে একটা চড় মারলো তার গালে, হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, আমি তোমাকে ঘৃণা করি। তুমি যাও।

ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্রভাসদা। জানো, লোকটা কি সাংঘাতিক কমিউনেল? একজন মুসলমান ম্যাজিস্ট্রেটকে এখানে আনার উদ্দেশ্যই তো তাই যাতে শুধু আমাদের বিপ্লবকে দমন করাই নয়, আমাদের ধর্মকেও বিনষ্ট করে।

ভয়ে ভয়ে মাধবী বললো, আমাদের ধর্ম কী প্রভাসদা? প্রভাসদার চোখ আবার স্থির হলো মাধবীর উপর সেই সম্মোহনী চোখ। ধীরে ধীরে কেটে কেটে উচ্চারণ করলেন তিনি, আমাদের ধর্ম ধর্মান্ধদের উচ্ছেদ করা। কিন্তু তার আগে আর একটি ধর্ম আছে।

কী?

সে ভার আমি তোমাকেই দেব, তুমি, একমাত্র তুমিই তার যোগ্য।

কিন্তু সে ভার কী, তা জানবার আগেই খুব ধরপাকড় চললো কয়েকদিন, হুসনি দালানের কাছ থেকে আরম্ভ হয়ে সারা শহরে একপশলা দাঙ্গা হয়ে গেল, ইংরেজ প্রভুরা দরিদ্র অশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে অনবরত বিষোদ্গার করতে লাগলো, হিংস্র অবস্থাটা জিইয়ে রাখবার জন্য, খাস ইংরেজের বাচ্চা পুলিস সাহেবের অত্যাচারে মানুষ বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। প্রভাসদা বললেন, প্রচ্ছন্ন থেকে সব কিছুর পরিচালনা ভার যার হাতে, সে পুলিস সাহেব নয়।

দলের লোকেরা চোখ গোল করে বললো, কে? কে?

ম্যাজিস্ট্রেট ইয়ুসুফ আলি খাঁ।

কিন্তু শুনতে পাই তিনি নাকি গান্ধীবাদী?

পাপীদের সর্বদাই ছদ্মবেশ থাকে, সেটাই তাদের ধর্ম।

অতএব?

অতএব কী? দুই চোখে অন্ধকার নিয়ে মুখে মুখে তাকালো মাধবী. প্রভাসদা গীতা আওড়ালেন: দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, পশুগণের মধ্যে আমি সিংহ, বেগবানদিগের মধ্যে আমি বায়ু, আমিই আকাশাদি সৃষ্ট বস্তুসকলের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার কর্তা। আমিই পরমেশ্বর, আমিই সর্বকর্ম ফলের বিধানকর্তা।

সকলেই মাথা নিচু করে উচ্চারণ করলো, ঠিক।

আমিই সর্বভূতে বীজস্বরূপ, আমিই একপাদমাত্র দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করে আছি।

আমরা কী করবো হুকুম করুন। সকলেই শিহরিত জাগ্রতে সদগদ হলো।

চোখ বুজে থেকে আস্তে আস্তে সকলের দিকে তাকালেন তিনি, [illegible]

সেই দৃষ্টি মাধবীর মুখের উপর স্থির হলো। একই সুরে আবৃত্তি করলেন প্রাণীদিগের দেহে অবস্থিত আত্মা সদা অবধ্য, প্রাণীর দেহনাশে তোমার শোক করা উচিত নয়। যদি ধর্মযুদ্ধ না করো, তা হলে স্বীয় ধর্ম ও কীর্তি পরিত্যাগহেতু তুমি প্রত্যবায়ভাগী হবে। সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে অখ্যাতি মৃত্যু অপেক্ষা বেদনাময়। সুখে অনুরাগ ও দুঃখে দ্বেষ না করে লাভ ও ক্ষতি, জয় ও পরাজয় তুল্য জ্ঞান করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। নিষ্কাম হও এবং ঈশ্বর স্বরূপ দেশমাতৃকার্থে কর্ম কর।

আবার চোখ বুজলেন তিনি। আর মাধবীর বুকের মধ্যে ভয়ের ঢেউ ওঠাপড়া করতে লাগলো।

আর ইয়ুসুফ বললো, আগুন দিয়ে আগুন নেবানো যায় না, হিংসা দিয়ে হিংসার নিবৃত্তি হয় না, মেরে ফেলে সঞ্জীবনী খোঁজার নাম মূর্খতা। কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে মাধবী বললো, আত্মসুখী ব্যক্তিরাই সর্বদা এইসব বুলি কপচায়, তুমি আর এখানে এসো না, স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকে একটা বিয়ে করো, তারপর সাদা প্রভুদের পদলেহন করে চেষ্টা করে দ্যাখো আর কোথায় উঠতে পারো।

তারপর? তারপর কী? যেন নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে শয্যার উপর উঠে বসেন মাধবী মিত্র, সেই ফুরফুরে সুন্দর সন্ধ্যাটি মনে পড়ে যায়, যেদিন মাথার উপর গোল থালার মতো চাঁদ আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দিচ্ছিলো শহর। যেদিন প্রভাসদা প্রথম তাঁর হাতে তাঁর যোগ্য কাজ বলে যা বিবেচিত তাই তুলে দিয়েছিলেন। ঠাণ্ডা ইস্পাতের স্পর্শে যেদিন তিনি সাপের গায়ে হাত পড়ার মতো করে চমকে উঠেছিলেন। নিভৃত কক্ষে যেদিন সমস্ত বুঝিয়ে দিতে দিতে সাপের চোখেই তাকিয়েছিলেন প্রভাসদা।

শেষ মুহূর্তে একটু বদলে দিলেন প্ল্যানটা। ইস্পাতের ঠাণ্ডা যন্ত্রটি তিনি জিতেশের হাতে দিলেন। অর্থাৎ জিতেশ তার সঙ্গী হলো। একটি সতেরো বছরের অপাপবিদ্ধ ছেলে, সারাদিন টগবগিয়ে ফুটছিলো কিছু একটা ভয়ঙ্করের জন্য, বিপ্লবের নেশায় তার কাছে জীবন-মরণের সত্যিই কোনো তারতম্য ছিলো না।

মোহিনী সেজে মাধবী সেদিন কালেক্টরের কুঠিতে কালেক্টারের মান ভাঙাতে ঢুকেছিলো, মুখের কথাই কি সব, ইয়ুসুফ আমার মনের কথা কি তুমি জানো না? তবে কেন রাগ করে আছ? 'এসো না' বলেছি বলেই কি সত্যি তুমি আসবে না; তা কখনো হয়?

অভ্যর্থনায় উদ্বেল ইয়ুসুফ হঠাৎ চুপ করে গিয়ে কী একরকম দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিলো তার দিকে, গাঢ় গলায় বলেছিলো, কী চাও তুমি আমার কাছে? কী আমার অদেয় আছে তোমাকে?

ভিতরে ভিতরে কম্পন উঠলো একটা। চোখে চোখে তাকাতে গিয়েও চোখ নামিয়ে নিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে মাধবী বললো, তোমার লোকজনরা সব কোথায়?

ছুটি দিয়ে দিয়েছি। তুমি তো জানো, সাড়ে আটটার পরে আমি কাউকেই আটকে রাখি না। এসো, ঘরে এসো।

মাধবী ঢোঁক গিললো, বাগানে বসবে? কী সুন্দর জ্যোৎস্না।

চলো।

বাগানে এলো তারা, গেটের বাইরে তাকিয়ে ইয়ুসুফ বললো, তোমাদের গাড়ি তা হলে ঠিক হয়ে গেছে?

হ্যাঁ। গলাটা কি কেঁপে গেল।

নিজেই চালিয়ে এসেছো?

হ্যাঁ। অদূরে, যেখানে গাছের ঝুপসিতে দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটা চোখ গেল সেদিকে।

ভিতরে আনোনি কেন?

কী দরকার? গেটটা বন্ধ ছিলো তাছাড়া। মাধবী অনুভব করতে চেষ্টা করছিলো, জিতেশ এখন কী করছে।

মাধবী—

বলো—গাড়ির ভিতরে, কাচ ঢাকা পর্দা ঢাকা অন্ধকারে স্বয়ং প্রভাসদা বসে আছেন, জিতেশ আছে মাত্র কয়েক হাত দূরে, মেহেদি বেড়ার অন্ধকারে ছায়াছায়া হয়ে, এই কাছেই, খুবই কাছে, পথ করা আছে, প্রয়োজন মতো ঢুকে আসবে ভিতরে—

মৌ—

অ্যাঁ।

চমকে উঠলে কেন?

কৈ কই, না তো।

আমি যে সত্যি তোমার জন্য প্রাণ দিতে পারি তা কি বিশ্বাস করো না?

প্রাণ? প্রাণ কেন দেবে।

তোমার ভালোবাসাই আমাকে দিব্যদৃষ্টি দিয়েছে, আমি জানি তুমি কি চাও।

কী চাই? আমি তোমার ভালো চাই, আমি তোমাকে চাই—

প্রায় কান্না ফুটে উঠলো গলায়। ইয়ুসুফ হাত ধরলো। তা-ও জানি। কিন্তু তুমি তো এখন তোমার স্ববশে নেই। তবু আমি অপেক্ষা করবো, আমি জানি একদিন তুমি ফিরবে।

ঝোপের ধারে ছোট্ট একটু আওয়াজ হলো, অমনি মাধবী নিজেকে ঝাঁকানি দিয়ে সজুত করে তুললো। নড়েচড়ে বসে বললো, তুমি কি সত্যি আমাকে ভালোবাসো ইয়ুসুফ?

এই মুহূর্তে এতো বেশী বলে মনে হচ্ছে যে আমার শরীর ছাপিয়ে তা আত্মার গভীরে প্রবেশ করেছে।

যে আত্মার মৃত্যু নেই, কী বলো?

ঠিক।

যে আত্মা অবোধ্য, কী বলো?

ঠিক।

তা হলে শরীরের বিনাশে তোমার আপত্তি নেই? একটু সরে এসে সে ছোট্ট একটি তালি দিল হাতে, তারপরেই সব ভুলে সভয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। না, না, না।

কিন্তু ততক্ষণে মাধবীর গলা ডুবিয়ে ছুটে এসেছে গুলি. নিরালা নির্জন নীলক্ষেতের কুঠি চমকে উঠেছে সেই শব্দে, তিন বিঘা কম্পাউণ্ডের বিপরীত কোণ থেকে ভৃত্য নিবাসের ভৃত্যরা ছুটে আসতে আসতে ইয়ুসুফের রক্তাক্ত শরীরের উপর তার ঝাঁপিয়ে-পড়া অর্ধচৈতন্য দেহটাকে বোধহয় প্রভাসদাই ছিনিয়ে নিয়ে তুলে এনেছেন গাড়িতে পিছনের সীটে। আর সামনের আসনে বসে জিতেশ বায়ুর বেগে ছুটিয়ে দিয়েছে গাড়ি।

না, কিছু হয়নি তারপব। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ইয়ুসুফ আলি কারো উপরেই দোষ চাপায়নি, স্বজনকে বাঁচাতে গল্প উপন্যাসের নায়করা সচরাচর যা বলে থাকে তাই বলেছিলো। বলেছিলো নিজের দোষেই নিজের পিস্তল থেকে গুলিটা ছুটে গিয়েছিলো, এবং কিছুদিনের মধ্যে চলে গিয়েছিলো ঢাকা ছেড়ে।

সে তো আজকের কথা নয়, গত জন্মের ইতিহাস। হঠাৎ এরা কোথা থেকে এলো? কবর খুঁড়ে সমস্ত অতীত কেমন করে বর্তমানে উঠে দাঁড়ালো? নির্বাপিত আগুন সে কেন আবার খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে উত্তপ্ত করে তুললো? এখন এই আগুনে, এই একা জীবনে আবার কতোদিন ধরে তিনি ঝলসাবেন?

মাধবী মিত্র উঠলেন, অন্ধকারে জানালার ধারে এসে দাঁড়ালেন, আকাশে তাকিয়ে দেখলেন আকাশ নেই, ট্রেনের কালো ধোঁয়ায় তার অবলুপ্ত ঘটেছে, শুধু শান্টিংয়ের আওয়াজ ছিঁড়ে দিচ্ছে [illegible]নের পর্দা।

কতো কাল পরে চোখে জল এলো তাঁর, ভেসে গেল গাল, ভেসে গেল বুক, তিনি আলো জেবলে টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে কাগজের প্যাড টেনে লিখলেন, ইয়ুসুফ, ভালোবাসা, সত্যিই ঘাসের মতো, সে থাকে, চিরদিন থাকে, মরে গিয়েও সামান্য জলের ছোঁয়ায় আবার তেমনি সবুজ হয়ে বেঁচে ওঠে। এই মুহূর্তে আমি এই সত্যই উপলব্ধি করে সানন্দ বিস্ময়ে তোমাকে জানাই, আত্মা আমাদের কল্পনার অনুভব, কিন্তু যা আমাদের অনুভূতির অন্তর্গত, তা হচ্ছে আমাদের প্রেম, যে প্রেম কখনো কোন সময়ের সীমায় গণ্ডিবদ্ধ থাকে না, সব বয়সেই যা সমান রোমাঞ্চ এনে দেয় জীবনে। আমি অনেক দুঃখ পেয়েছি, কিন্তু বেঁচে থাকার অর্থটাও খুঁজে পেলাম এতদিনে। বলো, এখন আমি কী করবো।

বিকেল বেলা

ট্রামে দেখা হয়ে গেল।

আরে, তুমি? ভিড়ের মধ্যে রড ধরে দাঁড়িয়ে থাকা সুমন্ত প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো।

ওমা তুমি? চমকে সামনের আসন থেকে চোখ ফেরালো অম্বু। সুমন্ত বললো, কোত্থেকে?

অম্বু বললো, জঙ্গল থেকে।

এক ভদ্রলোক অপরিসীম বিরক্তিতে কনুই দিয়ে ঠেললেন সুমন্তকে, বিড় বিড় করলেন, একটা ছুঁচ ফেলার জায়গা নেই, তার মধ্যে যত সব ইয়ে—এই বলে তিনি এর ওর দিকে তাকালেন, এরা ওরাও সর্বতোভাবে সায় দিয়ে কি কৌশলে সুমন্তকে আরও একটি ঠ্যালায় অনেকটা দূরে গড়িয়ে দিতে দিতে বললো, সরে দাঁড়ান, সরে দাঁড়ান, এখন বিশ্রাম্ভালাপের সময় নয়।

অম্বু একেবারে অপ্রস্তুত। সুমন্ত সেখান থেকেই গলা বাড়িয়ে বললো, এই উঠে পড়ো, চল নেমে যাই, নইলে আমার স্বজাতি-প্রীতি আমাকে বেশীক্ষণ ধৈর্য ধারণ করতে দেবে না।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই নামুন, নেমে জঙ্গলেই যান, নিরালা অন্ধকারে—

খুব পিন পিন করে ভিড়ের মধ্য থেকে কেউ বললো, কিন্তু কে তা বোঝা গেলো না। একটা অস্ফুট হাসির দমক বয়ে গেলো অগুণতি মানুষের নিশ্বাসে।

তেরিয়া হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল সুমন্ত, অম্বু লজ্জিত ভাবে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো। আর তাকে দাঁড়াতে দেখে সুমন্তও রাগ সামলে এগিয়ে এলো ভিড় ঠেলে।

কেমন আছো? নিচে নেমে জিজ্ঞেস করলো সে।

অম্বু বললো, তুমি কেমন আছো?

সুমন্ত মনে মনে হিসেব করছিলো, ঠিক কদিন বাদে আবার অম্বুকে দেখলো। প্রায় ভুলেই গিয়েছিলো, কি আশ্চর্য! বন্ধুদের সঙ্গে কবে না গিয়েছিলো হাজারিবাগে? বোধহয় বি. এ. ফার্স্ট ইয়ার। উনিশ-কুড়ি বছর বয়েস, মা-বাবার আওতা ছাড়িয়ে সেই প্রথম স্বাধীন ভ্রমণ। যাবার সময় মা বলেছিলেন, আমার মামার শালা আছেন সেখানে, ছেলেবেলায় তাঁকেই আমি আপন মামা বলে জানতাম, তিনিও সে রকমই দেখতেন। তুই তাঁর কাছেই উঠতে পারিস, খুশি হবেন। মার কথাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে সে বলেছিলো,

হ্যাঁহ্, চিনি না জানি না আবার গিয়ে এক গুরুজনের পাল্লায় পড়ি আর কি !

আসলে ঠিক করেছিলো ধরমশালায় উঠে খুব বেপরোয়া জীবন যাপন করে আসবে কদিন। বন্ধুরা বলেছিলো খাওয়া শোওয়া নিয়ে যদি অতই ইয়ে তা হলে তো ঘরের ছেলে ঘরে থাকাই ভাল।

কিন্তু ধরমশালায় উঠে কার্যকালে দেখা গেলো, আর যার যেমনই লাগুক, সুমন্তর অন্তত পোষাচ্ছে না। নিরিমিষ আহারে দু বেলাতেই অরুচি ধরে গেছে, মেঝেতে পাতলা তোষকে শুয়ে পিঠ ব্যথা করছে, আর সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হচ্ছে বাথরুম। এমন লাইন দিতে হয় যে প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্ম স্নান সব বেতালা হয়ে যায়। এবং এ বিষয়ে দেখা গেলো বন্ধুরাও তার সঙ্গে একমত। শেষে পরামর্শ করে একটা হোটেল ঠিক করতে বেরিয়েছিলো। আর সেখানে গিয়েই দেখা মায়ের সেই মামার সঙ্গে। চমৎকার ভদ্রলোক, পরিচয় শুনে তক্ষুনি সকলকে ধরে নিয়ে গেলেন বাড়িতে, চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় খাইয়ে এই কদিনের অর্ধাহারজনিত সকল ক্লেশ নিমেষে দূর করে দিলেন, তারপর বন্ধুরা যখন ফিরে গেলো হোটেলে, সুমন্তকে রেখে দিলেন জোর করে।

ভদ্রলোকের স্ত্রীও খুব চমৎকার। কাঁচা-পাকা চুলে, টকটকে সিঁদুরে একেবারে লক্ষ্মীপ্রতিমা। খুব সহজে তাকে তাঁরা আপন করে নিলেন, ঠিক নিজের দাদু-দিদিমার মতো।

কিন্তু বছর কয়েক আগে একমাত্র কন্যার অকস্মাৎ মৃত্যুতে স্বামী স্ত্রী দুজনেই বড়ো শোকার্ত ছিলেন। সেই কন্যারই আবার একমাত্র কন্যা নিয়ে তাঁদের ছোট সংসার। নাতনীটি দাদামশায়-দিদিমার চোখের মণি। মহাভারত ঘেঁটে নাম রেখেছিলেন অম্বালিকা। অপভ্রংশে অম্বু। এই অম্বু। এই মাত্র যে বললো সে জঙ্গল থেকে এসেছে।

যাকে সুমন্ত এক সময়ে জঙ্গুলি বলে ডাকতো। হাজারিবাগের জঙ্গলের জংলি মেয়ে।

জংলিই বটে। কি ডাকাবুকো এক দুর্দান্ত কিশোরী! দাদু-দিদিমার উপর অখণ্ড প্রতাপ। শুধু কি দাদু-দিদান! সারা পাড়ার নেত্রী সে। সমবয়সী ছেলেমেয়েদের একমাত্র সম্রাজ্ঞী। বছর চোদ্দ বয়েস, সদ্য শাড়ি ধরেছে, একটা ভোরবেলাকার টাটকা গোলাপের মত সতেজ, সুন্দর।

সুমন্ত একটু ভাব দেবে দেবে করছিলো, অম্বু টানা চোখে ভুরু কুঁচকে বিরূপ ভঙ্গিতে তেরচা করে তাকালো। দাদু বললেন, কোথায় যাচ্ছিস, আয়, তোর দাদা হয়—দাদা না হাতি! এক ঝাপটায় ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে চলে গেলো সে দলবল নিয়ে।

নতুন যুবক সুমন্ত রাগে অপমানে কান গরম করে গুম হয়ে গিয়েছিলো। দিদিমা বলেছিলেন, একটা পাগলি! ভদ্রতা সভ্যতা কিছুমাত্র যদি জ্ঞান থাকে। যে ক'দিন আছো তুমি, দিও তো ভাই একটু শাসন করে।

করবো। সুযোগ পেলেই করবো। দাঁতে দাঁত চেপে মনে মনে বলেছিলো সুমন্ত। মনে মনে বলেছিলো এই অভদ্র অমার্জিত দুঃসাহসী মেয়েটাকে যে

করেই হোক, যে ভাবেই হোক জানিয়ে দিতেই হবে তার মতো সে ঘোড়ার ঘাস কাটে না, সারাদিন সারা পাড়ার সর্দারী করে বেকার ঘুরে বেড়ায় না, সে রীতিমত একজন বি. এ. পড়ুয়া ছেলে, কলেজে বহু মেয়েই তাকিয়ে থাকে তার দিকে, আলাপ করে বর্তে যায়। এবং ইচ্ছে করলে সে এখানেও ওর সব কটা চ্যালাচামুণ্ডাকে তুড়ি মেরে ভাঙিয়ে আনতে পারে।

পরের দিন সকালে সেই দম্ভেই সে পাশের আমবাগানে গিয়ে নতুন কেনা লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরিয়েছিলো, উদ্দেশ্য দৃষ্টি-আকর্ষণ। ওরা কি এর আগে কখনও লাইটার দেখেছে? মোটেই না। সে নিজেই মাত্র ক'দিন আগে বাবার এক বন্ধুর কাছে দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলো। এখানে আসার সুযোগে, কিনে ফেললো সঙ্গতির অতিরিক্ত দাম দিয়ে। অবশ্য মা জানেন না। সিগারেট খাবার কথাটাও মা টের পাননি। কলেজে উঠে তার নতুন হাতে-খড়ি। কাশি আসছিলো খুক খুক করে।

একটা নোয়ানো আমের ডালে বসে অম্বু চোখ-মুখ ঘুরিয়ে কি বিষয়ে যেন খুব বক্তৃতা দিচ্ছিলো, আর চার থেকে চোদ্দ বছর বয়েস পর্যন্ত একপাল ছেলেমেয়ে হাঁ করে গিলছিল। সুমন্ত মুখ থেকে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে লাইটার লুফতে লুফতে এগিয়ে গিয়ে মুচকি হাসল। বয়স্ক ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললো, এই যে, কি হচ্ছে খুকি?

বক্তৃতা থামিয়ে চোদ্দ বছরের টুকটুকে খুকিটা ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকে দেখলো, তারপর আবার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে একটা ছেলেকে হুকুম দিলো, দ্যাখ্ তো পটলা, লোকটা কাকে খুকি খুকি করছে?

পটলা দেখবার আগেই সুমন্ত হাস্য বিস্তার করলো, আমি তোমাকেই বলছি।

ও, আমাকে? গাল ভরে খুকিও হাসলো, গলে গিয়ে বললো, কেন, খোকা?

বলতেই হি হি করে গড়িয়ে পড়লো সাঙ্গপাঙ্গরা। অম্বু চোখ পাকালো, এ্যাই, হচ্ছে কি? কলকাতার নতুন দাদাকে দেখে তোরা হাসছিস যে? বাবুর অপমান হয় না?

আবার হা হা হি হি।

সুমন্তর সরু প্যাণ্ট, পাতলা গোঁফ, বাঁ হাতের সিগারেট, ডান হাতের লাইটার সব যেন একযোগে কেঁপে উঠলো থরথরিয়ে। রাগে রি রি করতে করতে সে চলে গেলো সেখান থেকে।

ক'দিন খুব ঢ্যাঁড়া পিটানো হচ্ছিলো রাস্তায়। যাত্রার বিজ্ঞাপন। এবার পুজোয় দাস কোম্পানির দল, আসুন, দেখুন, দ্রৌপদী সাজবে যুবতী বুঁচিরাণী, আর কুন্তীর ভূমিকায় ন্যাসপাতি মঞ্জরী দাসী।

বুঁচিরাণী আর ন্যাসপাতি মঞ্জরী দাসী নাম শুনে হাসতে হাসতে মরে গিয়েছিলো সুমন্ত। দাদুও হাসছিলেন। বললেন, নাম শুনেই যখন এতো মোহিত, যাও না, দিদিমাকে নিয়ে দেখে এসো গিয়ে। কলকাতায় যাত্রা নিশ্চয়ই দেখনি?

সুমন্ত বললো, শুধু দিদিমাকে কেন, দাদুকেও নিয়ে যাবো।

দাদু বললেন, বাড়ি পাহারা দিতে হবে যে। তাছাড়া অম্বু যা ঘুম-কাতুরে, রাত জেগে যাত্রা দেখা ওর পোষাবে না।

যাবার বেলায় কিন্তু দেখা গেলো, অম্বুও সেজে-গুজে প্রস্তুত।

অভিভাবক হয়ে নিয়ে যেতে বেশ ভালই লাগছিলো সুমন্তর। অন্তত এখানে তো একহাত নেয়া গেলো মেয়েটাকে চলনদার হয়ে! পথে যেতে যেতে সে অনেক কর্তাগিরিও ফলিয়েছিলো, উঁহুঁ, অত আগে আগে যেও না। আলের উপর দিয়ে নয়, সাপ আছে। ঢিল কুড়োচ্ছো কেন? এই দেখো, আবার কুকুরটাকে ধরে—এই রকম অনবরত টিক টিক করছিলো। ঘন ঘন মুখ লাল হয়ে উঠছিলো অম্বুর। তেরিয়া হয়ে যে এক আধবার কিছু বলতে ওঠেনি বা যা বলছে তা আবার বেশী বেশী করে বরেনি, তা নয়। কিন্তু দিদানের বকুনির ভয়ে সুবিধে হচ্ছিলো না। দিদিমা কেবলি বলছিলেন, ছি দিদি, কথা শুনতে হয়, তোমার দাদা—

কথা ছিলো, সন্ধ্যে সাতটার মধ্যেই যাত্রা শুরু হবে। সাড়ে ন'টার আগে আরম্ভ হলো না। আর এগারোটা বাজতে না বাজতেই অম্বু ঢুলতে লাগলো ঘুমে। বিরতির সময় যখন পা ধা সাস্‌সা করে খুব কনসার্ট বাজছিলো, হারমোনিয়ম তবলা আর বেহালার ছড়ের টানে কানে তালা লেগে যাচ্ছিলো, সেই সময়ে দিদিমা চিকের বাইরে মুখ বাড়িয়ে বললেন, সুমন্ত এই ফাঁকে তুমি অম্বুকে একটু বাড়িতে দিয়ে আসতে পারবে?

সুমন্ত বলল, কেন পারবো না!

দিদিমার পিছন থেকে অম্বু হঠাৎ চোখ কচলে বলে উঠলো, না, আমি ওর সঙ্গে যাবো না।

দিদিমা গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে খোসামোদ করলেন, লক্ষ্মী সোনা, যাও। বাড়ি গিয়ে বিছানায় আরাম করে ঘুমিয়ে থাক, দাদু আছেন।

না।

এরপরে দিদিমা কি যেন একটা লোভনীয় শর্ত করলেন, যার ফলে দেখা গেল অম্বুর জেদী চেহারা বেশ শিথিল দেখাচ্ছে।

পথে আসতে আসতে সুমন্ত বলল, বাচ্চা মেয়ে, বাচ্চা মেয়ের মতো থাকবে। বড়দের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে আবার যাত্রা দেখতে এসেছিলে কেন?

অম্বু বলল, তুমি এসেছিলে কেন?

আমি এসেছি দেখতে।

আমিও তাই।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, না? একটা চশমা পরে ঘুমুলে না কেন? আরও ভাল দেখতে পেতে।

তুমি কিনে দিয়ো।

আমি কেন দেবো? আমার দায় পড়েছে। এমনিতেই তোমার যন্ত্রণায় মিছিমিছি কতখানি হাঁটতে হলো—

সাপ, সাপ! ঈষৎ চিৎকার করে উঠলো অম্বু।

সুমন্ত হাউ মাউ করে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে একাকার। আর মাঠের আকাশ-বাতাস ফাটিয়ে হাসতে হাসতে অম্বু উধাও। গাঢ় অন্ধকার বেয়ে সে যে কোথায় ছুট লাগালো কে জানে।

বড় বড় গাছে ছাওয়া মস্ত মাঠ, প্রায় বারোটার রাত্তিরে কত রকম পোকা-মাকড় ডাকছে, পাখি কাঁদছে, ডানা ঝাপটাচ্ছে, জোনাকিরা জ্বলছে নিভছে, সুমন্তর সারা শরীর কেমন শির শির করতে লাগলো একা দাঁড়িয়ে। প্রত্যেক মুহূর্তে একটা অজানা ভয় ছেয়ে ফেললো তাকে। পা বাড়ালেই মনে হতে লাগলো এই বুঝি সত্যি সে মাড়িয়ে দিলো একটা সাপ, এই বুঝি সাপটা ফোঁস করে মাথা আছড়ে লিকলিকে জিবে ছোবল মারলে একটা।

সে প্রাণপণে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলো, অম্বু, অম্বু, লক্ষ্মীটি এসো, আমি অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। বস্তুত সে সত্যিই একটু কম দেখছিলো। তখন থেকেই তার চশমা।

ছুটতে ছুটতে কোথা থেকে ফিরে এলো অম্বু, বললো, ভীতু কোথাকার! আবার চলনদার হয়েছেন! এসো, এখান দিয়ে এসো।

আমার হাত ধরো।

হাত ধরবে না আর কিছু! একা ফেলে যে চলে যাইনি তাই না ঢের।

ভূতে যখন ঘাড় মটকে খেতো, বেশ হতো।

ঘাড় মটকালে যেন একলা আমারই মটকাতো, তোমারও মটকাতো।

আমার মটকাতো? ভূতের বাপেরও সাধ্য নেই আমার ঘাড় মটকায়। আমি তো ইচ্ছে করেই তোমাকে এই অন্ধকার ভূতুড়ে মাঠ দিয়ে নিয়ে এসেছি। এত রাতে বুঝি আর কেউ হাঁটে এ পথে? দিদান জানলে দেখো'খন কেমন বকুনি দেয়।

আসার সময় তো এখান দিয়েই এলে।

সে তো বিকেল বেলা। তখন দল বেঁধে এসেছিলাম।

তা হলে খুব অন্যায় করেছ।

খুব ভাল করেছি। এখন যদি একটা ঠ্যাঙাড়ের সঙ্গে দেখা হয়, খুব মজাই হয়।

আবার ঠ্যাঙাড়েও আছে নাকি?

আছে না? চোর ডাকাত ভূত পেত্নি সাপ সব আছে এই মাঠে।

অম্বু!

কী?

আমার হাত ধরো।

কেন?

আমি দেখতে পাচ্ছি না।

মিথ্যুক। আসলে ভয় পাচ্ছো।

ঠিক আছে, তাই পাচ্ছি। হাতটা ধর না।

সিগারেট খাও কেন, ঐ টুকুন ছেলে?

কখন সিগারেট খেলাম?

সকালে খেলে না ?

তুমি ভালোবাসো না সিগারেট খাওয়া ?

না। সিগারেট খেলে ক্যানসার হয়।

কে বলেছে ?

দাদু।

দাদু কিছু জানেন না।

তুমি জানো, পণ্ডিত।

কাল থেকে দেখিয়ে দেবো কেমন পণ্ডিত. তোমার দিদিমা কী বলেছেন শুনেছো তো ?

কি বলেছেন ?

তুমি ভদ্রতা জানো না, সভ্যতা জানো না, তোমাকে শিক্ষা দিতে বলেছেন।

আহা রে আমার গুরুমশাই।

অতো আগে আগে যাচ্ছো কেন ?

ঘোমটা দিয়ে তুমি পিছনে পিছনে আসবে বলে।

তা হলে দেখবে ঘোমটা দিয়ে কাকে পিছনে পিছনে আসতে হয় ?

আচমকা এগিয়ে গিয়ে এক টানে সে কাছে নিয়ে এলো অম্বুকে, শক্ত হাতে চেপে ধরে বললো, আমার সঙ্গে তুমি পারবে গায়ের জোরে ? শূন্যে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দেবো ঐ বাঁশঝোপটার মধ্যে। নিজের জায়গায় পেয়েছো তাই। একবার যেয়ো কলকাতায়, দেখিয়ে দেবো তখন।

হাত ছাড়াবার চেষ্টায় অম্বু তাকে আঁচড়ে কামড়ে অস্থির করে দিয়েছিল, তবু সে-ও ছাড়েনি। উনিশ বছরের তপ্ত বুকের মধ্যে চেপে ধরে রেখে বলেছিল, থাকো দাঁড়িয়ে সারারাত, এই তোমার উচিত সাজা।

ছাড়ো।

ক্ষমা চাও।

না।

তা হলে আমিও ছাড়বো না।

বা রে।

এখন তোমার চোর আসুক, ডাকাত আসুক, ঠ্যাঙাড়ে আসুক, সারা হাজারিবাগের সব চ্যালাচামুণ্ডা আসুক, দেখে যাক তাদের অম্বুরাণীর কি দশা আমার হাতে পড়ে।

অম্বু তখন তার নতুন টেরিলিনের শার্টটা বুকের কাছে ছিঁড়ে দিয়েছিলো দাঁত দিয়ে।

আর তার শাস্তি স্বরূপ সুমন্তও তার আলিঙ্গন আরো দৃঢ়বদ্ধ করেছিলো।

পরের দিন কিন্তু অম্বুর চোখে একটু লজ্জা দেখা গেলো। সেই বোধহয় ওর প্রথম লজ্জা। আর সুমন্তরও বোধহয় সেটাই প্রথম প্রেম।

নইলে দু' সপ্তাহের জায়গায় ছ' সপ্তাহের সারা ছুটিটা হাজারিবাগে বসে বসে সে করলো কি ?

এই।

চমক ভেঙে সুমন্ত পাশে তাকালো।

অম্বু বললো, তুমি নাকি বিলেত যাচ্ছো?

সুমন্ত বলল, কার কাছে শুনলে?

গণ্যমান্যদের খবর কি আর চাপা থাকে? ভাল চাকরি পেয়েছো তাও জানি। সুনীলমেসো বলেছেন, এটা ব্রিটিশ ফার্ম, ওরাই পাঠাচ্ছে।

সুনীলমেসো কে?

লীলামাসির স্বামী, তোমার মা তো চেনেন। আমরা তো ওঁদের ওখানেই উঠেছি। দাদুর সবচেয়ে ছোটভাইয়ের মেয়ে।

কলকাতা কবে এসেছো বলো দেখি?

তা পাঁচ-ছ দিন তো হবেই।

পাঁচ-ছ দিন? আর আমাকে খবর দাও নি?

মনেই ছিল না তোমার কথা।

তা তো থাকবেই না, মেয়েরা ওরকমই হয়।

গাল-ভর্তি দাড়ি রেখেছো কেন?

কি রকম দেখাচ্ছে?

চে গুয়েভারার মতোও না, কাস্ত্রোর মতোও না, যেন একটা বাজে ছেলে।

কি কাণ্ড! আর জুলপিটা?

বিলেত যাবার আগে কেটে নিও। এই বেলবটম্ জুলপিগুলো আমার দু' চক্ষের বিষ।

বেলবটম্ জুলপি। খাসা নাম দিয়েছো তো! স্বরচিত নাকি? সুমন্ত গলা ছেড়ে হাসলো।

ঈশ্ শ্! কি কাণ্ড করছিলে ট্রামের মধ্যে, আমি তো ভাবলাম বুঝি মারামারি লাগিয়ে দাও। যা ভয় করছিলো না—

তোমার আবার ভয় আছে নাকি?

আছে।

কবে থেকে?

কোথা থেকে ফিরছিলে তুমি বলো তো?. সঙ্গে একজন মেয়ে ছিলো, না?

একটু চুপ করে থাকতে হলো সুমন্তকে। বলতে পারলো না আধুনিক পদ্ধতিতে বধূ-নির্বাচনের জন্য সে ঘণ্টাখানেক একটা বিলিতি হোটেলের পার্টিতে বসে বসে আলাপ করছিলো মীনা তালুকদারের সঙ্গে। মা-বাবার ইচ্ছে, বিলেত যাবার আগে সে বিয়ে করে স্ত্রীকে নিয়ে যায়। পুত্রের চপল স্বভাবের উপর বোধহয় বিশেষ আস্থা নেই তাঁদের।

সিগারেট ধরিয়ে বললো, আমি যেখান থেকেই ফিরি না কেন, তুমি একা একা কোথায় গিয়েছিলে বলো দেখি?

আমার একটা উপকার করবে?

কি?

আমাকে এম. এ. ক্লাশে ভর্তি করে দেবে?

এম. এ. ? সে কি, তুমি বি. এ. পাস করলে কবে ?

আহা, নিজে এম. এ. পাস করে চাকরিতে ঢুকে গেলেন, আর আমি বুঝি এতই গাড্ডু যে একটা সামান্য বি. এ.-ও পাস করতে পারবো না ?

তখন তো বলতে স্কুল তোমার যম, তার চেয়ে বাড়ি-বাড়ি বাসন মাজার কাজও ঢের ভাল।

তখন ? একটু হাসল অম্বু। আপাদমস্তক ভিড়াক্রান্ত বাস-ট্রামের দিকে তাকিয়ে বললো, তখনকার কথা ভুলে গেছি, কিন্তু আপাতত নামিয়ে এনে যে অকূলে ফেলেছ তা বুঝতে পারছি ভাল করেই।

অকূল কেন ?

দেখছো তো কি অবস্থা ? আর কি আমরা উঠতে পারবো মধ্যপথ থেকে ?

পারলেই বা উঠছে কে ?

তবে ?

কি সুন্দর বিকেল, কি সুন্দর হাওয়া, কি সুন্দর আমাদের গড়ের মাঠ। অনন্ত কাল ধরে এখন আমি হাঁটতে রাজী আছি।

তা তুমি হাঁট গিয়ে। ওদিকে আমার বাড়িতে যে থানা-পুলিস হয়ে যাবে, তার বেলা ?

থানা-পুলিস কেন ?

পালিয়ে এসেছি যে।

বলছ কি তুমি পাগলের মত ?

আমার কথা যদি কেউ না শোনে আমিই বা কেন তাদের কথা শুনবো ! অতো না !

বাতাসের গলায় দড়ি দিয়ে ঝগড়াটা না হয় পরে কোরো, আসল ব্যাপারটা কী বলো দেখি ?

কী আবার ! আমাকে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি করবে বলে নিয়ে এসে এখন বলছে বিয়ে করো। তুমিই বলো রাগ হয় কিনা ?

ও, এই ? তা বিয়ে করা তো ভালই।

আর ছেলেটাও তেমনি, চেনে না জানে না, বলে সিনেমায় নিয়ে আসুন, সেখানেই মেয়ে দেখব। আজকাল নাকি এই রকম নিয়ম হয়েছে। যা বমি পাচ্ছিল শুনে। মাসি বলছে, শীগ্‌গির শীগ্‌গির সেজে নে, ভাল করে সাজিস, থাকিস তো জঙ্গলে সাজ-সজ্জার তো কিছুই জানিস না, জানলেও মানিস না—আচ্ছা তুমিই বলো এরপর রাগ হয় কিনা ?

সুমন্ত একটু কাশলো।

অম্বু তেমনি উত্তেজিত, ওসব চালাকির ঠ্যালা এখন বুঝুক। ছেলেটা আবার মাসির শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়, কাজেই এ ব্যাপারে মাসিরই অ্যাকটিভ পার্ট। তিনিই আমাকে সং সাজিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন দেখা করাতে। আমিও সময় বুঝে টুক করে পালালাম।

তারপর ?

তারপরই তো মুশকিল। পথ-ঘাট চিনি নাকি কিছু। সেই বাড়ির

সামনে থেকে টালিগঞ্জ ট্রাম-ডিপোতে এসে ট্রামে বসেছি আর এই তো নামলাম।

মানে?

বসেইছিলাম আগাগোড়া। ট্রামটা শেষ পর্যন্ত গেলো, আবার ভর্তি হয়ে ফিরলো, আমি আছি এক কোণে। যা ভয় করছিলো না, কেবলি মনে হচ্ছিলো কোনদিকে চলে যাচ্ছি, হারিয়ে যাচ্ছি—অম্বু সরল চোখে তাকিয়ে হাসতে লাগলো।

সুমন্ত আবার হাজারিবাগের কথা ভাবলে, সেই সুখ তার আবার ফিরে পেতে ইচ্ছে করলো।

এই সময়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছিলো, তার লাল আলো ছড়িয়ে পড়ছিলো পথে, ফুটপাতে, গাছের পাতায় পাতায়, মানুষের মনে। পার্ক স্ট্রীট ছাড়িয়ে দৌড়োদৌড়ি করে সে একটা ট্যাক্সি ধরে ফেললো। বললো, চলো, তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দি, দাদু-দিদিমাকে না জানি কত ভাবিয়ে তুলেছো।

অম্বু গাড়িতে উঠে বসলো।

একটু পরে বললো, আমি কিন্তু একটা সুখবর দিতে পারি।

কি?

মাসি আর সুনীলমেসো ভাবছেন, ওঁদের মেয়ে বেলার সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা বলবেন। দাদু-দিদিমাকে ধরেছেন খুব। আর দিদিমাও বলেছেন, শীগ্‌গিরই তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে তোমাদের বাড়ি যাবেন, বেলাও সঙ্গে যাবে, তোমার সঙ্গে আলাপ করবে। বেলা খুব সুন্দর। খুব ভাল।

তোমার চেয়েও?

দেখলেই তোমার পছন্দ হয়ে যাবে।

তাই নাকি?

আমি তো বেলাকে সব সময়ে তোমার কথা বলে খ্যাপাই।

সর্বনাশ! সব কথা বলে দাওনি তো?

কি কথা?

আমি যে তখন একটি মেয়েকে ভালবাসতাম!

হঠাৎ চুপ হয়ে গেলো অম্বু।

সুমন্ত জানালার কাচ নামিয়ে দিচ্ছিল, দেখল অম্বু রাস্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, এত সুন্দর যে, সর্বদাই উছলে-পড়া, আনন্দের খনি অম্বুর এই মুখশ্রী অচেনা লাগলো সুমন্তর।

একটি সিগারেট ধরিয়ে সে-ও আনমনা ভাবে তাকিয়ে থাকলো পড়ন্ত বেলার পথের দিকে। দপ করে আলো জ্বলে উঠলো।

বাড়ির কাছাকাছি আসতে আসতে আবার অম্বু ফিরে এলো নিজের স্বভাবে, আবার রোদ ফুটলো তার মুখে। বললো, এই, এখন বাড়ি গিয়ে কী হবে?

বকুনি খাবে, আবার কি?

না। তোমাকে দেখে সবাই এত খুশি যে আমার কথা ভুলে যাবে।

আর যদি দ্যাখ সেই অপরিচিত শ্রীমানটি সিনেমায় না পেয়ে বাড়ি এসে বসে আছে?

সে আমি বুঝবো, তা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।

এ ব্যাপারে আমি ছাড়া আর কার মাথা ঘামবে, তাও তো জানি না।

সব কথায় এত ইয়ার্কি করো কেন? অম্বু রেগে গেলো।

সুমন্ত হাসলো, গাল-ভরা দাড়ি আর বেলবটম্ জুলপিওলা ছেলেরা তো এরকমই বথা।

জানো, অম্বু ঝিলিক দিয়ে উঠলো, বেলা এরকম দাড়ি আর জুলপি খুব ভালবাসে, বলে ইনটেলেকচুয়েল।

কিন্তু বেলার বোন যদি ভাল না বাসে তা হলে তো আমি নিরুপায়।

নিরুপায় কেন? তোমার ইচ্ছে তুমি রাখবে, আমার ইচ্ছে আমি পছন্দ করবো না।

তা কখনও হয়? একসঙ্গে থাকতে গেলে ওরকম ঝগড়া করে থাকা যায় না। আমি কালই সব কেটে ছেঁটে পরিষ্কার হয়ে আসছি, তারপরে আর কোন আপত্তি নেই তো?

কি সব যা তা বলছো!

তবে কি ভাবে প্রস্তাবটা করবো বলে দাও না।

প্রস্তাব?

তুমি রাজী হলে তবে তো আর সব! আর তুমি রাজী হলেই কাজ অনেক অগ্রসর হয়ে যাবে। বিয়ে যখনই হোক, পাসপোর্ট ভিসা এ সবের ঝামেলাগুলো তো চুকিয়ে রাখতে পারি।

অম্বু বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকল সুমন্তর দিকে। আস্তে আস্তে সমস্তটা চোখ চামচে-ভরা জলের মতো টলটল করে উঠলো।

স্বর্গের শেষ ধাপ

চুল দাড়ি গোঁফের অন্তরাল ভেদ করে অচৈতন্য লোকটিকে ভালো ভাবে নিরীক্ষণ করতে গিয়েই চমকে উঠলেন মণিমালা।

ডক্টর সমাদ্দারের রোগী। তাঁর আদেশেই আজ রাত্তিরে এখানে ডিউটি দেবেন। ডক্টর সমাদ্দার তাঁকে বাড়ি থেকে ফোনে ডেকে এনেছেন। বললেন, একটা কাণ্ড হয়েছে মা।

কী হয়েছে কাকাবাবু?

জানো তো কার্সিয়াংয়ের হাসপাতালে গিয়েছিলাম—

হ্যাঁ, আপনি ফিরছেন না দেখে আমি ভাবছিলাম—

ফেরার পথেই তো এই। বাতাসিয়া লুপের কাছে এসে দেখি ঝরনাটার পাশে পাথরের উপর একটি লোক পড়ে আছে, গাড়ি থামালাম। একেবারে রক্তাক্ত দেহ—

তারপর?

আমার তো মনে হয় কেউ স্ট্যাব করেছে, বল্লমটা গড়াচ্ছে বুক থেকে। তুলে তক্ষুনি নার্সিং হোমে নিয়ে এসেছি। এসেছি সাড়ে সাতটা-নাগাদ এখন তো এগারোটা, এখনো জ্ঞান ফিরলো না। যা করবার সবই করেছি। আমি ডাক্তার, আমার ধর্ম প্রাণ রক্ষা, লড়াই শেষ পর্যন্ত করে যাব, কিন্তু একবার বাড়ি যেতে চাই, সেই সকালে বেরিয়েছি. ঐ জন্যই তোমার সাহায্য দরকার।

নিশ্চয়ই। বলুন কী করতে হবে।

তুমি থাকো জ্ঞানটা ফেরে কিনা দেখো, কী অবস্থায় কী করতে হবে বুঝে নাও, তোমার হাত ছাড়া আর কারো হাতে এ রোগী আমি রেখে যেতে ভরসা পাচ্ছি না। সিস্টার সুলতা থাকবে, এসিস্ট করবে তোমাকে। যদি অবস্থা ক্রমেই আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে মনে হয়, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে খবর দেবে। যেতে যেতে বললেন, তোমার বিদ্যাবুদ্ধি সেবা সব কিছুর উপরেই আমার পরিপূর্ণ আস্থা আছে।

মণিমালা বললেন, আপনি ভাববেন না, আমি সব ঠিক মতো করবো, দরকার মতো খবর দেব, আপনি গিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করুন।

লক্ষ্মী মেয়ে। পিঠে হাত রাখলেন। দরজা পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এলেন মণিমালা, আবার বললেন, আপনি কিছু ভাববেন না। আমাকে অনেক

আগেই কেন ডেকে পাঠালেন না।

একটা দিন ছুটি পাও, তা কি নষ্ট করতে ইচ্ছে করে? কিন্তু নিরুপায়। থামলেন, বিষণ্ণ গলায় বললেন, আসলে ছেলেটিকে আমি চিনি।

চেনেন?

যখন তুলে এনেছিলাম, তখন বুঝতে পারিনি, তাছাড়া যে রকম চেহারা করেছে, চিনবার উপায়ও নেই। তবু চিনলাম। আমার ছাত্র ছিলো। অতি প্রিয় ছাত্র। গরীব ঘরের মেধাবী সন্তান। স্কলারশিপ যোগাড় করে দিয়েছিলাম একটা। ফিফথ ইয়ারে উঠেই ছেড়ে দিল পড়াশুনো।

কেন?

আর কেন। মাথায় পোকা ঢুকলো। খুনের রাজনীতিতে নাম লেখালেন শ্রীমান। অনেক বুঝিয়েছি, যে রকম লাল লাল চোখে তাকিয়েছে, মনে হয়েছে এই বুঝি আমার বুকেই বন্দুকের নল ঠেকায়, শুনেছিলাম কাকে যেন খুনও করেছে। আজকের কথা নয়, বছর আট-দশেক তো হবেই। দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে বললেন, তোমাকে আর কী বললো, তুমিও তো এসবেরই বলি।

তা বটে। কতকাল বাদে আবার মনে পড়লো সে সব ঘটনা। মনে করতে না চাইলেও কচুরিপানার মতো ভেসে ভেসে এসে আঘাত করে বুকে। কী দুঃসময়ই না গেছে। এই ব্যক্তিটির সঙ্গে যদি দৈবাৎ দেখা না হয়ে যেত কোথায় তলিয়ে যেতেন কে জানে।

বাবাকে এই ছেলেরাই খুন করেছিল। আই পি এস অফিসার ছিলেন। পুলিসের চাকুরি বিষয়ে মানুষের মনে অনেক খারাপ ধারণা আছে, সে ধারণা অনেক ক্ষেত্রে অহেতুক নয়। কিন্তু তিনি একান্তই ব্যতিক্রম মানুষ। যাকে বলে দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন চাকুরির সেই শর্ত আক্ষরিক ভাবে পালন করতেন। এদের মানুষ নিধন যজ্ঞে তাঁর একবিন্দু সহানুভূতি ছিলো না। যে কোনো কারণেই হোক, মানুষ মানুষকে খুন করবে এটা বরদাস্ত করা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। তাই তিনি খুব শক্ত হাতেই এইসব উদভ্রান্ত ছেলেদের দমন করতে উদ্যত হয়েছিলেন। ঐ জন্যই একদিন সুযোগ-সুবিধে মতো তারা তাঁকে গুলি করে মেরে ফেলেছিলো। তখন বাবা জলপাইগুড়িতে পোস্টেড ছিলেন। মণিমালা বি এস সি পড়ছে, দাদা সদ্য সদ্য বিলেত গেছে, ছোড়দা এম এ পড়তে পড়তে নাম কাটা সেপাই হয়ে বাবার পয়সাতেই খেয়ে পরে দেশোদ্ধারে ব্রতী। মার প্রশ্রয় ছিলো। এক সময়ে মা-ও এই রাজনীতিই করতেন। অন্যরা খুন হলে মার মুখে বেখাপাত হতো না, দলের দাদাদের মতো তিনিও স্বামীর গাড়িতে চড়ে বেরিয়ে আট দশটা বয়-বেয়ারা খাটিয়ে, মস্ত বাংলোয় হাত পা ছড়িয়ে আরামে থেকে গরীবের দুঃখে অশ্রুপাত করতেন। ধনীলোকের বিরুদ্ধে অনেক বুলি আওড়াতেন। কিন্তু সেই ঘটনা যখন নিজের ঘরে ঘটলো, দৌড়ে উঠে গেলেন ছাদে, লাফিয়ে পড়তে পড়তে বললেন, আমি জানি কে। আমি জানি কে। আমি কোনোদিন ক্ষমা করবো না। মৃত্যুকালীন ঐ তাঁর শেষ জবানবন্দী।

টাকা পয়সা বেশী রেখে যেতে পারেননি বাবা। কী করে পারবেন? সকলকে সুখে রেখেছেন, দাদাকে বিলেত পাঠিয়েছেন, তাদের শিখিয়েছেন পড়িয়েছেন, মায়ের খেয়াল খুশির দাম দিয়েছেন—ছোড়দা বরাবরই বাবার উপর বিরক্ত, বাবার কার্যকলাপের তীব্র সমালোচক, বলা যায় একটা ঠাণ্ডা লড়াই চলছিলোই পিতা-পুত্রের মধ্যে, টাকা পয়সা না রেখে যাওয়াতে মৃত পিতার প্রতিও সে বিরক্তি উদ্গার করলো।

একসঙ্গে মাতা পিতার মৃত্যুশোক সহ্য করা যে তখন কতো কঠিন হয়েছিলো তা একমাত্র তিনিই জানেন। অচিরেই বাংলো বাড়ি ছাড়তে হলো। সরকারী বাড়ি, থাকার অধিকার নেই। আত্মীয় পরিজনও কেউ ছিলো না যে সেখানে গিয়ে উঠবেন। বাবার এক ঘনিষ্ঠ উকিল বন্ধু ছিলেন কয়েকদিন সেখানে কাটিয়ে ছোড়দা এক বাড়ি ঠিক করে এলো। উকিল কাকাবাবু বললেন, মণি এখানেই থাক, ওর বিয়ের জন্য হাজার কুড়ি টাকার একটা ইনসিওর করেছিলেন তোমার বাবা, সেটা ম্যাচিওর করেছে। বিয়ের চেষ্টা করাই ভালো। তবু তোমরা এখানে, নিজের দেশে স্থানে স্থিতিতে আছো, মুশকিল হবে সৌমিত্রের। কোন দূর বিদেশে বেচারা পড়াশুনো করতে গেছে, বাবার টাকার ভরসাতেই তো গেছে।

ছোড়দা বললো, মণির বিয়ের জন্য বাবা কুড়ি হাজার টাকার ইনসিওর করেছেন? আপনি জানেন?

হ্যাঁ, পলিসি টলিসি সবই আমার কাছে গচ্ছিত। খোলা হাত, জমাতে তো পারতো না—

ব্যাংকে তো কিছুই নেই।

ইদানীং তাঁর নানারকম আশংকা দেখা দিয়েছিলো। যা দৌরাত্ম্য শুরু হয়েছে গুণ্ডাদের কবে যে কে যায়, কে থাকে সেটাই এখন ভাবনা। শুনেছি এর পরের টার্গেট আমাদের সুরেশবাবু।

ছোড়দা সে সব কথায় কান না দিয়ে বললো, মার গয়নাগুলো কোথায় তা কি আপনি জানেন? বাড়িতে তো ছিলো না।

যারা তাকে গুলি করে মেরেছে, তারা যে শীঘ্রই চড়াও হবে এটা তোমার বাবা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন, সে জন্যই যা কিছু মূল্যবান তা দুচার মাস আগে আমার কাছেই রেখে গিয়েছিলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, সবই লিখেপড়ে রাখা আছে, ভেবো না।

ছোড়দাও একটু চুপ করে থেকে বললো, মণির বিয়ে বিষয়ে আমিও ভেবেছি। একটি ছেলে আছে, আমার মা-বাবাই তাকে প্রায় ঠিক করে রেখে গিয়েছেন। মণি অবশ্য কিছু জানে না। জানানো হয়নি। ভাবা হয়েছিলো, ওর পরীক্ষাটা হয়ে যাক তারপর বললেই হবে।

সে তো খুব ভালো কথা। তুমি ঠিক করো। কী করে ছেলেটি?

কলকাতায় একটা বিদেশী ফার্মে কষ্ট অ্যাকাউন্টেন্ট। ভালো মাইনে, দেখতেও সুন্দর।

বাঃ, খুব ভালো। সবদিক বিবেচনা করলে মণিকে যতো তাড়াতাড়ি

হয়, বিয়ে দেয়াই শ্রেয়। বিয়ের পরেই না হয় পড়াশুনো করবে। রক্ষণা-বেক্ষণের মানুষ তো থাকবে। এইটুকু মেয়ে, আর কী আদরের। না, অমল, যা ঘটে গেল আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না, কী ভালো মানুষ যে ছিলেন তোমার বাবা? আহা। খেয়েদেয়ে বেরুলেন বাড়ি থেকে, গ্যারেজ কতোটুকু রাস্তা বলো? ঐটুকু আসতে আসতেই হয়ে গেল সব? তার মানে দুর্বৃত্তরা জানতো কখন বেরুবে, নিশ্চয়ই কেউ খবর দিয়েছিলো।

ব্যস্ত হয়ে ছোড়দা বললো, আমি যাই, বাড়িটা তা হলে নাকচ করে দিয়ে আসি। মণি কয়েকদিন এখানেই থাক বরং। আমি আমার যে বন্ধুর সঙ্গে আছি আর দু-একমাস সেখানেই থাকি—

আর ঐ পাত্রটির খবরাখবরও কোরো।

সে তো নিশ্চয়ই। তা হলে আপনি ঐ টাকাটার বন্দোবস্তটাও করে ফেলুন। ওর বিয়ের টাকা বাবার ইচ্ছানুসারে ওকেই দেয়া উচিত। মার গয়নাও তো আছে, সেটাও ওকেই দেব।

উকিল কাকা বললেন, না না, সব ওকে দেবে কেন। মায়ের গয়নায় তোমাদের তিন ভাই বোনেরই সমান অধিকার।

ছোড়দা বললো, আমাদের একটাই বোন, ওকেই আমরা যথাসর্বস্ব দিয়ে সাজিয়ে দেবো। এখানে ভাগের কোন প্রশ্ন ওঠে না। একথা শুনে উকিল কাকাবাবু মুগ্ধ।

এরপরে বিবাহ পর্ব সমাধা হতে দেরি হয়নি। ছেলে ছুটি পেলো না বলে বিয়ে হলো কলকাতা এসে। জরুরী মামলা পড়ায় কাকাবাবু উপস্থিত থাকতে পারেননি শেষ পর্যন্ত, কিন্তু এসে ছেলে দেখে, তার দাদা-বউদির সঙ্গে আলাপ করে তাদের বাড়িঘর পরিদর্শন করে খুশি মনে চলে গিয়েছিলেন। ছোড়দা তাঁকে নিয়ে যে বাড়িটায় এসে উঠেছিলো সেটা ওদেরই বাড়ি, বেলঘরিয়াতে বলে সেখানে থাকে না, থাকে কলেজ স্ট্রীটে একটা ফ্ল্যাটে। বাড়িটা হাত পা ছড়ানো কিন্তু লোকজন না থাকায় পোড়ো হয়ে আছে। সামনে ধু-ধু মাঠ, পিছনে পুকুর। দেয়াল ঘেরা বাড়ি ফটক বন্ধ করলেই নিরাপদ। মণিমালার ভালোই লেগেছিলো। আসল ভালো যাকে লেগেছিলো সে হচ্ছে বাড়ির মালিক তাঁর ভাবী স্বামী প্রবাল। প্রথম আলাপেই যে শরাহত হয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রবালের ভাবভঙ্গিটাই একটু অদ্ভুত। সব সময়েই অন্যমনস্ক, চিন্তিত, কলকাতা এসে পৌঁছুবার দিন দশেক বাদে বিবাহ হয়েছিলো, এ কয়দিন রোজ না হোক তিন চার দিন তো এসেইছে। এসেছে রাত্রে। ছোড়দা বলে, আপিসে ভীষণ খাটুনি তাই রাত হয়ে যায়। কিন্তু একটা রোববার পড়লো মাঝে সেদিনও ঐ রাত্রেই এলো! আসতো বটে কিন্তু এসেই যাবার জন্য চঞ্চল। কেবল উশখুশ। খুব খারাপ লাগতো মণিমালার। স্বভাবতই মনে হতো মানুষটির বোধহয় কোনো আগ্রহ নেই তাঁর প্রতি। তবু কেন বিয়ে করছে সেটা ভেবেও অবাক হতেন। অনেক দিন এমনও হয়েছে বাড়িতে নব নিযুক্ত পরিচারক আর মণিমালা ছাড়া কেউ নেই, সেদিনও প্রবাল যে একটু বেশীক্ষণ

বসবে বা নিভৃত পেয়ে ভাবী স্ত্রীর সঙ্গে খানিকটা বেশী সময় কাটাবে তা-ও করেনি। ঐ একই রকম। আসতো বসতো হঠাৎ চমকে উঠে চলে যেতো। যতোক্ষণ থাকতো, কথা বলার চেয়ে চকিত থাকতো বেশী।

এ অবস্থাতেই একদিন হয়ে গেল বিয়ে। রেজিস্ট্রেশন হলো। এতো নিঃশব্দে হলো যে বোঝাই গেল না বিবাহ। অবশ্য ঐ দুর্জয় শোকের মধ্যে এর চেয়ে আর কী বেশী হবে। ছোড়দা বললো, কাকাবাবু তা হলে শেষ পর্যন্ত এলেন না? যাকগে টাকা কড়ি সবই তিনি রেখে গিয়েছিলেন আমার কাছে, আমি ও সবই কাল এসে তোমাদের হাতে দিয়ে যাবো, আজ এখুনি একটা জরুরী কাজে চলে যাচ্ছি।

দেখা গেল অমল একাই গেল না, বিবাহ সম্পন্ন হতে প্রবালের দাদাবউদি বন্ধুরাও সবাই চলে গেল, রইলো শুধু প্রবাল আর পরিচারক গোবর্ধন। সব ব্যাপারটাই কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া লাগছিলো। যেন ঠিক স্বাভাবিক নয়। তবু যখন একা ঘরে দরজা বন্ধ করলো প্রবাল মণিমালার কুড়ি বছরের বুকটা একটা বেগবান ইঞ্জিনের মতো ধুক ধুক করছিলো। শোকতাপ সন্দেহ সব ভুলে কুলপ্লাবী এক প্রেমের বন্যা বয়ে যাচ্ছিলো হৃদয়ে।

প্রবাল গিয়ে জানালায় দাঁড়ালো, একমনে সিগারেট খেতে লাগলো, অনেক পরে উদভ্রান্ত ভাবে এগিয়ে এলো কাছে, বসলো, তুমি শুয়ে পড়ো আমি যাই।

মণিমালা তাকালেন।

ক্ষমা চাইবার ভঙ্গিতে প্রবাল বললো, আমাকে যেতেই হবে জরুরী কাজ আছে।

জরুরী কাজ? আজও জরুরী কাজ? মণিমালার মুখ থেকে যেন স্খলিত হলো শব্দ কটি।

অস্থির ভাবে প্রবাল বললো, একা থাকতে ভয় করবে? কিচ্ছু ভয় নেই, গোবর্ধন আছে—

চোখে জল এসে গেল মণিমালার। শুধু আহতই হলেন না, অপমানিতও হলেন। ঢোঁক গিলে বললেন, পিতৃমাতৃহীন বলে কি আপনি দায় উদ্ধার করেছেন?

মানে?

ভেবেছেন বিপন্ন, অভিভাবক নেই, বিবাহের স্বীকৃতি দিয়ে মহত্ত্ব দেখাই।

ছিছি, এরকম বোলো না—

আমি গোড়া থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম এই বিবাহ আপনি অনেকটা দায়ে পড়েই করছেন, কিন্তু কেন? যাকে আপনি চান না, গ্রহণের অযোগ্য বিবেচনা করে—

প্রবাল পায়ের কাছে হাঁটু ভেঙে বসলো, তুমি বিশ্বাস করো তুমিই প্রথম মেয়ে, তুমিই একমাত্র মেয়ে যাকে দেখা মাত্রই আমি আমার হৃদয়মন সমর্পণ করে নিঃস্ব হয়েছি। এই মুহূর্তেও যার সান্নিধ্য লোভে বুকটা আমার ফেটে যাচ্ছে, যাকে কাছে পাবার আকাঙ্ক্ষায় আমার ভয়-ডর আদর্শ সব জলাঞ্জলি

দতে ইচ্ছে করছে—

রুদ্ধস্বরে মণিমালা বললেন, তবে—তবে কেন আমাকে একা ফেলে চলে যতে চাইছেন, আমার ভয় করছে, আমার—

হঠাৎ প্রবাল মণিমালাকে গভীর আবেগে জড়িয়ে ধরে একটি দীর্ঘ চুম্বনে আবিষ্ট করলো।

এই সময়েই টোকা পড়লো দরজায়, ত্রস্ত গলার ফিস ফিস শোনা গেল, পুলিস, পুলিস।

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে প্রবাল বাথরুমের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

একটু বাদেই সদর দরজা খোলার শব্দ হলো, মণিমালা উৎকর্ণ হয়ে শুনলেন, গোবর্ধন বলছে, আসুন, বসুন, বোকা বোকা ভীতু গলা।

আগন্তুকেরা জেরা করলো, তুমি এখানে কী করো?

এজ্ঞে আমি এ বাড়ির চাকর।

নাম কি?

এজ্ঞে গোবর্ধন।

কদ্দিন কাজ করছো?

তা হবেক দু-চারমাস।

তার মানে নতুন লোক?

এজ্ঞে।

যার কাছে কাজ করো তার নাম কী?

এজ্ঞে পোবাল।

পোবাল। পোবাল কী?

ঐ পোবাল মল্লিক দাদাবাবু। সেই যে নতুন বিয়ে করে বউ নিয়ে এলো—

কোথা থেকে বউ নিয়ে এলো।

এজ্ঞে কর্তা বারাসত থেকে। দাদাবাবু আগে পিসির বাড়ি ছেলো কিনা, এখন বউ নিয়ে ভেন্ন হয়ে এখানে এলো।

এ বাড়িতে আগে কে ছিলো জানো? সন্দীপ মুখার্জি বলে কেউ আসে এখানে? কিম্বা থাকে এখানে?

তা তো কর্তা আমি জানি না।

অমল মৈত্র বলে কেউ আছে এখানে?

এজ্ঞে, এখানে তো কেবল দাদাবাবু বউদি আর আমিই থাকি আর তো কারোকে দেখিনি।

ঠিক আছে দাদাবাবুকে ডাক।

দাদাবাবুর তো আজ নাইট ডিউটি।

নাইট ডিউটি? কোথায় কাজ করে?

ঐ পেরেছে না জানি কোথায়—

ঠিক আছে, চলো তোমাদের ঘরগুলো আমরা দেখবো।

খাটের বাজু ধরে শক্ত হয়ে বসে আছেন মণিমালা। বুঝতে দেরি হয়নি এই নির্জন বাড়িটি একটি ষড়যন্ত্রের আড্ডাখানা। যে কজন ছেলেমেয়ে আজ

তাঁর বিবাহ সভায় উপস্থিত ছিলো, সকলেই একদলের, কেবল তাকে ধোঁকা দিতেই তাদের আগমন। এই ভৃত্যটিও তাই।

কিন্তু তাকে কেন এখানে এই দলের মধ্যে এনে ফেলা হলো সেটাই বুঝে উঠতে পারলেন না। ছোড়দার প্রতি বিতৃষ্ণায় ঘৃণায় দাঁতে দাঁত লেগে আসছিলো।

পুলিসের ভদ্রলোক দুজন ভদ্র। বিনীতভাবে বললেন, নমস্কার, কিছু মনে করবেন না। আমরা একটা খুনের কিনারা করতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। খবর পেয়েছিলাম আততায়ীরা এখানেই এসে আছে। কাগজে দেখে থাকবেন একজন আই পি এস অফিসার এ কে মৈত্রকে তাঁর বাড়ির কয়েক গজ দূরেই গুলি করা হয়েছিল। ব্যাপারটা ঘটেছে জলপাইগুড়িতে। তার ছেলেই নাকি দলে খবর দিয়েছিল কখন তিনি পথে বেরুবেন।

আঁৎকে উঠে মণিমালা প্রায় আর্তনাদ করে বললেন, তাঁর ছেলে? নিজের ছেলে বাপকে খুন করালো?

ওঁরা হাসলেন, কী আর বলবো, এই তো হচ্ছে আজকাল। আচ্ছা চলি।

এরপরে মণিমালার প্রশমিত শোক দুর্নিবার হয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেল তাঁকে।

তা হলে এই কীর্তি ছোড়দারই? যদিও মণিমালা জানতেন তাঁদের বাড়িটা মাত্র চারজন মানুষ নিয়েই দুই শিবিরে বিভক্ত। এক শিবিরে ছোড়দা আর মা, অন্য শিবিরে সে আর তার বাবা। খুব রাগ হতো তার ওদের উপর। বাবার পরিশ্রমের অর্থে খাবেদাবে আরামে থাকবে, পার্টিবাজী করবে আর বাবার চাকরি নিয়েই ঘৃণার সুরে কথা বলবে। মাঝে মাঝে বেশ ঝগড়াও করেছে এ নিয়ে। বাবাকে যেদিন খুন করা হলো তার দু-একদিন আগে থেকেই ছোড়দার চালচলন যথেষ্ট সন্দেহজনক ছিলো। আগের দিন রাত্রে তার ঘরে এসে বললো, মণি, বাবার রিভলবারটা কোথায় জানিস?

উপন্যাসের শেষের দিকে এসে তার কথা বলার সময় ছিলো না। বই থেকে চোখ না সরিয়েই বললেন, দাঁড়াও দাঁড়াও, এখন বিরক্ত কোরো না, একটা সাংঘাতিক জায়গায় এসে পৌঁচেছি।

ছোড়দা একটানে বইটা নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল, যতো সব বাজে বাজে বই গোগ্রাসে গেলা। জানিস যার বইটা পড়ছিস, লোকটা একটা পাকা বুর্জোয়া! কতবড়ো বাড়ি করেছে একখানা, শয়তান।

মণিমালা রেগে গিয়ে বললেন, তুমিও জেনো এই লেখক আমার সবচেয়ে প্রিয়, এর লেখা পেলে আমি আহার নিদ্রা ভুলে যাই, ঈশ্বরের মতো ভক্তি করি—

রেখে দে রেখে দে, রাবিশ। কোনোদিন একটা গরীবের কথা লিখেছে কোথাও। ওটার মুণ্ডুটাও ধড় থেকে খসানো হবে শীগ্গিরই একদিন।

সেই পরামর্শ করতেই কি বাবার টাকায় মধ্যে মধ্যে কলকাতা যাও?

চুপ কর। মারবো এক থাপ্পড়। যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দে।

কী।

বাবার রিভলভারটা কোথায় থাকে?

আমি জানি না।

মিথ্যে কথা। জানিস।

জানি না যাও।

এই সময়ে মা ঘরে এলেন, ছোড়দার দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, দ্যাখ অমল, যা করবার বাইরে করো, কিন্তু ঘরের আগুনে হাত দিও না।

ছোড়দা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললো, কেন, যা শত্রু পরে পরে, না? আমি তোমার মতো স্বার্থপর নই, যা ঠিক বলে জানি সেখানে ওসব বাবা ফাবা সেন্টিমেন্ট আমার নেই।

পরের দিনই খুন হলেন বাবা। বাবাকে যে এই সব ছেলেরা সব সময়ই অনুসরণ করে তা বাবা জানতেন। সাবধানতাও ছিলো যথেষ্ট।

প্রতিদিনই তিনি এগারোটায় বেরুতেন। ঘরের দরজায় আবদুল গাড়ি নিয়ে আসতো, বাবা হাতে রিভলবার নিয়ে উঠে যেতেন। সেদিন কিন্তু অসময়ে বেরুলেন। প্রায় পৌনে একটার সময়। যাবেন বাগডোগরা, সেখানে একটা আত্মগোপনকারী দলের সন্ধান পেয়েছেন। গাড়ি একটু দূরের গ্যারেজে থাকতো। আবদুলও থাকতো সেখানে। আবদুলের দেরি দেখে বাবা ছটফট করতে করতে নিজেই বেরিয়ে গেলেন গ্যারেজের দিকে। উত্তেজিত ছিলেন খুব, তাই হয়তো সামান্য অসতর্ক হয়ে পড়েছিলেন। বাবার আগেই ক্ষিপ্র গতিতে ছোড়দা বেরিয়ে গেল। বাবা মণিমালাকে বললেন, চলি রে। দেরি দেখলে ভাবিস না, এই উৎপাত আমি ঝাড়ে বংশে উৎখাত করবো, তীর্যক দৃষ্টিতে মার দিকে তাকালেন।

এমন বোঝা যাচ্ছে এই অসময়ে বেরুনোর খবরটা ছোড়দাই দিয়েছিলো তাদের। একটু আগে বেরিয়ে যাওয়াটাও তারই নির্দেশ, যেন কিছুতেই মিস না করে। মা কি জানতেন? মা কি সন্দেহ করেছিলেন? তাই কি আগের দিন ছোড়দার সঙ্গে ঐ ধরনের কথাবার্তা হলো? তাই কি শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত করলেন।

ভোর স্পষ্ট না হতেই কোথা থেকে ভিজে গায়ে ভিজে কাপড়ে ফিরে এসেছিলো প্রবাল। না, স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে আর প্রবৃত্তি হয়নি। এরা সবাই তাঁর পিতৃহন্তা, এরা সবাই তাঁর প্রতিহিংসার পাত্র, ঘৃণার পাত্র। তিনি চিন্তা করছিলেন থানায় গিয়ে আত্মপরিচয় দিয়ে স্বামী নামের এই খুনীটাকেও ধরিয়ে দেবেন বিনা। কিন্তু এই শহরের তো তিনি কিছুই চেনেন না। কিছুই জানেন না। কী করে কোন পথে যাবেন? একটা সাহায্যকারীও নেই। নিজের অসহায় অবস্থাটা এই প্রথম এমন ভাবে উপলব্ধি করে তিনি ব্যাকুল হলেন এবং এই হলো তাঁর বিবাহের প্রথম রজনী।

ভোর স্পষ্ট হলে প্রবাল নিজেই চা করে নিয়ে এলো। রুটি মাখন ডিম দুধ মিষ্টি ফল সবই এলো সঙ্গে। গোবর্ধন সব সময়ে বসে আছে

দরজার কাছে পাহারায়। প্রবাল বললো, খেয়ে নাও। চা আর খাবার এগিয়ে দিল, আমি তোমাকে সবই বলবো। তুমি খেয়ে নাও।

মণিমালা খেলেন না ছুঁলেন না, তাঁর বমি উঠে আসছিলো, মাথা ঝিমঝিম করছিলো, দুনিয়া অন্ধকার হয়ে গিয়েছিলো। পড়ে যাচ্ছিলেন, প্রবাল ধরে ফেলে শুইয়ে দিল।

পুরো দু সপ্তাহ শুয়ে থাকতে হলো, উঠবেন এমন শক্তিই ছিলো না। প্রবাল অবিশ্রান্ত বসে থেকেছে কাছে, সেবা করেছে শুশ্রূষা করেছে. পুলিশের ভয়ডর ত্যাগ করে মোহগ্রস্থের মতো তাকিয়ে থেকেছে মুখের দিকে। এই সঙ্গ তিনি চাননি, এই সেবা তিনি চাননি, মরতে চেয়েছিলেন, তাও তিনি পারেননি।

তখন বাড়িতে শুধু গোবর্ধনই নয়, আরো একটি টাকমাথা লোক বদলি হয়েছে পুলিস আসার পর থেকে। সারাদিন বসে বসে সে খবরের কাগজ পড়ে আর মধ্যে মধ্যেই ঘুরে দেখে আসে চারদিক।

মধ্য রাত্তিরে আরো একদিন পুলিস এসেছিলো, সংকেত পেয়েই ঐ বাথরুমের ভিতর দিয়েই পালিয়ে গিয়েছিলো প্রবাল। মণিমালার মনে হয় বাড়িটার পিছন দিকে যে একটা পুকুর আছে সেই জলেই ডুবে থাকে সে।

সেদিনের মতোই গোবর্ধনই খুলে দিয়েছিলো দরজা। সেদিনও তারা বাড়ির কর্তার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলো। গোবর্ধন আর নাইট ডিউটির কথা বলেনি। পান খাওয়া দাঁতে হেসে বলেছিলো, আজ দাদাবাবু বাড়ি আছে।। ঘুমুচচেন। বউদিমণির অসুখ কিনা আমি এখুনি ডেকে দিচ্ছি।

ভিতরে এসে টাকমাথাকে ডেকে নিল, টাক মাথা প্রস্তুতই ছিলো। অমনি সে ঘুম-ঘুম চোখে কোঁচার খুঁটি গায়ে জড়িয়ে হাই তুলতে তুলতে ঘরে গিয়ে চমকে ওঠার ভান করে বললো, পুলিস। পুলিস কেন? তার পর সাব্যস্ত হয়ে বললো, কী হয়েছে মশাই বলুন তো। আমাব স্ত্রী বললো, আমার অবর্তমানে আরো একদিন নাকি এসেছিলেন।

হ্যাঁ এসেছিলাম। আপনিই কি এ বাড়িতে থাকেন?

হ্যাঁ।

আপনার নামই কি প্রবাল মল্লিক?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কদ্দিন আছেন এ বাড়িতে?

এই তো মাস তিনেক মাত্র। সস্তা ভেবে এলাম, এখন সস্তার তিন অবস্থা।

কেন?

এক মহা বেল্লিকের পাল্লায় পড়েছি। আপনারা স্যার আমাদের মতো নির্বিরোধী লোকদেরই হয়রান করেন, সেই বেল্লিকটাকে ধরতে পারেন তো বুঝি।

কে সে?

কী জানি, সন্দীপ মুখার্জি না কি যেন নাম, ব্যাটা এক নম্বরের শয়তান, দেখুন টাকাগুলো নিয়ে গেল, একটা রিসিট পর্যন্ত দিলে না?

সন্দীপ মুখার্জি! কোথায়, কোথায় সে—

তবে আর বলছি কি। ছিলুম পিসীর বাড়িতে বারাসত, বেশ ছিলুম স্যর। হঠাৎ এই লোকটা কোথা থেকে গিয়ে সেখানে উদয় হলো, বললো এ বাড়িটা, তিন বছরের আগাম ভাড়া পেলে সস্তায় দেবে। তা দিয়েছে সস্তায় সেটা ঠিক, কিন্তু একটা রিসিট তো দেবে। বললো কাল আসবো। আর এলোই না। উপরন্তু এক ভুয়া ঠিকানা দিয়ে গেছে। এখন টুনটান শুনছি, বাড়িটা নাকি আসলে ওর না, দেখছেনই তো কিরকম পোড়ো বাড়ি, কে কবে এসে ধাক্কা দিয়ে উঠিয়ে দেবে কে জানে। এদিকে সারাইসুরাই করতেও তো কম খরচ হয়নি।

আচ্ছা, আপনাদের ঘরগুলো একবার দেখতে পারি কি?

বিলক্ষণ। তবে আমার স্ত্রী বড়ো অসুস্থ—

তা হলে আপনি বলছেন, এ বাড়ি আপনি সন্দীপ মুখার্জির হাত থেকে পেয়েছেন?

ঘরগুলো দেখতে দেখতে তারা মণিমালার ঘরের চৌকাঠ এসে দাঁড়ালো। টাকমাথা ডিঙ্গি মেরে তাদের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, একটু আস্তে কথা বলুন, ঘুমের ওষুধ দিয়েছি তো—

মণিমালা সবই শুনলেন, সবই বুঝলেন। সুতীব্র উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে উঠেও বসেছিলেন সমস্ত মিথ্যা উদ্ঘাটন করে দেবার জন্য, তারপর আবার শুয়ে পড়ে দুহাতে মুখ ঢাকলেন। কোথায় কোন মমতার তন্ত্রীতে যে আঘাত লাগলো কে জানে।

প্রবাল ফিরে এলে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনার সঠিক নামটা জানতে পারি কি?

চুপ করে থেকে প্রবাল বলেছিলো, সন্দীপ মুখার্জি।

সন্দীপ মুখার্জি! তাহলে আপনিই, আপনাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে পুলিস?

হ্যাঁ।

তা হলে আপনিই আমার পিতৃহন্তা?

না।

মিথ্যেবাদী।

আমি কখনো মিথ্যে কথা বলি না।

বলেন, হাজার বার বলেন। মিথ্যাই আপনাদের জীবন। মিথ্যের বেসাতি করেই আপনারা জন্তু-জানোয়ারের মতো একে ওকে খুন করে বেড়ান। আপনাদের মতো কতকগুলো কৃমিকীটকে সরকার এখনো কেন ধরে ধরে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারছে না।

ধরতে পারলে পুড়িয়েই মারবে। তুমি কেন সেদিন ধরিয়ে দিলে না। দিলে তোমারও শান্তি হতো, আমারও প্রায়শ্চিত্ত হতো।

দেবো, দেবো, নিশ্চয়ই দেব, সেদিন না পারলেও একদিন আমি পারবো।

মৃদু হেসে সন্দীপ বললো, না পারবে না, কোনোদিনই পারবে না।

যতোই ঘৃণা করো না কেন, যতোক্ষণ জানবে আমি তোমার স্বামী ততোক্ষণ সেই সংস্কারটাই তোমাকে বাধা দেবে। সুতরাং জানিয়ে দেয়া ভালো আমাদের বিবাহের অনুষ্ঠান সবই সাজানো, সবটাই ফাঁকি। তোমার পিতার টাকাটা আত্মসাৎ করবার জন্যই সেই আয়োজন।

কী বলছেন আপনি!

সমস্তই তোমাকে এবং তোমার উকিল কাকাকে ধোঁকা দেবার ফন্দি। শেষ পর্যন্ত তিনি আসতে পারেননি বটে তবে আসার সম্ভাবনা তো ছিলো।

দুই চোখে আগুন ছড়িয়ে মণিমালা বললেন, আর আপনি সেই ষড়যন্ত্রের প্রধান নায়ক?

না, আমি নিরুপায় নিমিত্তমাত্র।

আপনি নিরুপায় নিমিত্ত মাত্র? আপনার লজ্জা করলো না বর সেজে এসে বসতে?

যদি বিশ্বাস করো বলবো, লজ্জা দুঃখ বিদ্রোহ সব বৃত্তিই কাজ করেছিলো কিন্তু উপরতলার আদেশ আমাদের মান্য করতেই হয়। আমরা ক্রীড়নক।

মানুষ নন? মনুষ্যত্ব নেই?

একদিন এক উন্মাদ আদর্শবাদের প্রেরণায় যে ভুল পথে এসে পা দিয়েছি, সেখানে মনুষ্যত্ব বা বিবেকের কোনো স্থান আছে বলে আর এখন মনে হয় না। কিন্তু বেরুবারও আর রাস্তা নেই।

সে জন্যই খুন করে পাগলা কুকুরের মতো লুকিয়ে পালিয়ে বেড়াতে বেড়াতে একটা মেয়ের সর্বনাশ করে দিলেন—উঃ এখন আমি কী করি, কী করি—মণিমালা মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলেন।

সন্দীপ শান্তভাবে বললো, তোমার কাছে আমার কতোগুলো বলবার কথা আছে। তার একটা হচ্ছে, খুন আমি করিনি। তবে দলে ছিলাম। ছিলাম আমরা সাতজন। দূরে দাঁড়িয়ে, আমি লক্ষ্য রাখছিলাম কেউ এসে পড়ে কিনা। খুনের ব্যাপারে সেই আমার হাতেখড়ি। এই বিবাহেও যেমন আমার বিবেক বা ইচ্ছে অনিচ্ছের কোনো প্রশ্ন ছিলো না, উপরতলার আদেশে যেমন তোমাদের ঠকাতেই হয়েছিলো, এই খুনের দলে নাম লেখানোও তার ব্যতিক্রম নয়। দূরে দাঁড়িয়ে মনে মনে পথ খুঁজছিলাম, কী ভাবে এই কঠিন শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেতে পারি। এই সময়েই একটা আর্ত চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে সব ভুলে ছুটে গেলাম সেখানে। যে খুন করেছিলো সে ততোক্ষণে পালিয়ে গেছে। কথা ছিলো-কাজ হয়ে গেলেই যে যে-পজিসনে আছি, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নির্দিষ্ট পথে পালিয়ে যাবো। সবই অঙ্ক কষা। আমার অঙ্কটাই মিললো না। যাকে খুন করা হয়েছিলো তিনি ছিলেন একটি কলেজের অধ্যক্ষ। অপরাধের মধ্যে এই পথগামী ছেলেদের তিনি অপছন্দ করতেন এবং তা সরবে ঘোষণা করতেন। নির্জন বট গাছটার তলায় মৃত্যুর সঙ্গে যুঝতে যুঝতে তিনি যখন জল জল করে আর্তনাদ করছিলেন আমি জল দিতে চেয়েছিলাম, ডাক্তার ডাকতে চেয়েছিলাম, গাড়িতে

তুলে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, কেউ একজন পিছন থেকে হ্যাঁচকা টানে প্রায় শূন্যে তুলে নিয়ে পালালো। পকেটে একটা নোটবই ছিলো পড়ে গেল সেটা। আমার নাম লেখা ছিলো তাতে।

তা হলে কেন আপনি পুলিসের কাছে গিয়ে সত্য কথা বলছেন না।

সে হয় না। আমি বিশ্বাসঘাতক হতে পারি না। আমি নিজেকে নিরাপদ করার জন্য তাদের ধরিয়ে দিতে পারি না। তোমার কাছে বলি বলি করেও সে কথা বলে উঠতে পারিনি, এটা হচ্ছে তার এক নম্বর। দুই নম্বর বিবাহ। এভাবে ঠকিয়ে যোগ্য পাত্র সাজিয়ে টাকা হাত করার বুদ্ধিটা অমলের প্রস্তাবনা অমলের, সিদ্ধান্ত সুপ্রীম কর্তা নীহারদার, নীহার মজুমদার, নাম নিশ্চয়ই জানো। প্রয়োজনে টাকার জন্য চুরি ডাকাতি খুন সবই যেখানে ধর্ম, একটা সামান্য বিবাহের ভড়ং নিশ্চয়ই সেখানে নেহাৎই সামান্য ব্যাপার। এ বাড়ির মালিকও আমাকেই সাজানো হয়েছে কিন্তু বাড়িটা নীহারদার পৈতৃক। সে যাক। এখন যেটা আমার আসল বক্তব্য সেটা হচ্ছে বিয়ের বর আমি আদেশেই সেজেছিলাম, এখন বিনা আদেশেই তোমাকে জানাই, দস্তখতের বিবাহ বা সাক্ষীসাবুদের বিবাহ কিছুই আমি মানি না, আমার আসল মূলধন আমার ভালোবাসা, আমি শুধু তাতেই বিশ্বাস করি। সেই অধিকারের জোরেই বলছি তুমি আমাকে গ্রহণ করো।

তীক্ষ্ণস্বরে মণিমালা বলে উঠলেন, আমি আপনাকে ঘৃণা করি, ঘৃণা করি। আপনাদের কোনো কথা আমি বিশ্বাস কার না। অনুগ্রহ করে অমল নামের সেই শয়তানটাকে ডেকে দিতে পারেন? আমি তার মুখোমুখি দাঁড়াতে চাই একবার।

নিঃশ্বাস নিয়ে সন্দীপ বললো, সে নেই। টাকা পয়সা নিয়ে সে বিয়ের রাত থেকেই পলাতক।

পলাতক? কোথায়?

কেউ জানে না। সম্ভবত জলপথেই সে ভারতবর্ষ ছেড়েছে। পুলিসের চোখে ও ধুলো দিয়েছে, দলের চোখেও ধুলো দিয়েছে, শুধু মাত্র তো বিবাহের কুড়ি হাজার টাকাই নয়, নগদেও হাজার পনেরো দিয়েছিলেন উকিল ভদ্রলোক, তার উপর গয়না বিক্রী করে পেয়েছে তিরিশহাজার--সব নিয়ে গেছে?

পাঁচ হাজার টাকা প্রথম দিকে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য বোধহয় পার্টি ফাণ্ডে দিয়েছিলো, একটা নোট রেখে গেছে তা থেকেই টাকা নিয়ে আমি যেন তোমাকে জলপাইগুড়ি পাঠিয়ে দিই।

এরপরে আর স্তম্ভিত মণিমালা একটিও কথা বলতে পারলেন না। সন্দীপও অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে গাঢ়স্বরে ডাকলো, মণিমালা—

মাথা ঝেঁকে উত্তেজিত ভাবে মণিমালা বললেন, আমাকে আপনি কক্ষনো নাম নিয়ে ডাকবেন না।

সন্দীপ ব্যথিত হয়ে বললো, কেন?

আপনার সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক? আপনাকে আমি কতোটুকু চিনি? জানি।

তুমি আমার স্ত্রী।

কক্ষনো না, কক্ষনো না—

তা হলে নিয়ম পালনই তোমার কাছে সবচেয়ে বড়ো? ভালোবাসার কোনো মূল্য নেই। মণি, আমার মণি—

মণিমালা কানে আঙুল দিলেন, না না না। আমি আর এক মুহূর্ত এই নরকে থাকতে চাই না।

আমার দিকে তাকিয়ে দ্যাখো—

দেখেছি, আমি দেখেছি, প্রত্যেকে আপনারা এক একটি অমল, আপনারা সবাই আমার বাবার মৃত্যুর জন্য দায়ী, আপনাদের সবাইকে আমি ধরিয়ে দেব, আমার অমন ঋষিতুল্য বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ আমি নেবো নেবো নেবো—

ছুটে মণিমালা বসার ঘরে এলেন, বেরিয়ে যাবার জন্য প্রায় খুলে ফেলেছিলেন ছিটকিনিটা। কোথায় ওৎ পেতে বসে থাকা সতর্ক গোবর্ধন ছুটে এলো, পুলিস পুলিস, অনেক পুলিস, বাড়ি ঘেরাও করছে। সেল্টার, সেল্টার—

মণিমালার হাত থেমে গেল, ঘাম ছুটে গেল, স্থিব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সন্দীপের দিকে আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে ফিসফিস করলো, পালান পালান—

সন্দীপ বললো, না।

মণিমালা দুহাতে জড়িয়ে ধরে নিঃশব্দ কান্নায় ভেসে গিয়ে বললেন, আমার কী হবে সেটা ভাবছেন না? টানতে টানতে নিয়ে এলো বাথরুমের পিছনের দরজায় কোথায় সেল্টার? চলে যান।

না।

বেশ, তাহলে আমিও আজ ধরা দেব, আমি তোমার স্ত্রী, আমি তোমার সঙ্গিনী হবো।

সন্দীপ নিচু হয়ে এই দ্বিতীয়বার তাঁকে চুম্বন করলো। অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে যেতে বললো, তুমি থাক, আমি ঠিক ফিরে আসবো।

না, আর সে ফিরে এলো না, এলো বাড়ি ছাড়ার নোটিশ। দিন কয়েক বাদে একটি ছেলে তাকে পৌঁছে দিয়ে গেল শেয়ালদা স্টেশনে হাতে পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে বললো, দার্জিলিং মেলের টিকিট কেটে চলে যাবেন। এই বলে মিশে গেল জনারণ্যে। বেলা তখন দুটো।

মণিমালা সেই মুহূর্তে সেই অচেনা পরিবেশে, অচেনা এক স্টেশনের মধ্যে দাঁড়িয়ে কী যে করবেন কী যে বলবেন কোথায় যে যাবেন কিছুই ভেবে পেলেন না। অসহ্য যন্ত্রণায় মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছিলো। কানের মধ্যে সহস্র ঝিঁঝিঁপোকা একসঙ্গে ডেকে উঠে তাদের কর্কশ গলার ঐক্যতানে পাগল করে দিচ্ছিলো। সামনেই যে বেঞ্চিটা পেলেন সেখানেই বসে পড়ে মাথা এলিয়ে চোখ বুজলেন।

কতোক্ষণ যে সেভাবে কেটেছে জানেন না। সঙ্গের ছোটো স্যুটকেসটা তাঁর অসাবধানতার সুযোগ কে কখন নিয়ে পালিয়েছে তা-ও খেয়াল করেননি।

হঠাৎ শুনলেন, কেউ বলছে, আরে, মণি না ? এখানে ?

ঘোর ঘোর চোখে তাকিয়ে দেখলেন, ডাক্তার সমাদ্দার দাঁড়িয়ে আছেন মাথার কাছে। ইনি উকিল কাকাবাবুর পিসতুতো দাদা। কতোবার জলপাইগুড়ি গেছেন, নিজের বাড়ি দার্জিলিংয়ে। বাবার সঙ্গেও বেশ বন্ধুত্ব হয়েছিলো, মণিমালাকে খুব ভালোবাসতেন, আদর করতেন। বলতেন, ছেলে থাকলে বউ করতাম।

তাঁকে দেখে মণিমালার এতোক্ষণ চেপে থাকা ভয় ভাবনা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দুঃখ শোক বেদনা বিচ্ছেদ সব যন্ত্রণা ঠেলে বেরিয়ে এলো বুকের ভিতর থেকে। দুহাত বাড়িয়ে 'কাকাবাবু' বলে ডেকেই তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন।

ডক্টর সমাদ্দার ট্রেনে করে রাণাঘাট যাচ্ছিলেন কোনো বন্ধুকন্যার বিবাহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। গেলেন না। মণিমালাকে নিয়ে ফিরে এলেন বাড়িতে।

তাঁর হাতেই সেই মণিমালা আজ এই মণিমালায় এসে পৌঁচেছেন। মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। ঠিক আটবছর আগের কথা। পাসটাস করে ডক্টর সমাদ্দারের অ্যাসিসটেন্ট হয়ে আছে। কাকাবাবু দার্জিলিং চলে এসেছেন বছর খানেক আগে। এখন এখনকারই স্থায়ী বাসিন্দা। নার্সিংহোম করেছেন একটা, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকল রোগীরই বন্ধু তিনি। অর্ধেক অংশ দাতব্য, অর্ধেক অংশ পেইড। দার্জিলিং-এর গরীব লোকেরা তাঁকে 'দেওতা' বলে। এই হোমের প্রায় সকল ভারই তিনি মণিমালার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি নিঃসন্তান। বর্তমান বিপত্নীক। মণিমালাই তাঁর ডান হাত বাঁ হাত। একটু উপরেই তাঁর নিজের কটেজ।

কী মাসের কোন তারিখে মণিমালা প্রথম সন্দীপ মুখার্জিকে দেখেছিলেন, অন্তরতম প্রদেশে লাল অক্ষরে দাগ দেয়া সেই তারিখটিকে সহস্র সহস্র বারের মতো আর একবার স্মরণ করলেন। মৃত্যুপথযাত্রী রোগীটির মুখের দিকে অপলকে তাকিয়ে বুকের মধ্যে প্রবল ঝড়ের বেগ অনুভব করলেন। সন্দীপ তো মিথ্যে কথা বলতে জানে না, যাবার সময় বলেছিলো তুমি থাকো, আমি ফিরে আসবো তাই সত্যি সত্যিই যাবার আগে কথা রাখতেই সে ফিরে এসেছে। মণিমালা স্থানকালপাত্র সব ভুলে ফুঁপিয়ে উঠে জড়িয়ে ধরলেন রোগীকে। শক্ত করে ধরে রেখে মনপ্রাণ বিকিয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন, ভগবান, ওকে তুমি নিও না নিও না, যদি ফিরিয়েই এনে থাক, তবে ফিরিয়েই দাও। ফিরিয়েই দাও।

রূপান্তর

ডিসেম্বর মাসের শেষ, তিন দিন ধরে নিউইয়র্ক শহরে প্রচণ্ড গর্জনে বাতাস চলছিলো। সেই সঙ্গে বালির কণার মতো ছোট ছোট বৃষ্টির ছাঁট বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পিন ফোটাচ্ছিলো সব কিছুর উপর। মাঝে মাঝে বরফের কুচি ঝরছিলো অথবা ঝরছিলো না, বাড়ি থেকে বেরোবার উপায় ছিলো না বারো। খবরের কাগজে বলাবলি হলো, এভাবে আর দু-এক দিন চললে শহর অচল হয়ে যাবে, তা ছাড়া এরই মধ্যে বেরুতে গিয়ে ঝড়ের মুখে কুটোর মতো বেশ কিছু লোক কোথায় না কোথায় গড়িয়ে গেছে, যাদের কোনো হদিস মেলেনি।

কী একটা ছুটির সুযোগে ছোট্ট শহর প্লুমিংটন থেকে আরো তিনজন ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে বেড়াতে এসে মারিয়া হতাশ হলো। এখানে কতো কিছু কেনাকাটার ছিলো তার, কতো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করার ছিলো, দুপুর ভবে মিউজিয়ামগুলো ঘুরে বেড়াবে ভেবেছিলো, মনে হলো সব মাটি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ প্রান্তের মেয়ে সে, চোখের রং কালো, চুলের রং কালো গায়ের রং তেলের মতো কোমল পিছল। গড়ন ছিপছিপে, ঈষৎ ফোলা ফোলা টুকটুকে নরম ঠোঁটের ফাঁকে সুসম্বদ্ধ দাঁতের পঙ্‌ক্তি। মুখখানা নিখুঁত অর্থাৎ মারিয়া সুন্দরী। শুধু সুন্দরীই নয়, স্বভাবের মাধুর্যেও সে সকলের প্রিয়। ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকসাহিত্যে গবেষণা করছে। অত্যন্ত ধর্মভাবাপন্ন। জীবনের উচ্চাশা সমাজসেবা। বয়স তেইশ পূর্ণ, কিন্তু এখনো কোনো ছেলে বন্ধু নেয়নি, সে সবে রুচি নেই তার। সে মেয়েদের ডর্মে থাকে, ডর্মের লাউঞ্জে বসে ছেলেমেয়েরা ভালবাসাবাসি করে বলে কোনো দিন সে লাউঞ্জে বসে না। যতোটা সময় কলেজে থাকে, তার বাইরের সমস্তটা সময়ই প্রায় লাইব্রেরীতে কাটায়। ডর্মের প্রত্যেকটি মেয়ের সঙ্গে তার সৌহার্দ্য, সবাই তাকে ভালোবাসে, মান্য করে। গলায় একটি সরু আসল সোনার হারের লকেট হিসেবে ক্রুশ চিহ্নটি তার বুকের মধ্যস্থলে দোদুল্যমান, ঐটিই তার প্রাণকেন্দ্র। প্রত্যেক রোববার গির্জায় না গেলে নিজেকে তার অপরাধী বলে বোধ হয়।

দেশে মা বাবা ভাইবোন সবাই আছে, টেবিলের উপর সযত্নে সকলের ফটো সাজিয়ে রেখেছে, মাঝে মাঝে বন্ধুবান্ধবের কাছে তাদের গল্প বলতে বলতে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

তার স্বভাবের মধ্যে একটিই মাত্র উচ্চকিত ব্যসন, দেশভ্রমণ। সুবিধে পেলে ছাড়ে না। ঐটুকু রন্ধ্র দিয়েই বহু যুবক তার হৃদয়ে প্রবেশের দ্বার খুঁজেছে, অন্ধ মৌমাছির মতো মাথা ঠুকেই মরেছে শেষ পর্যন্ত, দরজা এতোটুকু ফাঁক হয়নি।

নিউইয়র্কে তার একজন কাকা থাকেন, এই কাকা কাকিমাকে সে খুব ভালোবাসে। এসে তাঁদের কাছে উঠেছিলো। ব্লুমিংটন থেকে নিউইয়র্ক আসা সহজ নয়, হাজার মাইলের দূরত্ব, খরচ ভীষণ। অনেক দিনের চেষ্টায় দল পেয়েছিলো একটা, ভাগাভাগি করে তেমন কষ্টসাধ্য হয়নি। কিন্তু এসে যে এমন হবে তা কি সে জানতো?

বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক ব্লুমিংটন নামের মফস্বল শহরটির বেশীর ভাগ লোকেরই গাড়ি আছে। মাস্টারদের তো বটেই, ছাত্রদের মধ্যেও কিছু কম নয়। ছুটিছাটা বা উইকেণ্ডে সেই গাড়িওলা ছাত্রদের মধ্যে বাইরে যাবার ধুম পড়ে যায়। কিন্তু যেই যেখানে যাক, সে-ই বিশ্ববিদ্যালয়ের চোখে পড়ার মতো জায়গাগুলোতে একটি একটি নোটিস টাঙিয়ে দেয়। জানিয়ে দেয়, কেউ যদি সঙ্গী হতে চায় তবে যেন নোটিস দেখে ফোন নম্বর বা ঠিকানা জেনে তার সঙ্গে যোগাযোগ করে। জায়গা থাকলে নিয়ে যাবে গাড়ি চালাতে জানে এমন সঙ্গীই চায় সবাই তা হলে পথ খরচার ভাগের মতো পরিশ্রমেরও ভাগীদার হয়। দূরের পাল্লা হলে এক হাতে বাইশ চব্বিশ ঘণ্টা চালানো শক্ত।

যদিও মারিয়ার নিজের গাড়ি নেই, কিন্তু চালাতে সে দক্ষ। এই ধরনের রাইড পেলে সেও যেমন উল্লসিত হয়ে সঙ্গ নেয়, তাকে সঙ্গী পেলে তারাও তেমনি খুশী হয়ে ওঠে। এই করেই সে তার দেশভ্রমণের ক্ষুধা মেটায়।

তা বলে নিউইয়র্কের রাইড বড়ো একটা পাওয়া যায় না। বেশ কয়েক-দিনের ছুটি না পেলে ছাত্রছাত্রীরা এতো দূরে আসে না কেউ। সকলের ওঠবার মতো জায়গাও থাকে না। আর জায়গা না থাকলে কোনো হোটেলে ওঠার মতো টাকা থাকে না তাদের কাছে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে এবার চমৎকার একটা দল জুটে গেল। ঠিক ছুটিটার মুখে। আর দিক-পাশ চাইলো না মারিয়া, একটা গান ভাঁজতে ভাঁজতে ছোটো চামড়ার স্যুটকেসটা নিয়ে সটান গাড়িতে উঠলো। আর কী ফূর্তি করতে করতেই না এসেছে! হইহল্লা গান, যেখানে সেখানে থেমে বনে বাদাড়ে লেকের ধারে বসে খাওয়া, রাত্রিবেলা হোটেলে ঘুম—দেড় দিনে এক হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে পৌঁছেছে এসে। আদ্ধেক চালিয়েছে মারিয়া, আদ্ধেক যার গাড়ি সে নিজে। তারপর শহরে ঢুকে ছিটকে গেছে যে যার জায়গায়। এসেছে পাঁচ দিনের জন্য, তার তিন দিন তো কেটেই গেল।

মারিয়ার কাকার বাড়ি কলম্বিয়া পাড়ায়, হাডসন নদীর ধারে। উনি আসলে মারিয়ার নিজের কাকা নন, বাবার বন্ধু এবং মারিয়া এককালে তাঁর প্রিয় ছাত্রী ছিলো। ভদ্রলোক নিঃসন্তান, স্বামী স্ত্রী দুজনেই মারিয়াকে নিজের মেয়ের মতো ভালোবাসেন। মারিয়াও তাঁদের নিতান্ত আপন জন

ছাড়া ভাবে না। এঁদের কাছে এলে সে বাড়ি ফেরার সুখ পায়।

কাকিমা বললেন, মন খারাপ করে কী করবে, যে ক'দিন আছ ঘরে বসেই বাটাও। আমরা অবিশ্যি সুখী, ঝড়ের জন্য সারাক্ষণ তোমাকে পাচ্ছি।

মারিয়া চোখ তুলে হাসলো একটু।

এ বছর শীতও পড়েছে খুব। হেমন্ত ঋতু যেমন দেরি করে এসেছে, তেমনি দুমড়ে দুমড়ে শীত নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে। সমানে বরফ পড়ে-পড়ে পথঘাট পিছল। অথচ আসবার দিন কী সুন্দর আবহাওয়া ছিলো। সোনার মতো রোদ ঝকঝক করছিলো চারদিকে। দেড় দিনে একবারের জন্য এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়েনি, বাতাস ওঠেনি। হাইওয়ে দিয়ে সমানে আশি স্পীডে চালিয়ে কী মজাই না লাগছিলো! আর এসে নামা মাত্রই এই!

এক দিন তো হাওয়া এমন জোব হলো যে, লিফট পর্যন্ত অচল হয়ে রইলো। এটা যে কী কবে হলো, বুঝতেই পারলো না মারিয়া। বাড়ির সমস্ত জানালা দরজা মোটা কাচে আবদ্ধ, তাব উপরে ভেলভেটের পর্দা দিয়ে মোড়া, তবু কোথা থেকে সুঁই সুঁই শব্দে হাওয়া ঢুকতে লাগলো ভিতরে, কে জানে, লিফটের দরজা বন্ধ করা গেল না। আর দরজা বন্ধ না হলে লিফট চলবে কী করে? নিচে থেকে উঠলোই না উপবে। ভাগ্যিস ছুটি চলছিলো বাড়ি থেকে না বেরিয়ে কাটালো কোনোমতে। তার কাকা থাকেন আঠেবোতলায়, পায়ে হেঁটে ওখানে উঠতে গেলেই হয়েছিলো আর কি।

এর মধ্যেই বিকেল বেলা ট্যাক্সী করে এক বন্ধুর বাড়িতে একটা পার্টিতে গেল সে। ক'দিনের মধ্যে এই প্রথম আকাশের তলায় বেরুনো। ট্যাক্সীটা বাড়ির দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলো, তাতে হাওয়া কম লাগে। তবু ঐটুকু যেতেই মারিযা প্রায় উড়ে যায় আর কি! দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতে ধস্তাধস্তি কবতে হলো। ড্রাইভার নেমে এসে দবজাটা টেনে ধরে রইলো তবে ঢুকতে পারলো সে। মনে হচ্ছিলো খোলা দরজাটা বুঝি গাড়ি থেকে ছিঁড়ে নিয়ে যাবে বাতাসে। সামনে হাডসন নদীতে মনে হলো বান ডেকেছে। ড্রাইভার গাড়ি চালাতে চালাতে বললো, নদীর ধারে বলে এখানেই বাতাসের জোরটা বেশী। যদি বুঝতে পারতাম আসতাম না।

মারিয়া মনে মনে বললো, ভাগ্যিস বোঝেনি, বাড়ি বসে বসে আমার হাতে পায়ে যে বাত ধবে গেছে।

এ রকম হাওয়ায় কিন্তু না বেরুনোই ভালো। ড্রাইভার আবার মন্তব্য করলো, এ হাওয়া শয়তান, গাড়ি উল্টে দিতে পারে। তার মধ্যে যা বরফ পড়ছে।

না, না, অত ভয় কিসের। মারিয়া নরম করে মাথা নাড়লো।

বলছেন কি ম্যাডাম। মুখ ফেরালো ড্রাইভার, এ তো রীতিমতো হারিকেন।

লোকটা তো ভারি ভীতু! মারিয়া চুপ করে রইলো।

বন্ধুর বাড়ি পেঁাছোতে পেঁাছোতে বাতাসের জোর কিন্তু কমে এলো অনেকটা। ড্রাইভার বললো, এ ম্যানহাটানের স্কাই-স্ক্র্যাপার আটকে দিয়েছে! ফাঁকা জায়গায় দেখুনগে ঠিক তাই।

হতে পারে। মারিয়া গাড়ি থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে লঘু পায়ে ঢুকে গেল বাড়ির ভিতরে।

বেশ জমলো পার্টিটা। খুব হইচই হলো, খাবার পরে নিজেরাই পরস্পরকে জড়িয়ে নাচলো খানিকক্ষণ, ভালো ভালো ওয়াইনের নেশায় ফুর্তি হলো খুব। দেখতে দেখতে দশটা বেজে গেল। ঘড়ি দেখে তাড়াতাড়ি উঠলো মারিয়া। যা ঝড়বাদলেব রাত, এব পবে আব ট্যাক্সীই মিলবে না। বন্ধু বললো, তাতে কি, সাবওয়েতে চলে যেযো, তাডাতাডিও হবে, ঝড়ও পাবে না।

মারিয়া মাথা নাড়লো, ওটা তার এখনো আযত্তে আসেনি। মফস্বলে থাকে, নগরের মাটির তলার ম্যাপ মুখস্থ কম। পথ ভুল করলে একেবারে গোলকধাঁধাঁ। তা ছাড়া আরো একটি কাবণ চাপা ছিলো তার মনের তলায়। কলম্বিয়া পাড়াটা নিগ্রোতে ভর্তি। মারিয়ার ভীষণ বিদ্বেষ তাদের উপর। তাদের সে ভয় করে, ঘেন্না করে। অত ভালো মারিয়া, অমন হৃদয়বতী, সত্যবাদী, সচ্চরিত্র, সমাজসেবিকা, এই একটা ব্যাপারে তাব মায়া মমতা ধর্ম সমস্ত পাশবিক হয়ে ওঠে। তার কর্মের পুণ্যতালিকায় সর্বজীবে দয়ার মধ্যে এই মানুষগুলোকে সে কোনো রকমেই জায়গা দিতে পারে না যদি কোনো উপায়ে দেশ থেকে এদের উচ্ছেদ করতে পারতো তা হলে সকলের আগে সেই মহৎ কাজটা সেরে নিত। সে দক্ষিণের মেয়ে, যতো শিক্ষাই পাক, যতোই ভালো হোক, এই বিদ্বেষ তার রক্তের মধ্যে মিশে গেছে। কিন্তু এ কথা সে প্রকাশ করে না, সে জানে, এটা শুনলে অনেকে তাকে বিচার করবে বিশ্লেষণ করবে, সেটা সে চায় না। তাদের সরকারের সঙ্গে এই নীতিতে সে সম্পূর্ণ দ্বিমত।

সে রাস্তায় এসে একটা ঢাকনাব তলায় দাঁড়ালো। কিন্তু দাঁড়িয়েই গাড়ি পেলো না কেউ যেতে চায় না। ঠাণ্ডায়, বাতাসের বেগে, হাত-পা প্রায জমে আসছিলো। মাথার রুমালটা আরো শক্ত করে বেঁধে নিল, দস্তানাপরা হাত দুটো ঢুকিয়ে রাখলো পকেটের মধ্যে। প্রায় আধ ঘণ্টা ছুটোছুটির পর শেষে মিললো একটা। মিললো মানে হাত দেখিয়ে থামিয়ে প্রায় জোর করে উঠে বসলো। তারপর ঠিকানা বললো। ভাগ্যিস জোর করে উঠেছে, উঃ, মরে যাচ্ছিলো প্রায়! গাড়ির গরমে বেশ আরাম লাগলো। গুছিয়ে বসতে বসতে অনেকটা এগিয়ে এলো ট্যাক্সী, মারিয়া রাস্তায় তাকালো।

রাস্তায় একটিও লোক চলছিলো না সেদিন, একটার পর একটা ব্লক পাব হয়ে যাচ্ছিলো, কোথাও কোন গাড়ি মিলছিলো না। এতক্ষণ ট্যাক্সী পাবাব জন্য এতো উদ্বিগ্ন উত্তেজিত ছিলো যে, রাস্তার এই নির্জনতাটা সে আন্দাজ করতে পারেনি। নিশ্চিন্ত হয়ে অন্ধকার গাড়ির আরামে শরীর চাঙ্গা হয়ে

উঠতেই এদিকে নজর গেলো তার। কুয়াসাচ্ছন্ন আলোর তলায় ঝিরিঝিরি বরফ পড়া জনহীন নিস্তব্ধ রাত্রির দিকে তাকিয়ে কেমন থমথমে লাগলো। রাস্তার দু পাশে বরফে ঢেকে-যাওয়া কতোগুলো গাড়ি অতিকায় মৃত জন্তুর মতো ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে পড়ে আছে, সেদিকে তাকিয়ে তার ভয় করলো। আরো অনেক দূরে যেতে হবে তাকে, শহর ছাড়িয়ে নদীর ধারে—তার মনে হলো, সেই দূরের নদীর ধার কখনো আসবে না তার জীবনে। ভিতরটা শিউরে উঠলো।

ভয় জিনিসটা মারাত্মক, একবার আরম্ভ হলে থামতে চায় না, মারিয়ার মনও তার ব্যতিক্রম হলো না। বাইরে দাঁড়িয়ে সে শীতে যতো কাতর হয়েছিলো, ভেতরের গরমে বসে তার দ্বিগুণ শৈত্য অনুভব করলো। নিজের মনের সঙ্গে সে তর্ক করতে লাগলো, যুক্তি দিয়ে বোঝালো, এই ভয় তার অমূলক। কেননা রাস্তা যতোই নির্জন হোক, সে তো আছে গাড়ির মধ্যে এ কথা কি কেউ কখনো শুনেছে যে, নির্জনতার সুযোগে কখনো কোনো ট্যাক্সিচালক তার সোয়ারীর সঙ্গে গুণ্ডামি করেছে? কেন করবে? তারাও তো সবাই সম্পন্ন, শিক্ষিত, ট্যাক্সী চালায় বলে কি তারা জন্তু নাকি? মারিয়া গলায় মধু ঢেলে আলাপ করার চেষ্টা করলো, আজ বড্ড খারাপ দিন না?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ট্যাক্সীচালক আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে সাবধানে ধীরে ধীরে গাড়ি চালাচ্ছে। গলার আওয়াজ মেঘের মতো গম্ভীর। মারিয়া একটু উসখুস করে আবার বললো, মাত্র এগারোটা বেজেছে, কী নির্জন রাস্তা। না?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

সারাদিন গাড়ি চালাতে খুব কষ্ট হয় বোধ হয়?

সকলের হয় কিনা জানি না, আমার তো হচ্ছে। নতুন কিনা।

নতুন!

আমি ছাত্র এই সেমেস্টারটা পড়বো না, গাড়ি চালিয়ে টাকা জমাবো, পরের সেমেস্টারে আবার ভর্তি হবো।

ও, ছাত্র! বুকটা ঠাণ্ডা হলো মারিয়ার, আপনি তা হলে ছাত্র? কোন কলেজের?

কলম্বিয়ারই।

খুব ভালো, খুব ভালো। মনের সমস্ত ভয় ধুয়ে আবার সে আরাম করে বসলো। হাতের দস্তানাটা খুলে কোলের উপর রেখেছিলো, পড়ে গেল পায়ের তলায়। নিচু হয়ে খোঁজাখুঁজি করছিলো, ছেলেটি আলো জ্বালিয়ে মুখ ফেরালো, হারিয়েছে কিছু?

না, না, এই হাতমোজাটা, অনেক ধন্যবাদ, অনেক ধন্য—মাথা তুলে ঝাপসা আলোয় লোকটির দিকে তাকিয়ে মুখের কথা আটকে গেল মারিয়ার। যেন দাঁতে দাঁত লেগে এলো। ছেলেটি আলো নিবিয়ে আবার পিছন ফিরে গাড়ি চালাতে লাগলো। কিন্তু ঐ এক পলকই যথেষ্ট।

বুকটা তারপর এতো জোরে টিপটিপ করতে লাগলো যে, মনে হলো সারা জগৎ শুনতে পাচ্ছে সে শব্দ। আশ্চর্য! এতোক্ষণ সে কতো ভেবেছে, এ কথাটা তার একবারো মনে হয়নি। অথচ এ কথা কি সে জানে না যে, আজকাল আর দেশে কোনো বাছবিচার নেই, সব কাজেই ওরা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, আস্পর্ধা দিয়ে দিয়ে মাথায় তোলা হচ্ছে এই মানুষগুলোকে। সে রাস্তার নির্জনতাকে ভয় করছিলো, আসল ভয় যে জঙ্গলের ভালুক হয়ে ভিতরেই থাবা গেড়ে বসে আছে, সে কথা কি একবারেব জন্যও মনে হয়েছে তার? কিন্তু এখন? এখন কী করবে সে?

জিব দিযে বং করা ঠোঁটটা ভিজোলো দুবার, তখুনি শুকিয়ে গেল। স্প্রীং-এব মতো ছিটকে সরে এলো দবজার ধারে, ঘেঁষে বসে নিজেকে সতক কবলো, ভিতব থেকে একটা অদ্ভুত অপ্রতিবোধ্য কাঁপুনি উঠতে লাগলো ক্রমাগত। কী মিথ্যুক! আবার বলে আমি ছাত্র। সব মিথ্যে কথা। সব চালাকি। এজন্যই তাড়াতাড়ি ট্যাক্সীতে এলেছে। কই, আর তো কেউ তুললো না। সকলকেই তো সে হাত দেখিয়েছিলো। তুলবেই তো, না তুললে মতলব সিদ্ধি করবে কেমন করে?

হায। হায়। যে ভযে সে মাটির তলায় নামলো না, সেই ভয়ই তাব বাহন হয়ে তাকে মাটির উপরে আঁকড়ে ধরেছে? ঈশ্বর। ঈশ্বর।

লোকটির চামড়ার কোটে ঢাকা প্রশস্ত পিঠের উপরে চোখ দুটি বিঁধিযে বেখে মারিয়া বুকেব মধ্যস্থলে দোদুল্যমান ক্রুশটিকে চেপে ধরলো দু হাতে।

আস্তে আস্তে শহরেব ঘিঞ্জি ছাড়িয়ে গাড়ি ফাঁকা রাস্তায় পড়লো। ঢেউয়ের মতো ওঠানো-নামানো মস্ত মস্ত চওড়া পথ যেন রাক্ষস হয়ে গিলতে লাগলো তাকে। তবু ওখানে দু পাশে স্কাইস্ক্র্যাপারের পাহারা ছিলো, এখানে আর কেউ নেই। কিছু নেই। শুধু আকাশ। আর আকাশের সঙ্গে মিশে যাওযা বরফের সমুদ্র। একেবারে উন্মুক্ত, অবাধ। যেন সারা পৃথিবীটা ভেসে গেছে প্রলয়ে। আর তার মধ্যে একলা অসহায় মাবিয়া।

শহর ছাড়ানো মাত্র হাওয়ার বেগও প্রবল হয়ে উঠলো। স্কাইস্ক্র্যাপার যে শুধু মারিযারই পাহারাদার ছিলো তাই নয়, হাওয়াকেও আটকে বেখেছিলো। ছাড়া পেয়ে রুষে ফুঁসে পিশাচের মতো চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে এলো, মনে হলো নখে দাঁতে সমস্ত বিশ্ব আজ ছিঁড়ে ফেলতে বদ্ধ-পবিকর। সেই হাওয়া কেটে-কেটে অত্যন্ত ধীরে-ধীরে গাড়িটা এগুচ্ছিলো, মাবিযা বুঝে নিল এই শম্বুক গতিই একসময় তাকে নিয়ে নরকে ঢুকবে। নবক। নরক। জীবন্ত নরক। আমি কী করি! কী করি!

এমন মর্মান্তিক ভয় মারিয়া জীবনে পায়নি। একটা ঘৃণিত নিগ্রোর সঙ্গে এমন একা হবার দুঃসহ অবস্থা তার স্বপ্নেও ছিলো না। কখনো সে এর আগে নিগ্রো ট্যাক্সীচালক দেখেনি। দেখলে কি সে কখনো ওঠে? মুখখানা ঢেকে এইভাবেই তো লোকটা মারিয়াকে ঠকিয়ে গাড়িতে তুলেছে।

কী নিঃশব্দ! কী ভীষণ চুপ করে আছে! কী ভয়ঙ্কর মনোযোগ দিয়ে গাড়ী চালাচ্ছে! যেন এই গাড়ী চালানো ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য

নেই মনে। কিন্তু মারিয়া কি বোকা? মারিয়া কি ওর প্রকাণ্ড পিঠের উপর দৃষ্টি রেখেই বুঝতে পারছে না, এই শব্দহীনতার তলায় কতো বড়ো গর্জন লুকিয়ে রেখেছে? ওর গালের পাশটা দেখেই কি উপলব্ধি করতে পারছে না, সেই মুখ কী কুৎসিত, কী নোংরা, কী লুব্ধ? লালসা ছাড়া আর কী আছে ওদের বুকের তলায়? আর সেই লালসার এমন ইন্ধন কি ও রোজ পাবে? এই সোনার সুযোগ কি ও আজ কখনোই হেলায় হারাবে? যদি হারাবেই, তবে আর গাড়ী থামিয়ে মারিয়াকে তুলে আনবে কেন? সাদা মেয়ে ভোগ করার উল্লাসের চাইতে আর বড়ো লোভ কী আছে এই কালো কদর্য মানুষ-গুলোর জীবনে?

তবে কি, গাড়ী খুলে লাফিয়ে পড়বে মারিয়া? এ কী, এ কী! গাড়ীটা থামিয়ে দিচ্ছে কেন? এটা কোন পথ? কোন পথে বাঁক নিচ্ছে? কই, এ রাস্তা তো সে কখনো দেখেনি। কোনোদিন তো আসেনি এই রাস্তায়। হে ঈশ্বর। হে ঈশ্বর। তুমি কি দেখতে পাচ্ছো না, পশুটার চোখেমুখে কী ক্ষুধা জেগে উঠেছে? এই দেখ, এইবার এইবারই ও যা করবার করবে। সর্বনাশ করবে আমার। এক হ্যাঁচকা টানে টেনে নেবে, শরীরটাকে চেটেপুটে খেয়ে সযত্নরক্ষিত, ঈশ্বরে নিবেদিত সমস্ত নারীত্বকে ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার করে দেবে।

মারিয়া দরজার হাতলে হাত রেখে টানটান হয়ে যে-কোনো মুহূর্তে লাফিয়ে পড়বার জন্য প্রস্তুত হলো। দুই চোখের জলে ভেসে বললো, প্রভু, এতো নিষ্ঠুর তুমি। যে মারিয়া তোমাকে স্মরণ না করে বিছানা ছাড়ে না, তোমার সৃষ্ট যে মারিয়া কাউকে ঘৃণার চোখে দেখে না যে রমণী আজ পর্যন্ত একজন পুরুষের দিকে পাপ চোখে তাকিয়ে নিজের কুমারী-জীবনের পবিত্রতা নষ্ট করেনি, তাকে তুমি এতো কষ্ট দিচ্ছ? হে আমার ঈশ্বরের পুত্র, কেন এতো নিষ্ঠুর তুমি? আমি কি কখনো মিথ্যাকথা বলেছি? কারো মনে ব্যথা দিয়েছি? মানুষ হয়ে মানুষকে অসম্মান করেছি? তবে কেন, কেন, কী পাপের ফলে আমাকে একটা মাংসখণ্ডের মতো একটা লোভী কুকুরের মুখে ছুঁড়ে দিচ্ছ?

বিড়বিড় করে বলতে-বলতে প্রায় শব্দ করে কেঁদে উঠছিলো মারিয়া, গাড়িটা নিঃশব্দে থেমে গেল।

কী! কী হলো?

আস্তে নামবেন, জায়গাটা ঢালু, হাওয়া বইছে জোরে। আবার আলো জ্বেলে দিল নিগ্রো ড্রাইভার। মারিয়া যেন স্বপ্ন দেখে জেগে উঠলো, ও, এসে গেছি? এসে গেছি? কী আশ্চর্য! উত্তেজিত কম্পিত হাতে সে তাড়াতাড়ি ব্যাগের মুখ খুলে ভাড়া বার করলো। তার চেয়েও তাড়াতাড়ি নেমে পড়লো রাস্তায়।

ট্যাক্সীটা দাঁড়িয়েছিলো কোণ ঘেঁষে, সেই কোণটুকু পেরোতেই হাওয়ার ধাক্কায় গাঢ় অন্ধকারে উল্টে পড়লো সে। তার হাতের ব্যাগটা ছিটকে গেল। পা থেকে জুতোটা যেন ছোঁ মেরে টেনে নিল কেউ। কোটসুদ্ধ ফ্রকটা উড়তে

লাগলো উপরের দিকে। টুপি খুলে চুল খুলে শক্ত শীতল পিছল বরফের মধ্যে মুখ থুবড়ে কোথায় গড়িয়ে যেতে লাগলো। বুকে ভর দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করে বসলো। হাওয়ার বিদ্যুৎগতির প্রবলতার সঙ্গে তার মতো একজন সামান্য মেয়ের প্রতিযোগিতা বাতুলতা মাত্র। বাতাস আপন বেগে তাকে আছড়াতে-আছড়াতে নিয়ে চললো ঢালুর দিকে। মারিয়া উপলব্ধি করলো আর তার রক্ষা নেই। এতোক্ষণ সে যে অমূলক ভয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, সেই ভয় সত্য হয়ে মৃত্যু হয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তার। গড়াতে গড়াতে প্রাণপণ শক্তিতে সে চিৎকার করে উঠলো, বাঁচাও। বাঁচাও। মৃত্যু-ভয়ে ভীত গলার তীক্ষ্ম আর্তনাদে যেন ভরে গেল জায়গাটা।

ট্যাক্সী সবে স্টার্ট দিয়েছিলো, এক্সিলারেটরের চাপটা থামিয়ে জানালার কাচ সরিয়ে নিগ্রো ছেলেটি উৎকর্ণ হয়ে বাইরে তাকালো। ব্যাপারটা বুঝতে দেরি হলো না তার। আগেই সে সাবধান হতে বলেছিলো। নিশ্চয়ই তার সোয়ারী মেয়েটিই ঝড়ে পড়েছে। কিন্তু কোথায়? কতো দূর নিয়ে গেছে—দরজা খুলে লাফিয়ে নামলো সে। দেয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে জনহীন শূন্য রাস্তার উঁচু পিঠটার উপরে এসে দাঁড়ালো স্থির হয়ে। মস্ত মাথাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো কয়েকবার। মস্ত বলিষ্ঠ শরীরটাকে দুই ঝাঁকানি দিয়ে প্রস্তুত করে নিল যুদ্ধের জন্য, গায়ের ভারি ওভার কোটটা খুলে হালকা হয়ে নিল, টুপিটা নিজেই উড়ে গিয়ে কাজ বাঁচাল, তারপর প্রবল শক্তিতে সে এগিয়ে গেল চিৎকার অনুসরণ করে।

বেশ খানিকটা যেতে হলো তাকে।

নদীর ধারের পার্কটার রেলিং-এর ফাঁকে আটকে গিয়েছিলো মারিয়া, সমস্ত শক্তি দিয়ে সেটাকে চেপে ধরে নিজেকে হাওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছিলো সে, মানুষের সাড়া পেয়ে আকুল হয়ে উঠলো, স্পর্শ পেয়ে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলো। ছেলেটি অন্ধকারে কোনোরকমে টানতে টানতে একটা গাছের নীচে নিয়ে এলো তাকে, গলা থেকে আঁকড়ে থাকা হাতটা সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, এভাবে না, এভাবে না, এরকম করে জড়ালে আমি চলতে পারবো না, হাত ধরুন, নীচু হোন, গড়িয়ে আসুন, বড়ো ঝাপটা এলে গুঁড়ি মারুন, কোনোরকমে দেয়ালের আড়ালটায় চলুন—

হাওয়া কাটাবার কৌশলগুলো একের পর এক বলে যেতে লাগলো, কিন্তু মারিয়ার কানে বোধ হয় কোনো কথাই পৌঁছুলো না। ঈশ্বর-প্রেরিত অবলম্বনটি পেয়ে সে তার অবসন্ন বিধ্বস্ত শরীরটাকে একেবারে ছেড়ে দিল তার উপরে। যতো সে ছাড়াতে চেষ্টা করলো, ততো সে সাঁড়াশির মতো চেপে ধরে আঁকড়ে থাকলো বুকের মধ্যে। নিরুপায় ছেলেটি তখন পাঁজা-কোলে তুলে নিল তাকে। স্লিম বলে যতো গৌরবই থাকুক মারিয়ার, ঐ ঝড়ের মধ্যে, ঐ বরফের পিছল পথে চড়াই উৎরাই বেয়ে একটি তেইশ বছরের যুবতীর ভার বহন করে নিয়ে আসতে ছেলেটির দম বেরিয়ে গেল, বুকটা যেন ফেটে যেতে লাগলো। কিন্তু অন্য এক প্রাণের মমতায় নিজের অস্তিত্ব

ভুলে গেল সে। একসময় দেখা গেল, সেই অন্তহীন রাস্তাটা পেরিয়ে তারা ফুটপাতে দেয়ালের কোণে এসে পৌঁছে। এবারে পিঠ দিয়ে লাউঞ্জের ভারি পাল্লাটা ঠেলে ভিতরে ঢুকে এসে মারিয়াকে ঘরের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিল।

আলো-ঝলসিত লাল টুকটুকে কার্পেটমোড়া উত্তপ্ত উজ্জ্বল সুসজ্জিত লাউঞ্জের নিরাপদে দাঁড়িয়ে সংবিৎ ফিরলো মারিয়ার। সোফার উপর বসে পড়ে এতোক্ষণে সে চোখ মেলে তার জীবনদাতাকে দেখতে পেল।

ছেলেটির বুকটা তখনো নিঃশ্বাসের ঘনতায় জোরে জোরে ওঠাপড়া করছিলো, তখনো সে সুস্থির হতে পারছিলো না, পরিশ্রমের স্বেদ জমা হচ্ছিলো প্রত্যেক রক্তবিন্দুতে। পকেট থেকে রুমাল বার করে ভেজা মাথাটা মুছে ফেলতে ফেলতে সে-ও তার সোয়ারীকে এই প্রথম ভালো করে তাকিয়ে দেখলো। মুহূর্তের জন্য থমকে রইলো দৃষ্টিটা। তারপরেই চোখ সরিয়ে হাসলো একটু, বললো, ভাগ্যিস আমি আপনার চিৎকারটা শুনতে পেয়েছিলাম।

অনেক ধন্যবাদ। গলা চিরে শব্দ বার করলো মারিয়া।

ওটা ঈশ্বরের পাওনা। মুখ নিচু করে শার্টের বোতামে আটকে থাকা মেয়েদের চুলের দুটো মুক্তোর পিন খুলে সে মারিয়ার হাতে দিল, এ দুটো নিশ্চয়ই আপনার।

ও। মুখ লাল হয়ে উঠলো মারিয়ার, মুখটা কঠিন দেখালো। পিন দুটো সরিয়ে রাখলো সে।

একটু সুস্থ বোধ করছেন কি?

হ্যাঁ।

আজকের দিনটা বড়োই খারাপ ছিলো।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

এই ধরনের ঝড়ে না বেরুনোই ভালো।

উপদেশ দিচ্ছে আবার। মারিয়া ভুরু কুঁচকোলো, তাও বুঝতে পেরেছি।

খবরের কাগজে দেখেছেন বোধ হয়, পরশু রাত্তিরে একটা গাড়ি স্কীড করে কী কাণ্ড হয়েছে?

না, দেখি নি।

আপনি নিতান্ত জোর করে উঠে বসলেন তাই আর না বলতে পারলাম না, নইলে আমারও প্রচুর সে ভয় ছিলো। কতো সাবধানে যে চালিয়েছি!

অনেক ধন্যবাদ।

আর জানেন, একা থাকলে তো কিছু না, যা হয় হোক। কিন্তু আর একজনের দায়িত্ব নিলে তার জন্যেই যতো ভাবনা।

উঃ!

কিন্তু এমন এক অবয়বহীন অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করাও মন্দ রোমাঞ্চ নয়, কী বলেন? হঠাৎ দুই চোখ ভরে হাসলো ছেলেটি।

সেদিকে তাকিয়ে কী বলতে গিয়েও থেমে গেল মারিয়া, মুহূর্তের জন্য আনমনা হলো—মনে হলো, নিগ্রোদের চোখ তো ভারি সুন্দর!

বরফের ঝড় আমি খুব ভালোবাসি, খুব সুন্দর লাগে, খুব পবিত্র দেখায়। যেমন আকাশে চাঁদ হলে ফুটফুটে জ্যোৎস্না হয়, এ-ও তেমনি মাটির চাঁদ। রাতকে অন্ধকার হতেই দেয় না। ছেলেটি তার বাঁ পায়ের ভার ডান পায়ে নিল। তার শরীর থেকে জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে লাল কার্পেটের উপর দাগ কাটছিলো। মারিয়া সেই নকশাটা তাকিয়ে দেখলো। এতো ভিজেছে? কই, সে তো বেশ শুকনো আছে! অবিশ্যি তার মস্ত মোটা ফারের কোটটাই বাঁচিয়েছে তাকে। শুধু কি কোটটাই? এই বলিষ্ঠ ছেলেটির প্রশস্ত বুকের আশ্রয়ও কি তাকে আচ্ছাদন যোগায়নি? এতক্ষণে মারিয়ার খেয়াল হলো ছেলেটিকে সে একবারও বসতে বলেনি, অথচ নিজে সে নরম সোফায় নরম কুশানের কুণ্ডলীতে গলে আছে আরামে। এটা তার মতো ভদ্র শিক্ষিত একজন কুলীন মেয়ের পক্ষে অবশ্যই অসৌজন্য।

বসুন না। আন্তরিক ভাবেই বলেছিলো, ছেলেটি তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করলো সেই অনুরোধ, ধন্যবাদ। বসবার সময় নেই আমার। পকেট থেকে পাইপ বের করে তামাক টিপতে লাগলো।

মারিয়ার নরম হয়ে আসা ভঙ্গিটা তক্ষুনি গরম হয়ে উঠলো। একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বলল, তা হলে আর ভেজা জামায় দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

সত্যি, কার্পেটটা একেবারে ভিজে যাচ্ছে, না? একটু তাকিয়ে রইলো, কিন্তু ইচ্ছে করেই অপেক্ষা করছিলাম। আপনি যে রকম ভয় পেয়েছিলেন, ক্লান্ত হয়েছিলেন, আপনাকে একটু সুস্থ না দেখে যেতে পারছিলাম না। মানে উচিত মনে হচ্ছিলো না। হাতের ঘড়িতে চোখ বুলোলো, কী আশ্চর্য, দেখতে দেখতে পঁয়তিরিশ মিনিট কেটে গেছে! না, এবার আমি যেতে পারি। আপনি নিশ্চয়ই ভালো আছেন। কোন তলায় থাকেন?

সেজন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না।

না, না, ভাবনা কী? হয়তো গায়ে একটু ব্যথা হতে পারে, দুটো বাফারিন খেয়ে নেবেন তা হলেই হবে। পাইপটা ধরালো সে, শুধু যে ঝড়ের হাতেই লাঞ্ছিত হয়েছেন তা তো নয়—পাইপের আগুনে মুখটা উত্তপ্ত দেখালো, আমিও কিছু কষ্ট দিয়েছি বইকি! কী করবো বলুন, যথেষ্ট জোরে জড়িয়ে রাখা সত্ত্বেও তো দুবার পড়ে যাচ্ছিলেন। আর আমাদের হাত কি হাত? লোহা। আচ্ছা—বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে সে সেই লোহার হাতটা বাড়িয়ে দিল। মারিয়ার সাদা ছোট্ট নবীন হাতটা ওর মস্ত কালো থাবার মধ্যে একেবারে এইটুকু হয়ে গেল।

চমকে উঠলো মারিয়া। তার বুকের ভিতরে এমন তপ্ত বস্তের স্রোত গড়িয়ে যাচ্ছে কেন? কেন এমন করে কেঁপে কেঁপে উঠছে?

বড়ো বড়ো পা ফেলে, ভেজা কাপড়ে, ভেজা মাথায়, ভেজা জুতোর ছাপ রেখে রেখে নিস্পৃহ ভঙ্গীতে বেরিয়ে গেল ছেলেটি। দরজাটা একটু ফাঁক হতেই দুর্দান্ত হাওয়ার চিৎকার রাক্ষসীর নিঃশ্বাসের মতো তীরবেগে ঢুকে এলো ভিতরে। বোঝা গেল তখনো কী তাণ্ডব চলছে বাইরে।

মারিয়া অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর আস্তে আস্তে উঠে এলো আঠারো তলায়। কাকা কাকিমা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ডুপ্লিকেট চাবি ঘুরিয়ে নিজের ঘরে এলো সে। ঝকঝকে তকতকে করে গুছিয়ে রেখেছেন কাকিমা। ড্রেসিং-টেবিলের আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে রইলো খানিকক্ষণ। তারপর ভেজা কাপড়-জামা ছেড়ে ঢুকিয়ে রাখলো ক্লসেটে, রাত-কাপড় পরে নিয়ে দাঁত মেজে এলো বাথরুমে গিয়ে, মাথাটা আঁচড়ালো ভালো করে, মুখে ক্রীম মেখে আলো নিবিয়ে বিছানায় গা দিল। সেই অন্ধকার বিছানার নির্জন স্পর্শে আবার তার বুকের ভিতরে গড়িয়ে এলো সেই তপ্ত রক্তের স্রোত, আবার থেকে থেকে কেঁপে উঠতে লাগলো সমস্ত অস্তিত্ব। কী হলো তার, কী হলো? দাঁতে দাঁত চেপে মারিয়া পরিষ্কার অনুভব করলো, তার দেহমনে স্বাদ জাগিয়েছে এই প্রথম পুরুষ! এই অমনোযোগী, উদ্ধত নিগ্রো ছেলেটি। ছি ছি। গলা ব্যথা করে কান্না এলো তার। সে রুষ্ট হলো, ক্ষুব্ধ হলো। বিড়ম্বিত হলো। তার ইচ্ছে করলো মাথা পেতে কোনো ভয়ঙ্কর একটা শাস্তি নিতে। এতকালের সঞ্চিত লালিত বিদ্বেষটাকে প্রাণপণে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করে করে হয়রান হয়ে গেল। একসময় একটা গভীর উদ্বেগ থমথমিয়ে উঠলো হৃদয়ে, নারীর গভীর মমতায় টনটন করে উঠলো ভিতরটা। বালিশে মুখ ঘষে ঘষে মনে মনে বললো, হে ঈশ্বর! এই ঝড়ে জলে ওর যেন কোনো বিপদ-আপদ না হয়। যেন সে ভালোমতো বাড়ি গিয়ে পৌঁছোয়। আর—আর—আর আমি যেন আবার তাকে দেখতে পাই।

চোখের জলে ভিজে গেল বালিশ।

খণ্ড কাব্য

আমার চোদ্দ বছরের বিবাহিত জীবনে আমি কি করুণাকে কোনোদিন অবহেলা করেছি? ছেলেমেয়েদের সুখদুঃখ সম্বন্ধে কোনোদিনও কি নিশ্চেতন ছিলাম? কিন্তু তবু—তবু কেন সংসার আমাকে শান্তি দিলো না, কেন সমস্তটা জীবন একটা দুর্নিবার তৃষ্ণা নিয়ে জীবনের মধ্যাহ্নে এসে এতো বড়ো একটা দুঃখের সৃষ্টি করলাম—এতো বড়ো একটা অন্যায়—এতো বড়ো একটা অপরাধের বোঝা মাথায় তুলে নিলাম। আমি কি চেষ্টা করিনি নিজেকে ছাড়িয়ে আনতে, করুণার প্রতি যাতে কোনোরকম অকর্তব্য না হয়, তার জন্য কি নিজের সমস্ত সুখদুঃখের বিরুদ্ধেও আমি লড়াই করিনি? তাছাড়া করুণাকে কি আমি ভালোবাসি না? এই চোদ্দ বছরের সাহচর্য কি আমার মনে একটা গভীর মমতার আসনও পেতে রাখেনি? কিন্তু তবু—

আজ আবার এতোদিন পরে আমি তাঁকে দেখলাম। দেখলাম তিনি তাঁর সেই চিরপরিচিত মধুর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন দোবাঙ্গির কোনো-এক স্টপে, উস্কোখুস্কো চুল—অযত্নে পরিপাটি একখানা রঙিন শাড়ির আবরণ, রোগা ছিপ্‌ছিপে লীলায়িত শরীর, আর সেই প্রখর ব্যক্তিত্বশালী তীক্ষ্ণ আর স্নেহ-মেশা উজ্জ্বল দুটি চোখ। ভাবিনি কথা বলবো কিন্তু আমার অচেতন আমাকে টেনেছিলো—আমি মূর্ছিতের মতো তাঁর কাছে গিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়ালাম। মাথার কাপড়টা খসে গিয়েছিল, অভ্যস্ত হাতে সেটা তিনি মাথার উপর টেনে দিলেন—মনে হলো মুহূর্তের জন্য তাঁর মুখে একটা নরম লাল আভা ছড়িয়ে পড়লো—ঈষৎ সলজ্জ মুখে মৃদু গলায় বললেন, কেমন আছেন?

ঠিক দুবছর পরে এই আমাদের আবার দেখা। আমার গলায় কথা আসছিলো না—অফিসফেরতা অবিন্যস্ত চেহারা সম্বন্ধে একটু সচেতন হয়ে নড়ে-চড়ে দাঁড়ালাম। জবাব না-দিয়ে একটু সময়ের জন্য তাঁর মুখের উপর আমার চোখ রাখলাম। চলিত অর্থে করুণা কি ওর চেয়ে অনেক সুন্দর নয়? চিরকাল শুনেছি সৌন্দর্যই পুরুষের মনকে বিচলিত করে—সৌন্দর্যের তৃষ্ণাই পুরুষের চিরন্তন নেশা—কথাটার অসারতা সম্বন্ধে মনে-মনে নিঃসংশয় হলাম। অবাধ্য চোখ সে-মুখ থেকে সরতে চাইছিলো না—শাসন দিয়ে তাকে নতদৃষ্টি করলাম। রুমালে মুখ মুছে অতিরিক্ত সহজ হয়ে বললাম, কী ভাগ্য, কতকাল পরে আপনার দেখা পেলাম। সেন কোথায়? কেমন আছেন?

না, ওঁর শরীরটা ভালো নেই। আল্‌সারে কষ্ট পাচ্ছেন।

ও!

একটা ইনজেকসন কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না—খুঁজে-খুঁজে বেড়াচ্ছি।

আমি কি কোনো কাজে লাগতে পারি?

না, না—আর আপনাকে আমি কত কষ্ট দেবো?

কথাটা তিনি কী-ভাবে বললেন জানি না, আমি মনে-মনে কষ্টের অন্য অর্থ করলাম। নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, কেউ কাউকে কষ্ট দেয় না—আমরা নিজেরাই নিজেদের দুঃখ রচনা করি।

উপলক্ষ নিশ্চয়ই একটা থাকে?

তা থাকে।

তা হলে আমি তো সেই অপরাধে অপরাধী।

আমার জীবনের সেটাই তো সবচেয়ে মহৎ অংশ, অনুরাধা দেবী।

চকিতে তিনি আমার মুখের দিকে তাকালেন—বাস এলো। দ্রুত পায়ে তিনি উঠে যেতে-যেতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আসুন।

ভিড়ে ভারাক্রান্ত বাস—তাছাড়া আমার ট্রামের পাশ—কিন্তু তিনি আমাকে ডেকেছেন—সেখানে কি দ্বিধার প্রশ্ন ওঠে। লেডিস সীটটি খালি করে দুজন হতভাগ্য পুরুষ বিরস বদনে উঠে দাঁড়ালেন—আমি গিয়ে তাঁর পাশে বসলাম। তারপর সমস্তটা পথ আমি যে তাঁর পাশে বসেছি এ-কথাটা আমি এক নিমেষের জন্যও ভুলতে পারলাম না। বুকের মধ্যে অসহ্য বিদ্যুৎস্পর্শ আমাকে নিঃসাড় করে রাখলো—তাঁর মনের কথা জানি না—তিনি বাইরে মুখ ফিরিয়ে থাকলেন। আমার বাড়ির রাস্তা পেরিয়ে গেলো—আমি নামলাম না—মনে-মনে ভাবলাম এই চলাই কেন আমার শেষ চলা হয় না, ইনি যখন উঠে যাবেন আমার পাশ থেকে, তার পরেও কেন আমি সেই সঙ্গেই লুপ্ত হয়ে যাবো না এই দুঃখ আর ব্যর্থতায় ভরা পার্থিব সংসার থেকে।

এক সময় স্মিতহাস্যে তিনি বিদায় নিলেন। আমি দুই তৃষিত চোখ মেলে তাকিয়ে রইলাম তাঁর দিকে—কোথায় গেলেন তিনি? কত দূরে তাঁর বাড়ি? কোন রাস্তা? কত নম্বর? কিছুই আমার জানা হলো না। আমি কোথায় যাবো তাও তিনি জানলেন না—এই বিরাট শহরে আবার কবে আমি দৈবের দয়ায় তাঁর দেখা পাবো, কে বলে দেবে সে-কথা? তাঁর পাশে যতক্ষণ বসে ছিলাম, বুকের কম্পনের সঙ্গে-সঙ্গে এ-ইচ্ছেটা আমাকে কতো বার পীড়া দিয়েছে—কিন্তু আমি কিছুতেই জানতে চাইনি তাঁর ঠিকানা কী। আমি জানি তাহলে আবার আমার অজান্তেই প্রত্যহ সেই ঠিকানায় গিয়ে হাজির হবো—দিনান্তে তাঁকে দেখবার লোভ আমি কিছুতেই সামলাতে পারবো না।

একুশ বছর বয়সে বিয়ে করেছি। একটু উচ্ছৃঙ্খল ছিলাম—কাব্যে বর্ণিত কবির মতো আমার স্বভাব। বন্ধুদের সঙ্গে সময়ে অসময়ে আড্ডা দিয়েছি,

কখনো নিরালা নির্জনে বসে একা-একাই সমস্ত রাত কাটিয়েছি—মনে হলে সমস্ত দিন বন্ধ ঘরে কবিতার বই বুকে নিয়েও দিন কেটেছে। ছাত্র হিসেবে তুখোড় ছিলাম—কিন্তু অনিচ্ছার জোরে পরীক্ষার ফল কিছুতেই ভালো করিনি। শুনেছি আমি জিনিয়স। হতে পারে। এক সময়ে বাঁ হাত দিয়েও যা লিখেছি তাই নিয়েই তো ছাত্রমহল মেতে উঠেছে। আমার আকার-প্রকার নকল করবার লোকেরও অভাব ছিলো না। আমি মানুষটা উদ্দাম—সলজ্জ-সুকণ্ঠ হওয়াকে আমি কাপুরুষতা মনে করেছি। অল্প বয়সে মা মারা যান, বাবা ছিলেন স্নেহশীল—ইচ্ছাতে বাধা না-পেয়ে-পেয়ে উদ্দামতা যখন চরমে ঠেকলো তখুনি বাবা বিয়ে দিলেন। কিছু যে অনিচ্ছা ছিলো তাও না—কোনো স্বপ্নও ছিলো না। শুনলাম বৌ সুন্দরী। কৌতূহল বোধ করলাম না। সুন্দর মেয়ের প্রতি আমার লোভ ছিলো না- আসলে কোনো মেয়ের প্রতিই আমার লোভ ছিলো না। মেয়েরা আমার কাছে খেলার মতো। ইচ্ছে করলেই তাদের জয় করতে পারি—সে-জয়ে কোনো কৃতিত্ব ছিলো না-বলে তার প্রতি আকর্ষণ আমার শিথিল ছিলো।

বিয়ের প্রথম রাত্রে প্রদীপের স্বল্পালোকে আমি যখন করুণাকে দেখেছিলাম, ভালো লেগেছিলো। সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে ছিলাম তার দিকে, কিন্তু স্পর্শ করবার সঙ্গে-সঙ্গেই আমার সমস্ত উৎসাহ স্তিমিত হয়ে এলো—আমি তখুনি জেনেছিলাম এ আমার চাওয়ার পাওয়া নয়—কী চাই তা জানি না, কিন্তু আমি যে পেলাম না তা বুঝেছিলাম। একটি মেয়ের শরীরের স্বাদ নিতান্ত জৈব কারণেই আমাকে আকর্ষণ করলো—অপূর্ব অনির্দেশ্য কোনো ঐশ্বরিক আনন্দ আমি সেখানে আবিষ্কার করতে পারলাম না। তারপরে আমি যখনই করুণাকে আদর করেছি, ওর লাল রংয়ের পাৎলা ঠোঁটে চুমু খেয়েছি, নরম সাদা সুঠাম শরীরের আলিঙ্গনে নিজেকে নিষ্পেষিত করেছি, একটা দুর্নিবার অভাববোধ তখনি আমাকে সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। কী যেন নেই ওর মধ্যে। ফলে বৌয়ের প্রতি আমার অমনোযোগ স্বজনদের চক্ষুশূল হলো। বাবা বললেন, এমন বারমুখো ছেলেকে নাকি কোনো মেয়েই ঘরে বাঁধতে পারে না। তা নইলে এমন লক্ষ্মী—

আমি জানি ও ভালো মেয়ে। শান্ত, বাধ্য, নম্র—আমার প্রতি ওর অখণ্ড মনোযোগ। ও জানে আমি ওর স্বামী—ইহকাল পরকালের পরম দেবতা। আমি এ-ও জানি বিপদের দিনে করুণার চাইতে বড়ো বন্ধু আমার কেউ নেই—আর সেইজন্য আমিও ওকে দয়া করি, মমতা করি, স্নেহ করি, কিন্তু আকর্ষণ বোধ করি না। আমার অশান্ত আত্মার সহচরী ও নয়—ও হতে পারে না, ওর মধ্যে আমাকে আকর্ষণ করবার মতো তিলতম শক্তিও নেই। কিন্তু করুণা অসুখী হলো না। বরং ওর মনে হয়েছিলো স্বামীভাগ্যে ও কোনো-কোনো মেয়ের ঈর্ষাভাজনই হতে পারে। স্বামী সম্বন্ধে কয়েকটি নীতি ওর জানা ছিলো। দুশ্চরিত্র হবে না, মদ খাবে না, স্ত্রীকে অকারণে গালিগালাজ করবে না—কিনে-কেটে এনে দেবে, সিনেমা-থিয়েটারে নিয়ে যাবে—বলাই বাহুল্য, ইচ্ছায় না হোক অনিচ্ছায়ও আমি ওর

প্রতি এই কর্তব্যগুলো পালন করতাম। আমি জানি ওকে যে আমার মনটা দিতে পারলাম না সে-জন্য ওর দুঃখবোধ নেই, কিন্তু আমার আছে—আমি তাই এ-ভাবেই ওকে সুখী করবার চেষ্টা করলাম।

পুরুষমানুষ স্ত্রীলোকের আঁচলধরা না-হওয়াই ভালো। এ উক্তি আমার স্ত্রীর মুখে প্রায়ই শুনেছি। ননদিনীদের সঙ্গে নিন্দাচর্চার আসরে ও প্রায়ই বলতো, পুরুষমানুষ যতক্ষণ বাইরে থাকে ততক্ষণই নিরিবিলি। কোনো-একদিন অভিমানভরে বলেছিলাম, আমি যতো দূরে থাকি ততই তাহলে ভালো?

স্ত্রী বিগলিত হয়ে বললো, না গো না—স্বামীসঙ্গের মতো পুণ্য আছে না কি?

পুণ্য! মনটা নিমেষে বিষ হয়ে গেলো। আমি কি ওর পুণ্যের কাণ্ডারী হয়েই থাকতে চাই? আমার মুখের পরিবর্তনে ঘাবড়ে গিয়ে বললো, রাগ করলে?

না।

তবে মুখ অমন করলে কেন?

এমনি।

না, এমনি না, আমি জানি আমাকে তোমার একটুও পছন্দ হয়নি। আমি যা বলি তা-ই কথা শেষ না-করে ও চোখে আঁচল দিলো। বিরক্তিতে আমার সমস্ত চিত্ত বিমুখ হয়ে উঠলো।

ঘন-ঘন ছেলেপুলে হতে লাগলো আমাদের। বছর-বছর সন্তানধারণের চাপে, আর পালনের চাপে আমার সঙ্গে সম্পর্কটা করুণা আরো সুদূর করে আনলো। ক্রমে রাত্রিবেলা একসঙ্গে শোওয়া ছাড়া অন্য সহযোগিতা প্রায় মুছেই গেলো আমাদের জীবন থেকে। মনে করেছিলাম সাহিত্যিক হয়ে জন্মেছি বিধাতার প্রচণ্ড আশীর্বাদের অধিকারী হয়েছি, অতএব আমার জীবন অন্য সকলের চাইতে স্বতন্ত্র। আমি আলাদা—আমি অনন্যসাধারণ—আমি কি মিশে যেতে পারি সংসারের ভিড়ে? সহস্র সঙ্গের মধ্যেও আমি একা। কিন্তু কার্যকালে সবই উল্টে গেলো। বছরে চারটে গল্প লিখে, সময়-সুযোগ মতো বসে-বসে পাঁচ মাস ধরে একখানা উপন্যাস রচনা করে ছেলেদের দুধ জোগানো সম্ভব হলো না। বরং লিখে-লিখে যে-কাগজ নষ্ট করবো তা বিক্রি করলে তিন দিনের বাজার আসতে পারে। শান্তস্বভাব করুণা মাতৃত্বের ফলে খিটখিটে হয়ে উঠলো। প্রতিভা কথাটা তার বুদ্ধির অগম্য—মানুষকে সে ধন দিয়ে জন দিয়ে আর প্রচলিত অর্থে বিদ্যা দিয়ে বিচার করে। আমার মধ্যে এই তিনটিরই অভাব আস্তে-আস্তে তাকে পীড়া দিতে লাগলো। আমি যখন উদাস দৃষ্টি মেলে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি, কোনো বই পড়তে-পড়তে আমার মন যখন একটা অপার্থিব আনন্দে আর দুঃখে অভিভূত হয়ে ওঠে মনে-মনে যখন আমি মহৎ একটা সৃষ্টির প্রেরণায় নিঝুম হয়ে বসে থাকি, ও তখন ছেলে ঘুম পাড়াতে-পাড়াতে আমাকে বকে—অলস, নিষ্কর্মা, বিদ্যাহীন। হঠাৎ সচকিত হয়ে

মুখের দিকে তাকাই—মৃত্যুর মতো একটা হিমশীতল স্পর্শ যেন তার মুখ থেকে বেরিয়ে এসে আমার বুক বেয়ে-বেয়ে কোথায় নেমে যায়। গলা বন্ধ হয়ে আসে। কিছু বলি না, চুপ করে উঠে দাঁড়াই, জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে যাই। যখন ফিরি তখন করুণার শ্রান্ত শরীর ঘুমের আবেশে গভীর।

হয়তো আমাদের বছর-বছর ছেলেপুলে হতো না, যদি করুণার সঙ্গে সম্পর্কটায় আমার মনেরও কিছু যোগাযোগ থাকতো। ওর সঙ্গে কথাবার্তার পরিধি আমার এতই সংক্ষিপ্ত ছিলো যে বন্ধুতার কোনো অবকাশই আমি সেখানে খুঁজে পাইনি। চেষ্টা করেছি, ফল হয়নি। আমাকেও স্বামী হিসেবেই দেখতো, মানুষ হিসেবে নয়। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর কর্তব্যপালনে সে বিমুখ ছিলো না বলেই ছেলেপুলের সংখ্যা একটু বেড়ে গিয়েছিলো। ও যদি আমার সঙ্গে একটু ঝগড়াও করতো, নিজের অস্তিত্বটা জানাবার জন্য যদি তিলপরিমাণ পরিশ্রম করতো, তবু যেন আমি কিছু খুঁজে পেতাম ওর কাছে, কিন্তু সে-দিকটা ওর বোবা। দোষ ওর নয়, আমারই। আমিই সকলের চাইতে অদ্ভুত, ও তো আর সকলের মতোই। হয়তো একজন সাধারণ স্বামীর পক্ষে ওর মতো স্ত্রী পাওয়া নিতান্তই ভাগ্যের কথা হতো - আমার সঙ্গে যুক্ত হয়েই এমন হলো। আসলে বিয়ে করাই আমার উচিত ছিলো না। অপেক্ষা করা উচিত ছিলো সেই মেয়ের জন্য যার পদক্ষেপে আমার সমস্ত জীবন ফলে-ফুলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতো -যে সত্যিই আমাকে ফোটাতে পারতো। মা-পাখি যেমন তা দিয়ে তার সন্তানকে ফোটায়, স্বামীকে বিকশিত করতে স্ত্রীরও ঠিক ততোখানি উত্তাপেরই প্রয়োজন। এ দুটোই কি সমান পর্যায়ে পড়ে না? জীবনের সমস্ত আনন্দ-উপভোগেই কি একজন মেয়ের সংস্পর্শ অপরিহার্য নয়? ভালোবাসাই আমাদের মানুষ করে তার অভাবে জীবন শুষ্ক, ব্যর্থ। আমি সাংসারিক জীবনে অতি হতভাগ্য অতি ব্যর্থ। আমার এই ব্যর্থতা সম্বন্ধে আমি সততই সচেতন ছিলাম। আমার কিছুই ভালো লাগতো না।

প্রথম ছেলেটির জন্ম আমাকে অনেকখানি শান্তি দিয়েছিলো, কিন্তু দু'বছর বয়সে তার মৃত্যু হলো। তখন আমার দ্বিতীয় সন্তান দশ মাসের। পাগলের মতো মেয়েটিকে আমি ভালোবাসলাম - সেই সময়েই আমার জীবনে যেন একটু ভারসাম্য এলো। বাবার শত দাঁত-কড়মড়ানিতেও যা হয়নি-- করুণার হাজার কান্নাতেও যা হয়নি—মেয়ের সুখসুবিধা বিধানের জন্য আমি তা-ই করলাম। সাধারণভাবে বি. এ. পাশ করেছি, কাজ পাওয়া সহজ ছিলো না--আমি যে অসাধারণ—আমি যে প্রতিভাবান--ঈশ্বর যে আমাকে অন্য সকলের চাইতে আলাদা করে সৃষ্টি করেছেন, সে-কথা কেউ বুঝলো না—সকাল-সন্ধ্যা ঘর্মাক্ত হয়ে আর পাঁচজন মানুষের মতোই দু'মাস হাঁটা-হাঁটি করে অনেক দরজা থেকে অনেক অপমান সঞ্চয় করে অবশেষে পঁচানব্বুই টাকার একটি চাকরি জোগাড় করে নিলাম। করুণার মুখে হাসি ধরে না, খানিকক্ষণের জন্য সে তার মৃত পুত্রকেও ভুলে গেলো। স্বামীর সুমতিতে

দু'হাত জোড় করে অদৃশ্য দেবতাকে প্রণাম করলো সে।

সকাল নটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত আপিসের সেই আলো-জ্বালা বন্ধ ঘর আমার জীবনে বাকি রসটুকুও আখের কলের মতো নিংড়ে নিতে লাগলো—হাজারো কথার হাজার দ্যুতি সমস্ত আমি বিকিয়ে দিলাম মোটা-মোটা খাতার লম্বা-লম্বা হিসাবের স্তূপে। সে-কথা কেউ জানলো না—কেউ জিজ্ঞেস করলো না সে-কথা। বরং কোনো-কোনো সকালের কোনো অপরূপ আকাশ যদি বা কখনো আমাকে হাতছানি দিয়েছে, বিশ্বসংসার ভুলে গিয়ে অনির্দেশ্য অব্যক্ত একটা সুখের অনুভূতিময় চিত্ত নিয়ে যখন আমি একটি প্যাডের পাতাব উপর কলম ছুঁইয়েছি, তখনি করুণা হাঁ-হাঁ করে ছুটে এসে কলম কেড়ে নিয়েছে—এই করে-করে চাকরিটি খোয়াবে তুমি। বেলা কটা জানো? নরম ফুলের আস্তরণে ঢাকা সুগন্ধে ভরা কুঞ্জ থেকে যেন হঠাৎ লক্ষ লক্ষ সাপ এসে আমাকে পেঁচিয়ে ধরলো। সমস্ত রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেলো তাদেব আলিঙ্গনে—ছাড়াবার উপায় নেই। আমাব যন্ত্রণা হয়েছে, অসহ্য যন্ত্রণা—ছেলেব মৃত্যুতেও আমার এতো কষ্ট হয়নি। মনে-মনে ভেবে দেখেছি, এ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কষ্টেব চাইতে বড়ো দুঃখ পৃথিবীতে আমার আর কিছুই ছিলো না তখন।

তার পরে আমার আরো দুটি সন্তান হলো। চাকরিতে অভ্যস্ত হলাম ন'মাসে ছ'মাসে একটি গল্প লিখতেও আলস্য বোধ করলাম। তারপব জীবনের সমস্ত শুভমুহূর্তকে নিয়তির পায়ে বিসর্জন দিয়ে যখন আর্থিক উন্নতির বেশ একটা বড়ো রকমের চূড়োয় এসে নিশ্বাস নিলাম, তখনি আমার সমস্ত জীবনের সেই আকাঙ্ক্ষিত মানুষটি এসে দাঁড়ালেন আমাব চোখের সামনে। সেনের সঙ্গে আমার অনেক কালের পরিচয়। চমৎকার লোক, তাঁর মধ্যে আমি আমারই পরিশোধিত সংস্করণ দেখেছিলাম। তিনি ছিলেন ভদ্র, বিনয়ী অথচ তেজস্বী পুরুষ—আব আমি ছিলাম দুর্বিনীত দাম্ভিক কঠোর। আমি জানি তাঁব মতো সার্থক জীবন পেলে আমিও তাঁর মতোই নম্র হয়ে উঠতাম। পৃথিবীকে আমিও তাঁর মতোই ভালোবাসতাম। আমার চোখেও প্রতিভার দীপ্তির সঙ্গে-সঙ্গে নামতো প্রশান্তিব ছায়া—শান্তি আর স্নেহেব সমাবেশে আমার দৃষ্টিও গভীরতায অতল হতো।

কারো বাড়ি যাওয়া, কারো সঙ্গে সংস্রব রাখা আমার জীবন থেকে মুছে গিয়েছিলো, কোনো এক সভায় আমরা দুজনে অনেক কাল পরে আবাব একত্রিত হলাম। সেনকে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। মৃদু-মধুর কথা আর সকুণ্ঠ সলজ্জ ভঙ্গিতে তাঁকে আমার এতো ভালো লাগলো বলতে পারি না। সভার শেষে তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে আসবার জন্য অনুরোধ জানালেন, আমি বিনা দ্বিধায় আমার স্বভাববিরুদ্ধ কাজটি নিঃশব্দে সম্পন্ন করলাম। খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে তিনি আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। অত্যন্ত আবেগভরে আমার অতীত কীর্তির সুখ্যাতিতে মগ্ন হয়ে উঠলেন। দুজনের

যখানে একই পেশা, সেখানে রেষারেষির ভাবই সর্বত্র দেখেছি এবং আমি নজেও যে এই ঈর্ষা থেকে মুক্ত ছিলাম তা বলতে পারি না, কিন্তু সেনের ই ঈর্ষা থেকে অকুণ্ঠ মুক্তি আমাকে অবাক করলো। একটু পরেই যিনি রে ঢুকলেন তাঁকে দেখেই বুঝলাম ইনিই সেনের স্ত্রী। সেন আগ্রহভরে ললেন, এসো, তোমার প্রিয় লেখকের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দি।

আমি যুক্তকরে তাঁকে অভিবাদন জানালাম। আলাপের প্রথম অধ্যায় শষ করে তিনি বসলেন। রোগা ছিপছিপে মহিলা—সাদাসিধে শাড়ি আর াউসে আবৃত শরীর—পায়ে লাল কারপেটের চটি। কিছুই উল্লেখযোগ্য য়। কিন্তু তবুও তিনি যে এসেছেন সে-অস্তিত্বে ঘরটিও যেন সচেতন হয়ে াইলো। ভদ্রমহিলাদের দেখলেই আঘাত করে উপেক্ষা করে কথা বলা আমাব স্বভাব। কিন্তু সেদিন আমি অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে হাতে হাত ঘষে ঈষৎ হাস্য ছাড়া আর কিছুই করিনি। অনুরাধা দেবী অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে ু একটি কথা বললেন, বলবার জন্যেই বললেন না, জানবার জন্যেই বললেন। অত্যন্ত ঔৎসুক্য নিয়েই তিনি আমার সাহিত্যিক জীবনের তথ্য জানতে াইলেন। তাঁর আন্তরিকতার মূল্য আমি অস্বীকার করতে পারলাম না।

যখন বাড়ি ফিরলাম ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর যুক্ত জীবনের একটা পরম শান্তির াওয়া যে আমাকেও স্পর্শ করেছে সেটা বেশ স্পষ্ট করেই বুঝতে পেরেছিলাম। ওঁরা যে সুখী, এ-কথাটা আমার বুকের মধ্যেও যেন একটা সুখেব আবেগ আনলো। চুপ করে শুয়ে-শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত ওঁদের কথাই ভাবলাম। সেনেব সুন্দর জীবনের পিছনে যে অতোখানি শান্তি আছে তা ভেবে ভালো লাগলো। যে-অভাববোধে নিজে প্রতিনিয়ত দগ্ধ হচ্ছি তা থেকে একজনকে মুক্ত দেখে আনন্দ হলো। মনে-মনে বললাম, ঈশ্বব, ওদের সুখ অক্ষুণ্ণ করো।

শনিবার আপিস তাড়াতাড়ি ছুটি হলো, এবং কোনো-এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে আবার সেনের বাড়িতে টেনে আনলো। দুজনের আন্তরিক অভ্যর্থনায় আমি অভিনন্দিত হলাম। সময়ের উপর এঁরা সীমা টানেননি, বন্ধুতাব উত্তাপে আমাকে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত অভিভূত করে রাখলেন। সহসা ঘড়িব দিকে তাকিয়ে আমিই উঠে দাঁড়ালাম। দরজা পর্যন্ত এসে ওঁরা আমাকে বিদায় দিলেন, আমি সেই অবকাশে অনুরাধা দেবীকে ভালো করে দেখলাম। তাঁর মাঝারি আকারের দুটি চোখের তারার ঔজ্জ্বল্য আমার অন্তরকে বিদ্ধ করলো। আমি জানলাম, এই সেই মেয়ে, সমস্ত জীবন ধরে আমি যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

অত্যন্ত নির্দোষ ভালোবাসা! যিনি আমার আত্মার প্রিয় অধীশ্বরী তাঁকে য আমি আমার দৈহিক জীবনে পেলাম না, এ নিয়ে আমার মনে কখনো কোনো অভিযোগ আসেনি, কিন্তু তাঁকে আমি না-দেখেও থাকতে পারতাম না। তিনি যে আমার—এ-কথাটা যেন হৃদয়ের গভীরে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা হয়ে গেলো।

আমার কত ব্যর্থ সন্ধ্যা আবার মধুরতায় ভরে উঠলো ওঁদের সংস্পর্শে।

আমি আবার মানুষের মতো বাঁচতে আরম্ভ করলাম। চাকরি আর নীরস বিবাহিত জীবনের বাইরে আমার জন্য একটি স্বর্গ রচনা করলেন অনুরাধা দেবী। তাঁর কথা, তাঁর ব্যবহার, তাঁর ব্যক্তিত্ব সমস্তটা মিলিয়েই তিনি, তাঁর সমস্ত-কিছুই আমার জীবনের পরম কেন্দ্র—আমার জীবনের নতুন অধ্যায়। যতক্ষণ তাঁদের কাছে থাকতাম, সেনের সুখী জীবনের আভা আমাকে উদ্ভাসিত করতো, অনুরাধা দেবীর পরিচ্ছন্ন বুদ্ধি আমাকে সম্মোহিত করতো। সময় যে কেমন করে গড়াতো আমি জানি না—নিতান্তই না-উঠলে নয় এমন একটি সময়ে নিজেকে জোর করে আমি বিচ্ছিন্ন করতাম। বাড়ি ফিরে ঢাকা ভাত খেয়ে শুতে যেতাম, করুণা ঘুমের মধ্যেই আড়মোড়া ভেঙে বলতো, এলে? রোজ-রোজ এত রাত করে ফেরো কেন? আমি জানি, এ-কথা সে জবাবের প্রত্যাশায় বলেনি, পুরুষমানুষ সন্ধেবেলা তাস-পাশা খেলতে বেরোবেই, তাই নিয়ে অকারণ অভিমান তার ছিলো না। আমার সেটাও একটা বাঁচোয়া ছিলো। শুতে-শুতে রাত বারোটার বেশি হতো—শুয়েও আর ঘুম আসতো না। আমার চোখকে অনুরাধা দেবী তাঁর রোগা ছিপছিপে শরীরটি দিয়ে ভরে রাখতেন। আমি মনে-মনে তাঁর স্পর্শ অনুভব করতাম—তাঁর সান্নিধ্য-স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়ে থাকতাম, তারপর হঠাৎ আমি যেন আর-একটা মানুষ হয়ে উঠতাম- আমরা দু'জনে যেন একই আত্মা, একই দেহ। এতক্ষণে সেন যে অনুরাধা দেবীকে নিয়ে এক শয্যায় শুয়েছেন, অনুরাধা দেবী যে তাঁর প্রাণের প্রাচুর্য নিয়ে এতক্ষণে তাঁকে ভরে তুলেছেন, নিরালা নিভৃত হয়ে ওঁরা পরস্পর যে পরস্পরের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছেন—এ-কথা কল্পনা করতে-করতে হৃদয়ে ঘন-ঘন কম্পন হতো বুকের মধ্যে কে যেন আমাকে বলে দিতো, সে-সুখ আমারই।

এ-সময়টায় সত্যি আমি সুখী হয়েছিলাম। খুব সুখী! সমস্তটা দিন গেলেই যে সন্ধ্যা, এ-কথাটা আমাকে নতুন জীবন দিলো। নতুন প্রাণের অঙ্কুরে আমি আবার সতেজ হয়ে উঠলাম। আপিসের হিসেবের খাতার স্তূপেই আমি আবার আমার স্বপ্ন খুঁজে পেলাম—আমার বহুদিনের বিবর্ণ খাতার পাতা আবার কালো কালির অক্ষরে ভরে উঠলো অনুরাধা দেবীর সাগ্রহ অভ্যর্থনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো আমার জীবন।

শুধু চোখে দেখা, আর কাছে থাকা, এর বাইরে আমার ইচ্ছা যেতো না, আমার দৃষ্টি কখনো বিহ্বল হতো কিনা জানি না—কিন্তু কিছুদিন পরে লক্ষ্য করলাম অনুরাধা দেবী যেন হঠাৎ কেমন বিষণ্ণ হয়ে উঠছেন। আমি আর সেন যুক্ত হয়ে তাঁকে ঠাট্টা করতাম, তাঁর আনন্দের উপাদান হবার চেষ্টা করতাম, কিন্তু তাঁর চোখে বেদনার ছায়া দেখা দিলো। কোনো-এক স্তব্ধ দুপুরে কাজ করতে-করতে হঠাৎ সেই চোখ আমাকে ডাকলো—আপিস করা আর আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। অদম্য ইচ্ছার বেগে আমি বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। অনেক ভাবলাম, শাসনের আঘাতে অনেক ক্ষতবিক্ষত করলাম হৃদয়কে। কিন্তু তবু এক সময় আমি সেনের সেই অপরিসর বসবার ঘরটিতে নিজেকে আবিষ্কার করে ঘর্মাক্ত হয়ে উঠলাম। বলাই বাহুল্য,

সেন বাড়ি ছিলেন না—ঘুম-ভাঙা চোখে অনুরাধা দেবী উঠে এলেন। আমাকে দেখে মৃদু হেসে বললেন, বসুন।

আমি তাকিয়ে রইলাম তাঁর দিকে—ঈষৎ রক্তাভ চোখে কিসের ছায়া? চোখে চোখ পড়তে তিনি মাথা নিচু করলেন, আমার বুকের স্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠলো। মুহূর্তকাল দু'জনেই চুপ করে ছিলাম। অনুরাধা দেবীই বললেন, ভাবছি কোথাও বাইরে যাবো।

বাইরে! কেন—আমার গলায় বিচ্ছেদের ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছিলো। তিনি পরিষ্কার গলায় বললেন, ভালোবাসার শক্তি অসীম। তার আকর্ষণ মৃত্যুর মতো অনিবার্য।

অনুরাধা দেবী—

আমি জানি, আপনি আমাকে ভালোবাসেন।

অনুরাধা—

তার দুর্নিবার টানে আমার মতো সুখী জীবনও বিপর্যস্ত হয়ে যেতে পারে—হৃদয়কে বিশ্বাস নেই।

আপনি বলছেন কী?

আপনিও কি তা-ই বলেন না?

মাথা নিচু করলাম। একটু থেমে অনুরাধা দেবী বললেন, আমার স্বামীর ভালোবাসা অতলস্পর্শী—আর আমি তাঁকে কতো ভালোবাসি তাও তাঁর অজানা নয়। তিনি ব্যথা পেলে তাঁর হাঁটবার জন্য আমি বুক পেতে দিতে পারি, তাঁকে দুঃখ দিয়ে পৃথিবীর কোনো সুখই আমি প্রার্থনা করি না। আমি স্ত্রীলোক হয়ে এমন কথাও মনে-মনে ভাবি, তিনি যে রকম নির্ভরশীল অসহায় মানুষ তাঁকে ফেলে যেন আমার মৃত্যুও না হয়, কিন্তু—

আমি আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। নিজেকে প্রচণ্ড শক্তিতে বিচ্ছিন্ন করবার জন্য পা বাড়ালাম, হঠাৎ তাঁকে স্পর্শ করবার একটা দুরন্ত স্পৃহা আমাকে পাগল করে তুললো। মুহূর্তের ভ্রান্তিতে আবার ফিরে দাঁড়ালাম, তাঁর দিকে তৃষিত চোখ থেকে ফোঁটা-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে। যুক্ত দুটি হাত মৃত্যুর মতো স্তব্ধ। আমি মানুষ, তিনি দেবী তাঁকে আমি ছোঁবো কেমন করে? বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম। আস্তে-আস্তে তিনি যুক্ত করো খুলে আমার দিকে এগিয়ে এলেন, হাত বাড়িয়ে বললেন, আমাকে স্পর্শ করে বলুন এই দেখাই শেষ দেখা হোক।

নিঃশব্দে আমি তাঁকে স্পর্শ করলাম, শিথিল পায়ে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়।

তারপর এই দু বছর পরে আবার তাঁকে দেখলাম আমি।

দুবছর কতোটুকু সময়? দুশো যুগ কাটলেও কি আমি আমার আত্মাকে ভুলে যেতে পারি? তিনিই তো আমার আত্মা! তিনি তো সততই আমার হৃদয়ে আছেন।—তবু—তবু কেন জ্বলে যায়, পুড়ে-পুড়ে ছাই হয়ে যায়, কেন এই চকিত দেখায় আবার হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। হে আমার অশান্ত আত্মা, শান্ত হও, স্তব্ধ হও। একটু—একটুখানির জন্য ভুলে যেতে দাও সব।

বিচিত্র হৃদয়

আমার বাবা ছিলো না। এই অভাববোধটা খুব ছোটো থেকেই আমাকে বারংবার আঘাত করেছে। মাকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি তাঁর বিষণ্ণ মুখ আরো বিষণ্ণ করে ধরা গলায় জবাব দিয়েছেন, তিনি স্বর্গে। স্বর্গ কোথায়, স্বর্গ কী, কতদূরে—অনেকদিন ভেবেছি, কিন্তু সে-প্রশ্নের মীমাংসা হয়নি। আমার মা-র মুখশ্রী অতি সুন্দর, সমস্ত মুখখানাতে তাঁর এমন একটা মধুর বিষণ্ণতার আভা ছড়িয়ে থাকতো যে কোনো-কোনো সময় অপলকে সে মুখের দিকে তাকিয়েও আমার দেখার তৃষ্ণা মিটতো না। তিনি কালোপাড় শাড়ি পরতেন, হাতে সরু-সরু দুগাছা বালা ছিলো—গলায় প্রায়-অদৃশ্য একছড়া সোনার হার চিকচিক করতো। কী যে সুন্দর দেখাতো তাঁকে—মসৃণ শ্যামল বর্ণে একটা বর্ষার সজল আভা ছিলো—আমি ফর্সা ছিলুম, কিন্তু তবু সকলে বলতো মা-র শ্রী আমি পাইনি। অত্যন্ত শান্ত আর দৃঢ় ছিলো তাঁর স্বভাব। আমি তাঁর অতি অল্প বয়সের একমাত্র সন্তান।

মাত্র চোদ্দ বছর বয়সেই তাঁর জীবনের সমস্ত আলো নিবে গিয়েছিলো। দাদামশায় ছিলেন সনাতনপন্থী—কাজেই বারো বছর বয়সেই কন্যার বিবাহ দিয়ে খুব একটা তৃপ্তিলাভ করলেন। বিয়ের পরে প্রথম বছর মা-র প্রায় পিত্রালয়েই কেটেছিলো। দ্বিতীয় বছরের প্রারম্ভে আমার সম্ভাবনার সূত্রপাতেই আমার বাবার মৃত্যু হলো। শোকে আমার মা কতটা মুহ্যমান হয়েছিলেন আমি জানি না, কিন্তু আমার দাদামশাই এ-আঘাত সামলাতে পারলেন না, এক বছরের মধ্যে তিনিও গত হলেন। মা-র আর দিদিমার পরিচর্যায় আমি বড়ো হয়েছিলুম—কোনো পুরুষের সংশ্রব আমাদের ছিলো না। দুএকজন আত্মীয়ই যা আসা-যাওয়া করতেন—আর অসুখ করলে ডাক্তার। স্ত্রী-পুরুষ সকলের কাজ একা আমার মাকেই করতে দেখেছি। বিপদে-আপদে সুখে-দুঃখে সব সময়েই তিনি অবিচলিত। দিদিমা যত না বুড়ো হয়েছিলেন তত হয়েছিলেন রুগ্ন—আর্থিক সচ্ছলতার অভাবও ছিলো প্রচুর, কাজেই কাজকর্ম সবই প্রায় মাকে করতে হতো। সকালে উঠেই তিনি একেবারে কলের মতো নিঃশব্দে কাজ লেগে যেতেন—তারপর নির্দিষ্ট সময়ে কলেজ এবং ফিরে এসেই আবার কাজের আবর্ত। বাচ্চা একটি থাকলেই যথেষ্ট—তার ওপর আমার মা ছিলেন আমার প্রতি অত্যন্ত মনোযোগী তাঁর চোদ্দ বছরের মাতৃত্ব আমি দেখিনি, কিন্তু যে বয়সের কথা আমার মনে

আছে—তখনো আমার মা খুব বড়ো হয়ে যাননি—এখন সে-বয়সের মেয়েদের বিয়ের কথাও কেউ চিন্তা করেন না। আমার যখন ছ' বছর বয়েস মা তখন আই. এ. পাশ করলেন। ঠিক এই সময় হঠাৎ এক সকালে ঘুম ভেঙে আমি একজন ভদ্রলোককে আমাদের ঘরে দেখতে পেলুম—যাঁর চেহারা আমার মনের মধ্যে সেই মুহূর্তেই একটি গভীর দাগ কেটে দিলো।

সুন্দর লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ চেহারা, মুখের মধ্যে এমন একটি আকর্ষণ যা মানুষকে টানে—অত্যন্ত নিচু স্বরে কথা বলেন আর এমনভাবে মাঝে-মাঝে চোখ রাখেন মুখের উপর যে চোখে চোখ ফেলতে কেমন একটা অস্বস্তি হয়। দিদিমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, আমি ঘরে যেতেই আমাকে হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিলেন। আমি মিশুক ছিলুম না, বিশেষত কোনো পুরুষের সংশ্রব বর্জিত হয়ে মানুষ হবার দরুণ পুরুষ সম্বন্ধে আমার একটা অহেতুক ভয়ও ছিলো, কিন্তু তবুও আমি ঐ ভদ্রলোকের মৃদু আকর্ষণেই একটা ভয়মিশ্রিত কৌতূহল নিয়ে কাছে গিয়ে মুখের দিকে তাকালুম। ভদ্রলোক অত্যন্ত সুন্দর করে হাসলেন, তারপর পকেট থেকে লাল ফিতেয় বাঁধা এতো বড়ো এক বাক্স চকোলেট বার করে আমার হাতে দিলেন। নেবো কি নেবো না ভাবছিলুম হয়তো, এমন সময় এক কাপ চা হাতে নিয়ে আমার মা ঢুকলেন ঘরে—এই প্রথম তাঁর মাথায় কাপড় দেখলুম। কেমন একটা সলজ্জ সসংকোচ ভঙ্গিতে তিনি ভদ্রলোকের হাতে চা-টা দিয়েছিলেন সেই দৃশ্যটা আমার এখনো মনে পড়ে। দিদিমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, এই আগুন বুকে নিয়ে আমি বেঁচে আছি, বাবা। তাঁর চোখ সজল হয়ে উঠলো।

ভদ্রলোক মার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন—একটু সময়ের জন্য বোধ হয় তিনি অন্যমনস্কও হয়ে পড়েছিলেন—দিদিমার কথায় সতর্ক হলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, আমি জানতুম না আপনারা এখানে, দেশে ফিরেছি মাত্রই দশদিন—হঠাৎ পরশু আপনাদের ঠিকানা পেলুম। সুমন্ত্র আমার কতখানি ছিলো তা আপনাদের বোঝানো সম্ভব নয়। আমার বিলেত যাত্রার রাস্তাটা বলতে গেলে ওই সুগম করে দিয়েছিলো—আমি লক্ষ্য করে দেখলুম বলতে বলতে তিনি মার মুখের দিকে তাকালেন আর মার সাগ্রহ দৃষ্টি তখুনি নত হয়ে গেলো। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক—আমার একটু দরকার আছে—আজ আর বসবো না। নত হয়ে তিনি আমার দিদিমার পায়ের ধুলো নিলেন—মার দিকে তাকিয়ে বললেন, কখনো ভাবিনি আপনাকে এ-অবস্থায় দেখবো। সবই ভাগ্য। মা চুপ করে রইলেন। আমি মার কাপড়ের আঁচল ধরে দাঁড়িয়েছিলুম, আমার গালে মৃদু টোকা দিয়ে বিদায় নিলেন।

তাঁকে দেখার এই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। তারপরে তিনি আবার এলেন, আবার এলেন—আমার জামাকাপড়ের শ্রী বদলে গেলো, আমার মার মুখের বিষণ্ণতার পরিবর্তে ভরে-থাকার একটা অদ্ভুত আভা দেখা দিলো—ক্রমে ক্রমে সংসারে যেন একটা নতুন আলো অনুভব করতে লাগলুম। শেষে আস্তে আস্তে এমন হলো যে তিনিই এ-বাড়ির অভিভাবক হয়ে উঠলেন।

মাকে আর অত পরিশ্রম করতে দেখতুম না, আমার পরিচর্যার জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একজন স্ত্রীলোক এলো, বাড়িতে রাঁধবার জন্য ঠাকুর এলো—বাইরের কাজ করবার জন্য চাকর রাখা হলো। প্রথমটায় দিদিমা ও মাকে প্রায়ই এ নিয়ে নানারকম ওজর-আপত্তি আর অভিযোগ করতে শুনেছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিশ্চয়ই সেই জেদ তাঁরা বজায় রাখতে পারেননি। আমার মার আত্মমর্যাদা ছিলো অসাধারণ, কিন্তু সেই ব্যক্তিত্বময় অসাধারণ মানুষটির হৃদয়বৃত্তির কাছে নিশ্চয়ই তিনি হার মেনেছিলেন। একখানা ছোটো অস্টিন গাড়ি ছিলো ভদ্রলোকের, সকালে-বিকালে সেই গাড়িখানা নিজেই চালিয়ে তিনি আসতেন। সকালের দিকে তিনি সবশুদ্ধ পনেরো মিনিটও হয়তো থাকতেন না—কেবল একটা খোঁজখবর নেওয়া—তাঁর পায়ের শব্দ পেলেই মার মুখে একটা আলো ছড়িয়ে পড়তো—হাতের কাজ শিথিল হয়ে উঠতো, অকারণে এক কাজ থেকে আরেক কাজে নিজেকে নিবিষ্ট করবার চেষ্টা করতেন। আমি চুপিচুপি কানের কাছে মুখ এনে বলতুম, সাহেব এসেছেন, মা। প্রথম দিন তিনি স্যুট পরে এসেছিলেন আর আমার মনে গেঁথে গিয়েছিলো তিনি নিশ্চয়ই সাহেব। তারপরে দিদিমা কত বুঝিয়েছেন যে ইনি একজন খাঁটি বাঙালি—আমার বাবার বিশেষ বন্ধু—তারপরে কতবার উনি ধুতি পরে এসেছেন কিন্তু আমার মনের সেই সাহেবের ছবি কিছুতেই মুছে যায়নি। কাজ করতে করতে মা ঈষৎ মুখ তুলে বলেছেন, আসুন। তুমি পড়তে বোসো গে। এ-কথায় আমি দুঃখিত হয়ে যাই যাই করেও ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতুম। এ-ভদ্রলোকের সান্নিধ্যের কেমন একটা অদ্ভুত আকর্ষণ ছিলো আমার কাছে। এত দেখে দেখেও তাঁর কাছে আমি সহজ ছিলুম না। সেই বালিকা বয়সেও আমি বড়ো মেয়েদের লজ্জা অনুভব করতুম। একটু পরেই ভদ্রলোক নিজেই মার ঘরে আসতেন। কেমন আছেন? রোজই এক প্রশ্ন। আমি ভেবে পেতুম না এই তো কাল রাত দশটা পর্যন্ত দেখে গেছেন—আজ এটুকু সময়ের মধ্যে আবার কী হবে যে এই প্রশ্ন। মাও রোজকার মতোই মাথা নিচু করে জবাব দিতেন, ভালোই। একটু চুপচাপ কাটতো। তারপর মা চোখ তুলে তাকাতেন—আমি দেখতাম ভদ্রলোকও তাকিয়ে আছেন মার দিকে। তাঁদের দু'জনের মিলিত দৃষ্টির এমন একটা অনুভূতি আমার অপরিণত মনের মধ্যে ক্রিয়া করতো যে দু'জনকে দু'জনের দৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্য আমি অস্থির হয়ে উঠতুম। মা তক্ষুনি বুঝে ফেলতেন আমার মনের কথা। সতর্ক হয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেন। একটা নিশ্বাস বেরিয়ে আসতো তাঁর মুখ দিয়ে। ভদ্রলোক বলতেন, কী হবে? মা জবাব দিতেন না—আমার আঁচড়ানো মাথায় হাত দিয়ে ধীরে ধীরে আরো পরিপাটি করতেন। তারপরে তাঁরা মৃদুকণ্ঠে আরো দু'একটা কথা বিনিময় করতেন—সেসব কথার আমি মানে বুঝতে পারতুম না।

একদিন দিদিমা বললেন, তোমাকে বাবা আর অত কষ্ট দেবো, তুমি যা করলে—

ও-কথা বলছেন কেন? ভদ্রলোক একটু আহত স্বরে বললেন, সুমন্ত্রর

কাছে আমি অশেষভাবে ঋণী ছিলুম। ঋণ তো কখনো শোধ হয় না, কিন্তু তবু যদি তার হয়ে কিছুটাও করতে পারি, সেইটাই আমার সবচেয়ে বড়ো আনন্দ।

ও-কথা বোলো না—সে যদি তোমাকে কিছু করেই থাকে তার একশো-গুণ তুমি ফিরিয়ে দিয়েছো আমাদের। যে-সময়টায় তোমার দেখা পেয়েছিলুম -বলতে আর লজ্জা নেই যে সে সময় আমাদের সম্ভ্রম রক্ষা করাই দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিলো।

আমাকে আপনি পর ভাবেন কেন? আমার এই উপার্জনে যে আপনাদেরও একটা ন্যায্য দাবি আছে সেটা কেন ভাবতে পারেন না। আত্মীয় হলে কি কখনো এমন কথা বলতে পারতেন কি ভাবতে পারতেন?

কথাটা যে কত সত্য তা আমি বুঝি। আত্মীয়রা সর্বদাই শত্রু, অথচ তাদের কাছে ভিক্ষা চাইতেও আমাদের লজ্জা নেই, কিন্তু—

এর মধ্যে কিন্তু নেই। এবার তো আমাদের আরো দরকার বাড়ছে, হাত বাড়িয়ে আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, আমাদের বুলুমণিকে এবার স্কুলে দিতে হবে না? কী বলো, অ্যাঁ?

আমি তখন আট বছরের হয়েছি। ঘাগরা দেওয়া সুন্দর সুন্দর ফ্রক পরি—দু'পাশে লাল রিবন দিয়ে বেণী ঝুলিয়ে দি—আর সব সময় মনের মধ্যে কেমন একটা অহংকার বোধ করি। কয়েকদিন থেকে স্কুলে ভর্তি নিয়ে মার সঙ্গে কান্নাকাটি করছিলুম—এ কথায় সুখী হয়ে লজ্জায় মুখ নিচু করে থাকলুম। ভদ্রলোক বললেন, খুব ভালো স্কুলে ভর্তি করে দেবো—স্কুলের বাস আসবে ভোঁ করে—আর তুমি বেণী দুলিয়ে ছুটে গিয়ে উঠে বসবে। আমাদের তো তখন চিনবেই না।

আমি একগাল হেসে লজ্জায় তাঁরই কোলের মধ্যে মুখ লুকোলাম।

শোনো, শোনো—আমি মুখ তুললাম না। এর পরে তিনি মার ঘরে গেলেন। আমি সেখানেই চুপ করে বসে রইলুম। তাঁর বুকের কাছটায় মুখ রেখেছিলুম, তাঁর গায়ের সৌগন্ধ লেগে রইলো আমার প্রাণে।

তার কয়েকদিনের মধ্যেই আমি স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলুম। লেখাপড়ায় আমার স্বাভাবিক ঝোঁক ছিলো, স্কুলের আবহাওয়া আমার ভালো লাগলো। তাছাড়া বাড়িতে আমি নিঃসঙ্গ ছিলুম, এখানে অনেক মেয়ের বন্ধুতা, অনেক দিদিমণিদের স্নেহ আমার জীবনে যেন একটা নতুন জগৎ এনে দিলো। প্রথম বছরটা আমি স্কুলের বাস-এ যেতাম, দ্বিতীয় বছরে আমাদের একখানা বড়ো গাড়ি এলো। আমাদের মানে ভদ্রলোকের। তাঁর ছোটো গাড়িখানাও ছিলো, সেটা তিনি নিজে ব্যবহার করতেন আর এ-গাড়ি রইলো আমাদের জন্য। মা ঈষৎ তিরস্কারের সুরে বললেন, মিছিমিছি অর্থ নষ্ট, কী দরকার ছিলো আবার এ-গাড়িটা কেনবার?

সস্তায় পেলাম।

সস্তায় পেলেই সব যদি কিনতে হয় তাহলে—

চুপ করো তো—

ইদানিং মাকে তিনি তুমি বলতেন। আমার ভালো লাগতো না, কিন্তু আমার তো কোনো হাত নেই। মা বললেন, আমি তো চুপ করেই থাকি! কিন্তু সত্যি এ আমার ভালো লাগছে না।

আচ্ছা, তোমার ভালো না লাগে আমি আর বুলু ঘুরে বেড়াবো। কেমন?

মার পিছনে দাঁড়িয়ে পেন্সিলের কাঠ চিবোচ্ছিলাম—মৃদু হেসে মুখ নামালাম। আমাকে সম্বোধন করে উনি যখনই কোনো কথা বলেন ভিতরে ভিতরে আমি যেন কেমন এক রকমের শিহরণ অনুভব করি। আজ প্রায় তিন বছর ধরে ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের এ রকম ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ—বলতে গেলে তিনিই বাড়ির কর্তা, অথচ একদিনের জন্য তাঁর মুখোমুখি আমি লজ্জা কাটাতে পারিনি—আজ পর্যন্ত তাঁকে আমি কোনো সম্বোধন করি না। আমার দিদিমা বলেন, এ আবার কী! বাবার বন্ধু, তাছাড়া এমন মানুষ, কত ভালোবাসেন, কত যত্ন করেন, তার কাছে আবার লজ্জার কী আছে? কাকা বলে তো একদিন ডাকতেও শুনি না।

মা বলেন, ও বুনো হয়ে গেছে, মা। জন্মে থেকে তো মা আর দিদিমা—অন্য মানুষ তাই ওর বরদাস্ত হয় না।

বরদাস্ত হয় না—এ-কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়। সত্যিই তিনি আমাদের এত ভালোবাসেন, এত যত্ন করেন, সংসারের সমস্ত সুখ আমাদের জন্যই আহরণ করেন তিনি, তথাপি আমি তাঁকে বরদাস্ত করতে পারি না। এমন নয় যে আমি তাঁকে ভালোবাসি না—তাঁকে পছন্দ করি না কিংবা তাঁর কোনো ব্যবহারই আমার মনের প্রতিকূল হয়েছে—বিশেষ করে আজ জীবনের এইখানে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার উপলব্ধি করছি যে আমি তাঁকে দেখামাত্রই অতিরিক্ত ভালোবেসে ফেলেছিলুম বলেই তাঁর প্রতি আমার একটা অহেতুক বিদ্বেষ ভাবও ছিলো। আমার বয়সের মেয়ের প্রতি যতটা মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং যে রকম মনোযোগ দেওয়া উচিত, তিনি কেবলমাত্র সেটাই কেন দিয়েছিলেন সেটাই ছিলো আমার পরম হতাশার কারণ। আমার শিশু-মন যেটা বোঝেনি, আজকের অভিজ্ঞ মন দিয়ে সেটা বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারছি যে আমাকে ছাড়িয়ে পৃথিবীর অন্য কারো প্রতি তাঁর একতিল বেশি আসক্তিও ছিলো আমার পক্ষে দুঃসহ। মাত্র ঔচিত্যের মাপে যে মনোযোগ তিনি আমাকে দিলেন, বন্ধুপত্নীর প্রতি সে মনোযোগের প্রশ্নই উঠলো না—তাঁর জন্য তিনি সারা পৃথিবী জয় করে আনতেও দ্বিধা বোধ করতেন না। আমি আমার শিশু-মনের সহজাত প্রবৃত্তি দিয়ে প্রথম দিন থেকেই সেটা উপলব্ধি করে ভিতরে ভিতরে যন্ত্রণা পেতুম। হয়তো মার প্রতি আমি ঈর্ষাকাতরই হয়েছিলুম।

আস্তে আস্তে বড়ো হতে লাগলুম। আমার সতেরো বছর বয়স হলো—সুখে সমৃদ্ধিতে সাচ্ছল্যে ভরা সংসারে আমার কোনোই দুঃখ ছিলো না, তবু আমার ভিতরে ভিতরে কেমন একটা ভালো-না-লাগা-বোধ অবিশ্রান্ত আমাকে কষ্ট দিচ্ছিলো। একদিন পড়তে পড়তে হঠাৎ উঠে এলাম মার

কাছে। মা সোয়েটার বুনছিলেন। মার নতদৃষ্টি সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তাঁর মসৃণ রংয়ের সুগঠিত দুটি হাতের ওঠা-পড়া দেখতে দেখতে তাঁকে আমার সমবয়সী মনে হতে লাগলো। হঠাৎ চোখ তুলে তিনি আমাকে দেখতে পেয়ে হাসিমুখে বললেন, কী রে ?

গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলাম, কী বুনছো ?

তোমার সাহেবকাকার জন্য একটা সোয়েটার। কিছু বলবে ?

কোনো ভূমিকা না করে হঠাৎ বললাম, আচ্ছা মা, এ ভদ্রলোক তো সত্যিই আমার কাকা নন, তবু কেন আমরা তাঁরটাই ভোগ করি ? মা চকিত হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। এ রকম একটা প্রশ্ন যে আমার মনে উঠতে পারে, এ কথা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললেন, সত্যি কাকা বলতে কী বোঝায় তা কি তুমি জানো ?

বাবার বন্ধু, এই তো ? কিন্তু বাবার বন্ধু বাবাও না কাকাও না—লোকে তাঁকে পরই বলবে। তাঁর গাড়ি চড়ে স্কুলে যাই—তাঁর টাকা দিয়ে ভালো বাড়িতে থাকি—তাঁর দয়াতে ভালো ভালো পোশাক পরি—আত্মসম্মানে লাগে আমার।

হাতের সোয়েটারটা মা যেন ঝেড়ে ফেলে দিলেন, সোজা উঠে দাঁড়িয়ে কঠিন গলায় বললেন, ভালো যিনি বাসতে জানেন তিনিই পরম আত্মীয়—ভালোবাসাই সম্মান--ভালোবাসাই জীবন—তার চাইতে বড়ো কিছু নেই।

লোকে যদি বলে—

লোকে কী বলে না বলে তা তোমাকে ভাবতে হবে না, বুলু।

মরীয়া হয়ে বললাম, কেন ভাবতে হবে না—লোক নিয়েই তো আমাদের বেঁচে থাকতে হবে।

বুলু! মা একটা মর্মভেদী গলায় আমাকে সম্বোধন করে সহসা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি যেন হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠলাম। এত বছরের অভ্যস্ত জীবন সম্বন্ধে যে আমার মনে কেন এই অকারণ প্রশ্ন ধাক্কা দিচ্ছে, তা কি আমিই জানি ? আট বছর বয়স থেকে যে ক্ষোভ প্রতিদিন প্রতি পলে আমার মনের মধ্যে সযত্নে লালিত হয়েছে, এতদিনে তার একটা সুস্পষ্ট উপস্থিতিতে আমার সারা অন্তর ভরে গেলো।

বিকেলবেলা ভদ্রলোক যখন এলেন আমি লজ্জায় সংকোচে এতটুকু হয়ে গিয়ে নিজের ঘরে লুকোলাম। ছ'বছর বয়স থেকে এই ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত আমি তাঁকে দেখছি, তাঁর যত্নে তাঁর ভালোবাসায়ই এই দেহ-মন ভরে আছে, আর তাঁর সম্বন্ধে আজ আমি এত বড়ো কথাটা উচ্চারণ করেছি ভেবে দুঃখে বুক ভরে গেল। তিনি কি আমার পর ? তিনি কি আমাদের দয়া করেন ? তাঁর অর্থ কি কখনো সাহায্যের পর্যায়ে পড়ে ? আমি জানলা দিয়ে তাঁকে উঠে আসতে দেখলাম। সেই দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, উন্নত চেহারা—ঘন কালো চুল ব্যাকব্রাশ করা—আর এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেও তারুণ্যের আভায় উজ্জ্বল চামড়া। সহসা আমি আমার আঙুল গুনে গুনে তাঁর সঙ্গে

আমার বয়সের হিসেব করলাম।

যথারীতি তিনি দিদিমার কাছে গিয়ে বসলেন। আমি আমার ঘর থেকেই সেটা অনুভব করলাম, কেননা আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় আমি সেদিকেই নিবিষ্ট করে রেখেছিলাম। দিদিমার শরীরের অবস্থা ভালো ছিলো না। কিছুদিন থেকে তিনি আমার বিবাহের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিলেন এবং আমি লক্ষ্য করেছি সেই ব্যাকুলতার সঙ্গে ই ভদ্রলোকেরও পরিপূর্ণ সায় ছিলো। কাছাকাছি ঘর –আমি তাঁদের কথাপকথনে কান দিলাম। দিদিমা বললেন, যদি তুমি ভালো মনে করো তাহলেই ভালো—আমি কী বুঝি।

তাহলে একদিন নিয়ে আসি ছেলেটিকে!

আনো। ওর মায়েব সঙ্গে কথা বলে দ্যাখো।

বুলুকেও জিজ্ঞেস করতে হয়।

বুলু!—দিদিমা বোধ হয় একটু হাসলেন, ও আবার কী বোঝে?

না না, ওকে আপনি অবহেলা করবেন না। ওর মতো বুদ্ধিমান মেয়ে বিরল।

তোমরা দ্যাখো ওর বুদ্ধি। ওর মাই আমার কাছে শিশু, আর ও তো তার মেয়ে। আর অল্প দু'একটা টুকরো কানে ভেসে এলো, তারপরে তিনি উঠে এলেন মার কাছে।

মার ঘরসংলগ্ন ছোট্ট এক ফালি বারান্দা ছিলো—সেই বারান্দায় এসে জুতোর শব্দ থামলো--বুঝলাম, মা বসে আছেন সেখানে। অত্যন্ত মৃদু স্ববে ভদ্রলোক কী বললেন আমি বুঝতে পারলাম না, অত্যন্ত ক্লিষ্ট গলায় মা জবাব দিলেন, কিছু না।

আমি অত্যন্ত নিঃশব্দে দরজা খুলে বাবান্দার পাশেব ঘরে এসে বসলাম।

ভদ্রলোক বললেন, বুলুর বিয়ে সম্বন্ধে তোমার মতামত দাও।

আমি কী বলবো, তুমি যা ভালো বোঝো তাই হবে।

মার তুমি সম্বোধনে আমি আঁৎকে উঠলাম। যে সন্দেহ আমাকে প্রতিদিন ক্ষয় করছিলো, মার সংযত আচরণ প্রতিমুহূর্তে তার বিরুদ্ধ সাক্ষী দিয়েছে। এই দশ বছরের মধ্যে এমন একটি প্রমাণও পাইনি যা থেকে সেই সন্দেহকে আমি রূপ দিতে পারি। সমস্ত শরীর একটা বৈদ্যুতিক অনুরণন অনুভব করলাম।

তোমার মেয়ে—

অত্যন্ত উদাস গলায় মা বললেন, মেয়েই আমার—আর সবই তো তুমি করেছো—

তাহলে তোমার মত আছে কিনা, বলো।

আছে।

তোমার আজ কী হয়েছে?

তোমাকে একটা কথা বলবো। মার গলা অত্যন্ত দৃঢ়।

বলো।

এগারো বছর ধরে তুমি যত ঋণ দিয়েছো সব আজ আমি শোধ করে দেবো।

ঋণ! মণি, ঋণ? আমি তোমাকে ঋণ দিয়েছি, আর সেই ঋণ তুমি আজ শুধে দেবে? ভদ্রলোকের গলা ধরে এলো।

মা বললেন, কেন এত করেছ তা তো আমি জানি—প্রতি মুহূর্তে যে আবেদন তোমার চোখ দিয়ে তুমি আমাকে জানিয়েছো—সে আবেদন আমি হৃদয়ের মধ্যে অনেক আগেই গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু ভেবে দেখলাম সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে।

সামাজিক অনুষ্ঠান? যা আমার প্রত্যহের স্বপ্ন—সমস্ত জীবনের বিনিময়ে একমাত্র যা আমার কাম্য—তুমি কি সত্যি সেই কথা বলতে চাইছো?

হ্যাঁ। আমি মনস্থির করেছি—তোমার আমার যুক্ত জীবনকে এভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখার কোনো যুক্তি নেই, সেটাই পাপ।

মণি, এ কি সত্যি?

হ্যাঁ। এতদিন ঈশ্বর সাক্ষী ছিলেন, এখন মানুষকে সাক্ষী করে নিশ্চিন্ত হতে চাই—

আমি ঘরের মধ্যে সহসা দুই কানে হাত চেপে ধরলাম, তারপর একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে ছুটে বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে। দিদিমার মুমূর্ষু দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই তিনি কঁকিয়ে উঠলেন। কী, কী, কী হয়েছে? দুর্বল হাতে জড়িয়ে ধরে অত্যন্ত ব্যাকুল হৃদয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন আমাকে। আমি কান্নার বেগে অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলাম না—একটু শান্ত হয়ে বললাম আমি বিয়ে করবো না, দিদিমা, বিয়ে ভেঙে দাও। সে কী কথা—আশ্চর্য হয়ে তিনি তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। আমি নির্লজ্জের মতো বললাম, যাকে মন দিয়েছি—তাকে ছেড়ে আর কাউকে বিয়ে করতে পারবো না। আমার কথা শুনে দিদিমা হতবাক হলেন। আমাকে ঠেলে নিজের গায়ের উপর থেকে তুলতে চেষ্টা করে বললেন, বলছিস কী তুই? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি নিশ্বাস ফেলে বললাম, আমি বিমলেন্দুবাবুকে বিয়ে করবো।

বিমলেন্দু—? বিমল? তোর সাহেবকাকা? দিদিমা কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসলেন—আমি তাঁকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলাম, হ্যাঁ, তাঁকেই। তিনিই আমার স্বামী।

দিদিমার মুখ দিয়ে আর কথা সরলো না। স্তব্ধ হয়ে মরা মানুষের মতো বসে রইলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে ভরে গেলো ঘর। খানিক পরে নিঃশব্দ পায়ে মা ঘরে এসে আলো জ্বাললেন—আমাকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে বললেন, এ কী, বুলু! কী হয়েছে?

আমি জবাব দিলাম না। দিদিমা বললেন, মলিনা, শোনো। মা কাছে এসে দাঁড়ালেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, বিমলের সঙ্গেই বুলুর বিয়ে ঠিক কর। বয়সে একটু বড়ো, তা আর কী! আমার শাশুড়ি আর শ্বশুরও কুড়ি বছরের ছোটো-বড়ো ছিলেন।

এ কী বলছো, মা?

ঠিকই বলছি, এর চাইতে ভালো আর তুই কী আশা করিস?

ছি ছি, মা শিহরিত হয়ে উঠলেন, ও ওঁর কন্যার মতো—এমন অসংগত কথা তুমি ভাবলে কেমন করে, মা ?

কিছুই অসংগত নয় সংসারে। তুই তাকে বলবি একথা। মার মুখে একটি কালো ছায়া বিস্তীর্ণ হলো। আমার মাথায় ঈষৎ ঠেলা দিয়ে বললেন, দিদিমা কী বলছেন শুনলে, বুলু ?

আমি নিঃশব্দে পড়ে রইলাম। মা আবার বললেন, দিদিমা কী বলছেন—বুলু—

আমি নিঃশব্দ।

হুঁ—মার মুখ দিয়ে এ শব্দটি এমন একটি মূর্তি নিলো আমার কাছে যে আমার মনে হলো সমস্ত ঘরে যেন আগুন লেগেছে, পুড়ে এক্ষুনি ছাই হয়ে যাবে।

অত্যন্ত একটা অশান্তি আর অস্বস্তিতে কাটতে লাগলো সময়। বাড়িময় যেন একটা ভূতের ফিসফিসানি, কেমন এক অদৃশ্য ভয়ে মুহুর্মুহু আমি কেঁপে উঠতে লাগলাম। রাত্রিতে মার সঙ্গে পাশাপাশি শুয়ে সময় কাটতে লাগলো—আমি অনুভব করলাম তিনি ঘুমোননি—তিনিও হয়তো অনুভব করলেন যে আমার চোখ নির্ঘুম। অনেক রাত্রে আমার গায়ের উপর হাত রেখে মা ডাকলেন, বুলু, ঘুমিয়েছো ?

না।

তোমার দিদিমা যা বললেন, তাই কি তোমার মত ?

হ্যাঁ।

তুমি কি জানো এতদিন ধরে এ সংসারকে তিনি লালন পালন করেছেন কার জন্য।

জানি।

কী জানো ?

তোমার জন্য।

তাহলে তুমি জানো যে আমি তাঁর জীবনের প্রধান কেন্দ্র ? আমাকে ঘিরেই তাঁর সুখদুঃখ।

জানি।

তবে ?

আমি তাঁকে ভালোবাসি। তিনি তোমাকে যত ভালোবাসেন তার চাইতে অনেক, অনেক বেশি আমি তাঁকে ভালোবাসি।

অত্যন্ত ধীর স্থির গলায় মা বললেন তুমি কি বিশ্বাস করো না যে তাঁর অতখানি ভালোবাসা আমিও অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করেছি ? আর তা সার্থক করবার একমাত্র বাধা ছিলে তুমি ? তোমার জন্যই আমি আমার সমস্ত ইচ্ছাকে এতকাল গলা টিপে রেখেছি।

বাবার মৃত আত্মাকে তুমি অসম্মান করছো।

আমি মরে গেলে কি তোমার বাবা আমার আত্মার কথা ভাবতেন ?

তুমি স্ত্রী, তিনি স্বামী।

সে তো সমাজের অনুশাসনের প্রভেদ। আত্মার তো কোনো ভেদাভেদ নেই। হঠাৎ আমি ভেবে পেলাম না এ কথার কী জবাব দেবো। একটু পরে মাই বললেন, তুমি আমার সন্তান। শরীরের বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে তিলে তিলে আমি তোমাকে লালন করেছি, প্রাণের অধিক ভালোবেসে, সাধ্যের অতিরিক্ত যত্ন দিয়ে তোমাকে বড়ো হতে সহায়তা করেছি, সত্যি বলতে, এ ভদ্রলোকের সাহায্য তোমার কথা ভেবেই প্রথম গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু আজকের দিনে তুমিই আমার পরম শত্রু। আজ এই অন্ধকারে শুয়ে তোমার সঙ্গে যে কথা আমাকে বলতে হলো সেটা মা-মেয়ের কথা নয়, আমার পক্ষে তার চাইতে লজ্জার, তার চাইতে মর্মান্তিক আর কী থাকতে পারে? কিন্তু তবু তোমাকে বলি, অনেক দিন আগেই তিনি প্রস্তাব করেছিলেন, আমি রাজি হইনি কিন্তু কাল আমি তাঁকে কথা দিয়েছিলুম—

মা!

বুলু!

মা—কান্নার বেগে আমার সমস্ত শরীর উদ্বেলিত হতে লাগলো। একটু পরে মা আমাকে বুকের কাছে টেনে নিলেন—একটা নিশ্বাস নিতে নিতে বললেন, অদৃষ্টের এ কী বিড়ম্বনা!

পরের দিন সকালে ঘুম ভেঙেও বিছানায় পড়ে ছিলুম। মা কখন উঠে গেছেন জানি না। জানলা দিয়ে একফালি রোদ এসে পড়েছিলো বিছানায়, বুঝলাম বেলা হয়েছে। সহসা ঐ ভদ্রলোকের গলা শুনে ধড়মড় করে উঠে গেলাম। দ্রুত পায়ে তিনি ঘরে ঢুকলেন, আমাকে তখনো বিছানায় দেখে অবাক হয়ে বললেন, ও মা, এখনো ঘুমুচ্ছো? ওঠো, ওঠো, মা কই? শিগগির একবার বসবার ঘরে এসো।

চোখ তুলতে পারলাম না সংকোচে। ততক্ষণে তিনি ব্যস্ত হয়ে অদৃশ্য হলেন। দেয়ালে ঠেকানো তক্তপোশে হেলান দিয়ে বসে রইলাম চুপ করে। হাত-পা যেন কেমন শিথিল হয়ে এলো।

খানিক পরে মা এলেন ঘরে। সেই কালো-পাড় শাড়ি, মাথার আঁচল ঈষৎ তোলা—সরু হার গলায় চিকচিক করছে—সেই রকম শান্ত, গম্ভীর মুখশ্রী। এতদিনের দেখা মাকে আবার দেখলুম। মাথার কাছের আধো-ভেজানো জানলা খুলে দিয়ে বললেন, ওঠো, কত বেলা হলো। একটু থেমে—কাল বিমলবাবু বলেছিলেন একটি ছেলেকে নিয়ে আসবেন—তিনি এসেছেন। তোমার সঙ্গে দেখা করবেন।

ভ্রূ কুঞ্চিত হলো। উঠছিলাম, থমকে দাঁড়িয়ে বললাম, জানি কেন।

ক্ষিপ্রহস্তে বিশৃঙ্খল বিছানা পাট করতে করতে মা জবাব দিলেন, সেই কেন আজ আর নেই—তোমার ইচ্ছা পূরণ করবার চেষ্টাই আমি করবো। কিন্তু বাড়িতে যখন অতিথি আসেন তাঁর সঙ্গে শোভন ব্যবহারই ভদ্রতা।

আমি মেনে নিলাম। একটু পরে মা বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে—আমি বাথরুমে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে যথারীতি ভদ্র হয়ে এঘরে এলাম।

আমার বয়স এবং বুদ্ধির যোগ্য এ পাত্র। বিমলবাবু আলাপ করিয়ে

দিলেন—অত্যন্ত লাজুক চোখে একবার তাকিয়েই মুখ নামিয়ে নিলো ছেলেটি।

বয়স বাইশ-তেইশের বেশি নয়, ঈষৎ ঢেউ খেলানো বড়ো বড়ো ঘন আর বিশৃঙ্খল চুল মুখ ঘিরে আছে। ভালো করে তাকে দেখবার অবকাশ ঘটলো—কেননা সে নিজে নতদৃষ্টি—আর বিমলেন্দুবাবু মাকে ডাকতে গেলেন। খুব যে একটা বলবান পুরুষ তা নয়—কিন্তু স্বাস্থ্যের আভা ভরা মুখ। কালো আর সুসন্নিবিষ্ট ভুরুর তলায় দুটি ভাসা ভাসা উজ্জ্বল চোখ। একটু কেশে, একটু লাল হয়ে ছেলেটি মুখ তুললো এবার—নড়ে চড়ে বসে বললো, আপনি তো স্কটিশেই পড়ছেন, আমিও ঐ কলেজে পড়তুম।

ও।

খুব ভালো লাগতো, আমাদের একটা আলাদা দলই ছিলো—

আমার ভালো লাগে না—উৎসাহের মুখে পাথর চাপা দিয়ে বলে উঠলাম আমি। আমাব নিষ্করুণ জবাবে হঠাৎ থতমত খেয়ে চুপ করে গেলো ছেলেটি। আমি বললাম, ভারি খারাপ ছেলে সব। এ দেশে নাকি এখনো ছেলেমেয়ে একসঙ্গে শিক্ষার সময় হয়েছে—আমার তো মনে হয় না। ঈষৎ প্রতিবাদেব গলায় যদিও খুব স্তিমিত বললো, তা দেখুন—সব মেয়েও তো কিছু ভালো হয় না ছেলেদের মতো তাঁদের মধ্যেও ব্যতিক্রম আছে।

জানি না।

আমার কথাবার্তা যে অত্যন্ত উদ্ধত ও স্পষ্ট ছিলো সে বিষয়ে আমি অচেতন ছিলাম না। বিরক্তির বাষ্পে ওকে আচ্ছন্ন করে দিতে আমার ভালো লাগছিলো। ও যে এসেছে আর সে আসা যে ওর পক্ষে অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ হয়েছে সেকথা ওকে জানানো ভালো। আমার জবাবের পর একটুখানি থেমে রইলো ওর জিহ্বা আমি উঠে যাবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলাম, সহসা মুখ তুলে বললো, আজ কখন যাবেন?

যাবো! কোথায়?

কেন, বিমলদা যে বললেন—

কী বলেছেন বিমলবাবু?

আমাকে তো ধরে নিয়ে এলেন—

ওর কথার মধ্যিখানেই মা আর বিমলবাবু ঘরে ঢুকলেন। ও থেমে গিয়ে তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। মৃদুহাস্যে মা বললেন, উঠছো কেন? বোসো। বুলু, যাও তো, চা নিয়ে এসো। আমি সব ঠিক করে রেখে এসেছি।

মার এই আদেশ আমি মনে মনে অপছন্দ করলুম। চাকর দিয়েও অনায়াসে এটা চলতো। তবু উঠতে হলো।

চায়ের পর্বটি কিছু বিরাট ছিলো না, তবু অন্যান্য দিনের তুলনায় একটু বেশি। নিজে হাতে করেই সব নিয়ে এলাম। বিমলবাবু সাহায্য করলেন। আমাকেও বসতে হলো ওদের সঙ্গে চা খেতে। এতক্ষণে দেখলুম ছেলেটি সহজ হয়েছে, অত্যন্ত আগ্রহভরে কথা বলছে মার সঙ্গে। অবশেষে সেই

অর্ধসমাপ্ত প্রসঙ্গ ফিরে এলো।

কখন যাবেন, বিমলদা ?

আমি একচোখ প্রশ্ন নিয়ে তাকালাম বিমলবাবুর দিকে। মার মুখ দেখে মনে হলো এই যাওয়ার খবরটা মা জানেন।

বিমলবাবু হাতঘড়ির দিকে এক নজর তাকিয়ে বললেন, বাবা! এর মধ্যেই সাড়ে আটটা! এক কাজ করো, অসিত, তুমি আর আজ যেয়ো না, এখানেই যা হয় দুটো খেয়ে নাও—আমি এদিকে বারোটার মধ্যে কাজকর্ম সেরে চলে আসি, তারপরে—

মা বলে উঠলেন, সেটাই সবচেয়ে ভালো।

না, না, অপাঙ্গে একবার আমাকে দেখে নিয়ে অসিত ব্যস্ত হয়ে বললো, আপনারা কখন যাবেন বলুন, আমি ঠিক সেই সময়ে আসবো।

কোথায় যাবে, মা ? আমি আর কৌতূহল রাখতে পারলাম না।

মা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার সাহেবকাকা আজ বোটানিকেল গার্ডেনে যাচ্ছেন তোমাদের নিয়ে। মুখ থেকে কথা শেষ না-হতেই বিমলবাবু ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, তুমি বুঝি বাদ ?

সাহেবকাকা বলেই মা আমার মেজাজ খারাপ করে দিয়েছিলেন। কালকের ঐ ব্যাপারের পরেও মা যে কী করে তাঁকে আমার কাকা বলে উচ্চারণ করলেন জানি না—উপরন্তু মা যাবেন না বলে বিমলবাবুর এই ব্যাকুলতা আমাকে চাবুক মারলো। দুর্বিনীতের মতো উঠে দাঁড়ালাম চেয়ার ছেড়ে—আলস্য ভাঙতে ভাঙতে অবহেলার ভঙ্গিতে বললাম, তোমরাই যাও, মা—আমি যাবো না।

কেন ? বিমলবাবু বললেন, তোমার জন্যেই তো যাওয়া—তুমি না গেলে হয় নাকি ?

আমার জন্যে কিনা জানি না—তবে হলেও আমি যাবো না, এটা ঠিক।

তোমার আবার কী হলো ?

এর মধ্যে একটা হওয়া-না-হওয়ার কী দেখছেন, বিমলবাবু ? আমার বিমলবাবু সম্বোধনে উনি অবাক হয়ে গেলেন—মার মুখ, রাগে কি লজ্জায় জানি না, মুহূর্তে লাল হয়ে উঠলো। আমি গ্রাহ্য না করে অতিরিক্ত সহজভাবে তাকালাম সেই আগন্তুক আর অপ্রস্তুত ছেলেটির মুখে—সহাস্যে বললাম, আচ্ছা নমস্কার, আশা করি আবার দেখা হবে। প্রত্যাভিবাদনের আর অপেক্ষা না করে তিনটি প্রাণীকে বিমূঢ় করে দিয়ে সোজা চলে এলাম নিজের নির্জন ঘরে।

তারপরে সমস্ত ব্যাপারটা মা অবশ্যই কোনোরকমে তাঁর নিজের ভদ্রতা আর নম্রতা দিয়ে মানিয়ে নিয়েছিলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আমার যখন মাথা ঠাণ্ডা হয়ে এলো, মা তখন ঘরে এলেন। সোজা তিনি আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, সমস্ত জীবনটা যে আমি তোমার জন্যই উৎসর্গ করে রেখেছিলাম, তুমি কি তারই প্রতিশোধ নিচ্ছো, বুলু ?

ভীরু চোখ চকিতে তুললাম। জবাব দিলাম না।

বলো, জবাব দাও—আমার চোখের সামনে আমার হাতে গড়া সন্তান এত বড়ো উদ্ধত আচরণ করবে, অহেতুক অসম্মান করবে শ্রদ্ধেয়দের, আর আমি চুপ করে তা দেখবো ? বুলু, তুমি ভেবেছো কী ?

কথা বলতে বলতে মার নিশ্বাসের উত্থান-পতন দ্রুত হলো। ছেলেবেলা থেকে মা আমাকে স্নেহ দিয়ে, মমতা দিয়ে, বন্ধুতার উত্তাপ দিয়ে বড়ো করেছেন—শাসন করেছেন তার ফাঁকে ফাঁকে—আমি জানতে পারিনি। তাঁর সঙ্গ, তাঁর স্পর্শ, তাঁর স্বভাবের মাধুরী আমার সারা হৃদয়ের সকল অভাব মিটিয়ে রেখেছিলো, আর আজ দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে দেখলাম, তাঁর চাইতে বড়ো শত্রু আমার কেউ না। হয়তো কিছু বলতে যাচ্ছিলাম—তীব্রকণ্ঠে মা বলে উঠলেন, আমারই অন্যায়, আমারই প্রশ্রয়ে আজ তোমার এতখানি দুঃসাহস ! যিনি তোমার পিতৃতুল্য তাঁকে তুমি ভালোবাসো—যে মুহূর্তে তুমি এ কথা উচ্চারণ করেছিলে সে মুহূর্তেই—

ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো—মুখে মুখে বলে উঠলাম, কেন, কিসের জন্য ? কেন তুমি তাঁকে আমার কাকা বলে সম্বোধন করলে একটু আগে ?

তুমি তাঁকে যাই ভাবো তিনি তোমার পক্ষে তাছাড়া অন্য কিছু হতে পারেন না। অসভ্যের মত বললাম, স্বামীর বন্ধু হয়ে তিনি তোমাব পক্ষে অন্য হতে পারলে আমাব পক্ষেও হতে পারেন।

বুলু, আমি তোমার মা। সহসা মার গলা যেন কান্নার আবেগে বুজে এলো। আমি নিবৃত্ত হতে পারলাম না—অনেকদিনের অনেক ক্লেদাক্ত ঈর্ষা মনের মধ্যে লালন করেছি এতদিন ধরে, আজ তা কথার রেখায় মূর্তি নিলো। যাঁকে বুকের মধ্যে পাবার জন্য অবিরত ইচ্ছার তীব্র আবেগে আমি মরে যাচ্ছি, যাঁকে না পেলে সমস্ত জীবন আমার গভীর অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে,—তাঁকে যে মেয়ে আমাব কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, যে মেয়ের জন্য তিনি আজ অন্যদিকে মুখ ফেরাতে পারেন না, তাকে আমি ক্ষমা করতে পারি না, মা হলেও না। চোখে চোখে তাকিয়ে বললাম—তিনিও অবিবাহিত, আমিও কারো স্ত্রী নই—তোমার জন্য, শুধু তোমার জন্য আমার সমস্ত জীবন আজ ব্যর্থ হতে বসেছে—তুমিই আমাদের জীবনকে যুক্ত করবার একমাত্র প্রতিবন্ধক।

কী হয়েছে ?—ঘরের মধ্যে সহসা বিমলবাবু ঢুকলেন এসে। বুলুর আজ হলো কী ? মেজাজ এত বিগড়েছে কেন ?

আমার কথা শুনে মার চোখ দিয়ে অবিরল ধাবে জল গড়িয়ে পড়লো, আব তাঁকে দেখে আমি চুপ করলাম।

হলো কী তোমাদের ? আশ্চর্য হয়ে তিনি একবার মার দিকে, একবাব আমার দিকে তাকালেন, তারপর আমার একান্ত কাছে এসে তাঁর সেই বলিষ্ঠ স্নেহভরা বুকের মধ্যে আমাকে টেনে নিয়ে বললেন, কী হয়েছে বলো তো, বুলু। লক্ষ্মী মা আমার।

ছিটকে সরে এলাম বুকের সান্নিধ্য থেকে। ক্রন্দনবিজড়িত গলায় বললাম, আপনি আমাকে মা বলেন কেন ?

অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়ে থমকে গেলেন ভদ্রলোক। হঠাৎ আমি দুহাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম তাঁর বুকের উপর। দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে কেঁদে কেঁদে মুখ ঘষে ঘষে বলতে লাগলাম, আমি আপনাকে ভালোবাসি—খুব ভালোবাসি—মার চাইতে বেশি, অনেক, অনেক বেশি।

আমার এই অতর্কিত আবেগের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না—আমার এ রকম অসংলগ্ন কথাবার্তাও অবশ্যই তাঁকে বিরক্ত ও বিস্মিত করে থাকবে—আমাকে ঈষৎ সরিয়ে দিয়ে বললেন, শান্ত হও, কী হয়েছে খুলে বলো। তাঁর গলার গম্ভীর স্বরে হঠাৎ আমি ভয় পেলুম।

তাঁর স্বভাবত ধীর কণ্ঠ আরো ধীর হলো, পিতৃত্বের গাম্ভীর্য ছড়িয়ে পড়লো তাঁর মুখে, মার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি যাও, অসিতকে বসিয়ে রেখে এসেছি।

মা পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন—ভাবে মনে হলো না কোনো কথাই তাঁর কানে ঢুকেছে। বিমলবাবু মুখের দিকে তাকিয়ে একটু উদ্বিগ্ন হলেন। আবার বললেন, আমি বুলুর সঙ্গে কথা বলবো—তুমি অসিতের কাছে গিয়ে বোসো।

মা আস্তে বসে পড়লেন মেঝের উপর।

কী হোলো, মণি, কী হোলো, উদভ্রান্ত গলায় বলে উঠলেন বিমলবাবু, বুলু, শিগগির জল নিয়ে এসো।

চেঁচামেচিতে বাড়ির সব কটি প্রাণীই জড়ো হলো সেই ঘরে—দেখলুম, অসিতও এসে দাঁড়িয়েছে দোরগোড়ায়। কেবল অসহায় দিদিমা ও ঘর থেকে কাৎরাতে লাগলেন। ব্যাকুল হয়ে বিমলবাবু বললেন, এই অসিত, তুমি শিগগির ডক্টর মুখার্জিকে নিয়ে এস—একটুও দেরি না—। তারপর মার মাথাটা কোলের উপর টেনে নিয়ে ডাকতে লাগলেন, মণি, মণি,—শোনো, এই শুনছো? তাঁর গলার সুরে কী ছিলো সেকথা আমি কেমন করে বোঝাবো? হয়তো ভালোবাসার অতলস্পর্শী সম্মোহন ছিলো তাঁর কণ্ঠে। আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম তাঁর মুখের দিকে।

বিশেষ কিছু না—একটুখানি সময়ের জন্য হয়তো মার চৈতন্য লুপ্ত হয়েছিলো, খানিক পরেই তিনি চোখ খুললেন। ডান হাতটি একটু নেড়ে ক্লান্ত গলায় ডাকলেন, বুলু, আয়।

মুখের কাছে এগিয়ে গিয়ে ব্যাকুল আগ্রহে মার কপালে হাত রাখলাম—তাঁর সুন্দর মুখে দুঃখবেদনার লীলা। একটু আগে যে মা আমার পরম শত্রু ছিলেন, যাঁর অস্তিত্বই ছিলো আমার জীবনের চরম সুখের পক্ষে সর্বপ্রধান অন্তরায়, সেই মার এইটুকু অচৈতন্যের ব্যবধানই আমাকে তাঁর অনেক কাছে এনে ফেললো। মা আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে সুগভীর লজ্জায় দুহাতে মুখ ঢেকে নিতান্ত অসহায়ের মতো ফুঁপিয়ে উঠলেন।

অসিত ফিরে এলো ডাক্তার নিয়ে। তার মুখেও উদ্বেগের ছায়া। ফিস-ফিসিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছিলো? আমি বললাম, এই একটু অজ্ঞান মতো—

এ-রকম আরো হয় নাকি ?

না।

আমার সংক্ষিপ্ত জবাবে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে সে ভরসা পেলো না, বোধহয় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মা স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন। বিমলবাবু নিজেও গেলেন না--অসিতকেও ধরে রাখলেন সে বেলার জন্য। আবহাওয়াটা সহজ করবার জন্য হাসিমুখে বললেন, আমার এত সাধের রবিবারটাই মাটি করলে তোমরা। কোথায় ভেবেছিলাম বোটানিকেলে গিয়ে গাছের ছায়ায় ছায়ায় চমৎকার ঘুরে বেড়াবো --চারটা না বাজতেই মাঠে বসে চর্ব্যচোষ্য সহযোগে চা পান—কী কাণ্ডই হলো বলো তো ? কী আব করবে, অসিত, তোমারই ভাগ্য। বুলু, অসিতকে ভালো করে বলো—ও কিছুতেই থাকতে চাইছে না। আমিই জোর করে ধরে রেখেছিলাম—

আমি যাই, বিমলদা, আমার আজ--

মা বললেন, বোসো। তাঁর উচ্চারণের ভঙ্গিতে অপরিমিত স্নেহ ও আদেশ ছিলো। তিনি যেন মা আর অসিত তাঁর ছেলে। অসিত বাধ্য ছেলের মতো বসলো, আর কথা বললো না। আমি উঠে গেলাম সেখান থেকে। বিমলবাবু গুরুজনের মতো বললেন, যাও, মার খাবার ঠিক করো গে।

এবেলা বিমলবাবু মাকে উঠতে দিলেন না। কিন্তু বিকেলে আবার তিনি ওঠা-হাঁটা করতে লাগলেন, কাজকর্ম করলেন, আর সুস্থ মায়ের দিকে তাকিয়ে আবার সেই লজ্জা আর বিরোধ ফিরে এলো আমার হৃদয়ের মধ্যে। দুদিন আমি প্রায় নিজেকে লুকিয়েই রাখলুম তাঁর কাছ থেকে। বিমলবাবু যথারীতি এলেন, অসিতও পরের দিন খবর নিতে এলো -আমার সঙ্গে দেখা হলো না কারুরই। আত্মগোপন করা ছাড়া আর আমার কী উপায় ছিলো ?

মুশকিল হতো রাত্তিরে। নিঃশব্দে মার পাশে গিয়ে শুতুম, কিন্তু গায়ে গা ঠেকিয়ে শুয়েও যে কত বড়ো ব্যবধান থাকতে পারে দুজন প্রাণীর মধ্যে আমরা মা-মেয়ে তা প্রতি পলে অনুভব করতুম। বলি বলি করে মাও কথা বলতে পারতেন না, আমিও পারতাম না। দুর্লঙ্ঘ্য এক দেয়াল উঠলো দুজনের মধ্যে।

তৃতীয় দিন ভোর রাত্রে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেলো—জেগে দেখলুম, গুনগুনিয়ে মা কাঁদছেন। আমি তো তাঁকে কাঁদতে দেখিনি কোনোদিন। বুকটা ধড়াশ করে উঠলো—অন্ধকারে হাত বাড়ালাম তাঁর দিকে—ডাকলাম, মা। মুহূর্তে মার গুনগুনানি বন্ধ হয়ে গেলো—একটা কাতরোক্তি করে তিনি পাশ ফিরলেন ! উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম, কী হয়েছে ?

একটু জল দাও।

তাড়াতাড়ি উঠে বসে তাঁর গায়ে হাত দিয়ে চমকে উঠলাম। তীব্র উত্তাপে গা পুড়ে যাচ্ছে। আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো। তাড়াতাড়ি উঠে আলো জ্বাললাম, জল দিলাম—তারপর দৌড়ে গিয়ে ভৃত্যের ঘুম ভাঙিয়ে বিমলবাবুকে ডাকতে পাঠালাম। হয়তো তখনো ট্রাম চলতে শুরু করেনি, হয়তো অনেকক্ষণ অপেক্ষায় তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, তবু সেই অন্ধকারেই

আমি তাকে রওনা করিয়ে দিয়ে মার কাছে ফিরে এসে বসলাম, একটা অনির্দিষ্ট আশঙ্কার ভারে বুক যেন বোঝাই হয়ে উঠলো মুহূর্তে। সূর্য ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই বিমলবাবুকে নিয়ে ভৃত্য ফিরে এলো। লাল দুই চোখ মেলে মা তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে।

কপালের উপর হাত রেখে উনি ভুরু কুঁচকোলেন। দুবার মাথায় হাত বুলিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, তুমি কাছে থাকো, বুলু, ডাক্তার নিয়ে আসি।

ডাক্তার এসেছিলো। তার চাইতে বড়ো ডাক্তারও এসেছিলো দু'দিন পরে—আর তারও পাঁচদিন পরে কলকাতা শহরের সমস্ত প্রসিদ্ধ ডাক্তারদেব দিকে মুখ ফিরিয়ে মা সমস্ত সুখদুঃখের অতীত হলেন। মৃতোন্মুখ দিদিমার বুক ফাটা আর্তনাদে সমস্ত পৃথিবী ভরে গেলো। শুষ্ক চোখে বসে বসে দেখলুম, বিমলবাবু নিজ হাতে সাজিয়ে দিচ্ছেন মাকে। বহুমূল্য বেনাবসীতে শোভিত করলেন তাঁর মৃতদেহ, ফুলের গহনা দিয়ে মুড়ে দিলেন আপাদমস্তক—তারপর রাশি রাশি সিঁদুরে শোভিত করলেন তাঁর ললাট আর মাথা। তাঁর এই পাগলামি দেখে কে কী ভেবেছিলো জানি না—আমি নিজেও যে কী ভেবেছিলাম তাও জানি না—বুকের মধ্যে একটা চাপা আর দমআটকানো গুমরানি অনুভব করলাম অত্যন্ত তীব্রভাবে—আস্তে এগিয়ে গিয়ে মার নরম বুকের উপর মাথা রাখলাম, ধীরে ধীবে আমার সমস্ত চৈতন্য আচ্ছন্ন হয়ে এলো।

তবু দিন কাটলো। একটা দণ্ড যাব অস্তিত্ব না থাকলে এই ছোটো সংসার আবর্তিত হয়ে উঠতো—সেই মানুষের অভাবেও এ-বাড়িতে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত তাদের আলো ছায়া ফেললো—কয়েকদিন পরে বিমলবাবুও আবার আপিসে যেতে লাগলেন—আপাদমস্তক সাদা কাপড়ে মোড়া দিদিমাও মুখের ঢাকা খুললেন—আমি আবার প্রাণপণ শক্তিতে উঠে দাঁড়ালাম, সকল কর্তব্যই সকলে নড়ে চড়ে করতে লাগলাম, কেবল প্রাণশক্তির চাবিকাঠিটি নিয়ে মা আর ফিরে এলেন না এই সংসারে।

মার অসুখ থেকে শুরু করে আমাদের এই অবর্ণনীয় দিনের দুঃখময় জীবনের সঙ্গে অসিতও এ ক'দিন জড়িত ছিলো। প্রথমটায় বিমলবাবু অত্যন্ত বেশিরকম উদভ্রান্তই হয়ে পড়েছিলেন। বলতে গেলে এ বাড়ির সব কটি প্রাণীই আমরা এমন একটা অবস্থায় ছিলাম যে অসিত না থাকলে হয়তো কিছুতেই চলতো না। বিধাতার আশীর্বাদের মতোই সকলের সেবার ভার নিয়ে সে মুখ গুঁজে পড়ে ছিলো এখানে। কিন্তু বিদায় নেবার সময় হলো তার।

মাস দু'য়েক পরে কোন একদিন চুপ করে শুয়ে ছিলাম ঘরে। সন্ধ্যার আবছা আলোয় ঘর ভরে গিয়েছিলো। দরজার কাছে পায়ের শব্দ শুনে চঞ্চল হয়ে উঠলাম। বুঝলাম বিমলবাবু এসেছেন। মৃদু গলায় উনি আমার নাম ধরে ডাকতেই আমি তাঁকে আসতে বলে উঠে বসলাম। আলো

জেলে দিলাম ঘরের। চায়ের জোগাড়ে যাচ্ছিলাম, উনি বললেন, এখনো শুয়ে ছিলে ?

এমনি।

এ-বাড়ি আর ভালো লাগে না, না ? বলতে গিয়ে তাঁর চোখ ছলছল করে উঠলো। আমি মুখ নিচু করলাম।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, বোসো। আমি এখন চা খাবো না। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

সে কী কথা তা আমি বুঝলাম। ক'দিন থেকেই উনি যেন কী বলতে চান আমাকে। বারংবার বলবার জন্য মুখ খুলেও থেমে যান। কিন্তু অসুখী বোধ করলেও প্রস্তুত হয়ে বললাম, বলুন।

একটুও ভূমিকা করলেন না তিনি। তিনিও সেদিন প্রস্তুত ছিলেন হয়তো। ধীর গম্ভীর গলায় স্বভাবোচিত নিচু স্বরে বললেন, অসিতকে কী বলবো ?

আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন ?

তোমার মত না নিয়ে তো হতে পারে না :

তাঁর চোখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বললাম, কী হতে পারে না ?

একটু পলক নড়লো না তাঁর, কেবল কেমন একটা কঠিনতা ছড়িয়ে পড়লো সারা মুখে—বললেন, বিয়ে।

বিয়ে !

হ্যাঁ, বুলু—তোমার বিয়ের কথাই বলছি আমি। তোমার কোনো ব্যবস্থা করতে না পারা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। আমি একটু শান্তি চাই।

কথা শুনে আহত হলাম। নিজেকে সংযত রেখে যথাসম্ভব স্বাভাবিক গলায় বললাম, আপনাকে তো সবই বলেছি। সবই তো জানেন।

জানি।

তবে ?

সে তোমার ভুল বুলু, সে তোমার শিশু মনের একটা খেলা।

জানি না খেলা কিনা—আমাকে অবকাশ দিন ভুল ভাঙবার।

শোনো—তাঁর গলার স্বরে অদ্ভুত কান্নার শব্দ পেলাম। চকিত হয়ে চোখ তুলতেই তিনি আমার মাথার উপর হাত রেখে বললেন, তুমি তো জানো তোমার মা ছাড়া এ পৃথিবীতে আমার কাছে এমন কোনো মেয়ে ছিলো না, যার প্রতি ক্ষণিকের জন্যও আমার মন বিভ্রান্ত হতে পারে। ও যে আমার কী ছিলো—ও যে আমাকে কতখানি ভরে দিয়েছিলো শুধু ওর অস্তিত্ব দিয়ে. তা আমি তোমাকে কেমন করে বোঝাবো ! তোমাকে এইটুকু থেকে ভালোবেসে বড়ো করেছি, আমার স্নেহে এতটুকু খাদ ছিলো না—তোমার প্রতি আমার অপরিসীম আকর্ষণ—অপরিসীম মমতা—সুমন্ত্র বেঁচে থাকলে আমার চাইতে বেশি ভালোবাসতে পারতো কিনা জানি না—সেই তুমি—

আমি দু' হাতে মুখ ঢেকে বললাম, জানি, জানি—

শান্ত হও, শোনো—তোমার মৃত মায়ের আত্মার কথা চিন্তা করো—

কান্নাভরা গলায় বললাম, তিনি তো আপনাকে লিখে গেছেন, আমার সুখই তাঁর সুখ,—তাঁর কোনো আলাদা সুখ নেই। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি, ব্যথিত গলায় বললেন, এই তোমার শেষ কথা? এই শেষ —বিমলবাবু, এই শেষ। আমি নিচু হয়ে তাঁর পায়ে মাথা রাখলাম। একটু বসে রইলেন চুপ করে—একটু হাত বুলোলেন মাথায়—তারপর নিঃশব্দে উঠে গেলেন সেখান থেকে। আমি সেই পরিত্যক্ত জায়গায় মাথা কুটে ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগলাম।

অসিত এলো ঘণ্টাখানেক পরে। ভৃত্য এসে খবর দিতেই সংযত হয়ে উঠে বসলাম। আমার মুখ চোখ দেখে ও যেন আঘাত পেলো। একটু তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। চোখের এ দৃষ্টি আমার অপরিচিত নয়। বুকটা কেঁপে উঠলো। বললাম, বসুন।

আপনি আজ বড্ড বিচলিত রয়েছেন?

না।

কিন্তু কী করবেন—

চুপ করে রইলাম। একটু দ্বিধা করে বললো, আমাব তো চলে যাবার সময় হলো—ছুটির দুটো মাস কাটিয়ে দিলাম—

আপনি যাবেন?

হ্যাঁ, মা বার বার চিঠি লিখছেন -

ও।

আমার তো যেতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু —

না, যাবেন না কেন —মা আশা করে আছেন!

অসিত আমার কাছে থেকে যাবার উৎসাহ প্রার্থনা করেনি—কী প্রার্থনা করেছিলো তা আমি জানি। ব্যথিত হলাম, কিন্তু উপায় নেই।

একটু চুপচাপ কাটলো। তারপর মৃদু স্বরে বললো, আমাকে কি আপনার কোনোই প্রয়োজন নেই?

নিশ্বাস নিয়ে বললাম, আপনার জন্য আমার কত কৃতজ্ঞতা জমা হয়ে আছে মনের মধ্যে -

বাধা দিয়ে অস্থির গলায় বললো, কৃতজ্ঞতার কথা কেন তুলছেন—আমি তার কথা বলছি না—আপনি কি বোঝেননি আমার কথা?

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালাম, তারপর পরিষ্কার গলায় বললাম, বুঝেছি, কিন্তু সে হতে পারে না, অসিতবাবু—কিছুতেই না।

খানিকক্ষণ স্থানুর মতো বসে রইলো অসিত—তারপর ঠিক বিমলবাবুর মতো করেই ধীরে ধীরে উঠে গেলো ঘর ছেড়ে। আবার আমার দুচোখ ছাপিয়ে জল এলো—বুক ভেসে গেলো উদ্বেলিত অশ্রুর প্লাবনে।

পরের দিন সকালবেলা কিছু আগে পরে দু'খানা চিঠি পেলাম ভৃত্যের মারফৎ—

তোমার সব ব্যবস্থাই করে রেখে গেলাম—আশা করি কোনো আর্থিক কষ্ট তোমাকে পেতে হবে না।

যেখানেই থাকি আমার অন্তরের সকল মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা সততই তোমাকে ঘিরে থাকবে।

হতভাগ্য বিমলেন্দু।

প্যাণ্ডোরার অদম্য কৌতূহলের দোষেই সমস্ত পৃথিবীতে দুঃখ ছড়িয়ে পড়েছিলো—কিন্তু আশার কৌটোটি সে খুলতে পারেনি—তাই সে আশা যতই দুরাশা হোক, মানুষ তাকে চিরকাল ধরে লালন করে বুকের মধ্যে—আমিও সেই আশাটি মনের মধ্যে জ্বালিয়ে রাখলাম—যদি কখনো সময় আসে আপনি নিশ্চয়ই ডাক দেবেন আমাকে।

হতভাগ্য অসিত।

দু'খানা চিঠি হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম খানিকক্ষণ। মনের মধ্যে ভ্রমরের একঘেয়ে গুনগুনানির মতো একটি কথাই কেবল গুঞ্জিত হতে লাগলো : গেলো—সব গেলো।

অন্তহীন

হৃদয়টা মানুষের এক অজ্ঞাত রহস্য। যত বড়ো পন্ডিতই তুমি হও না কেন, এখানে এসে তার চেয়েও বড়ো কোনো শক্তির কাছে তোমাকে নিচু হতেই হবে। এই সুদীর্ঘ আটতিরিশ বছর বয়সেও সুশান্তর মন আবার পূর্ণিমার চাঁদের মতো ভরপুর হয়ে উঠলো। অনেক আকাঙ্ক্ষা আর অনেক দুঃখের অলিগলি পেরিয়ে এই এতদিনে একটু নিশ্বাস নিয়ে বসেছিলো মাত্র, এর মধ্যেই হুড়মুড় করে এলো আবার ঝড়। প্রথম ঝাপটাটা সে তার এতদিনকার অর্জিত স্থৈর্য দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছিলো বটে, কিন্তু যেখানে এত সুখ, আনন্দ, ভবিষ্যৎ দুঃখের এত বড়ো তীব্রতার আভাস, সেখানে কি মানুষ স্থির থাকতে পারে? নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে এবার সে নিশ্চিন্ত হলো। মনে মনে ভাবলো, যা হয় হোক, আর পারি না।

জীবনের আরম্ভটা মন্দ ছিলো না। বিধবা পিসির অপর্যাপ্ত শাসন আর পিতার প্রচুর আদর দুটো মিলে তার জীবনে একটা ভারসাম্য স্থাপন করেছিলো। মা বেচারা স্বামী আর ননদের ছায়া হয়েই দিন কাটাচ্ছিলেন, কাজেই পুত্রের প্রতি তাঁর কোনো ভাবই প্রকট ছিলো না। অল্প বয়সের প্রথম সন্তান—বরং কেমন একটা লজ্জা লজ্জা ভাবই ছিলো যেন। চোদ্দ বছরের ছোটো বড়ো—অনায়াসেই তারা ভাইবোন হতে পারতো। কিছুকাল পর্যন্ত এ সংসারের সেই একমাত্র শিশু ছিলো—একাদিক্রমে পাঁচ বছর সুখ স্বাচ্ছন্দ ভোগ করবার পরে এলো একটি ফুটফুটে ছোটো বোন। সুশান্তর হৃদয় যেন ভরে গেলো—তার পরিপুষ্ট লাবণ্যভরা ছোটো বুকের মধ্যে তার চেয়েও অনেক ছোটো একটি প্রাণীর পাখির মতো উষ্ণ আর নরম স্পর্শ তাকে শিহরিত করলো। তার মুখচুম্বন করে এইটুকু-টুকু সাদা মোমের মতো মসৃণ হাতে পায়ে গাল ঘষে ঘষে জীবনের চরম আনন্দের আস্বাদ পেলো সে। এত ভালো লাগা যে পৃথিবীতে আছে তা কে জানতো? তার পরের বছর আরো একটি—দুবছর পরে আরো একটি—এমনি করে করে পনেরো বছরে পাঁচটি ভাইবোনের দাদা হলো সে। ততদিনে সে কুড়ি বছরের যুবক! তার কালো কালো টানা চোখে সারা পৃথিবীর স্বপ্ন। মফস্বলের গণ্ডি ছেড়ে সে কলকাতা এসেছে, ছেলেবেলাকার শাসনকণ্টকিত ছাঁটা চুল এখন কুঞ্চিত হয়ে এসে নেমেছে কপালে—মোটা জিন কোটের পরিবর্তে বাঁকা-গলা পাতলা পাঞ্জাবীর তলা দিয়ে তার সুন্দর লাবণ্যভরা বুকের আভাস পাওয়া যায়। কলেজের

সহপাঠিনীদের দিকে তাকাবার অদম্য ইচ্ছাকে পর্যন্ত সে অনেকটা প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছে।

কলকাতায় পড়তে আসার এইটেই ছিলো পিসিমার সব চাইতে বড়ো আতঙ্ক। এত কষ্টে ভাইপোকে তিনি ঐ ফ্রকপরা পাকা মেয়েগুলোর সংস্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, এখন না ঐ শাড়িপরা ছুঁড়িগুলো বিগড়ে দেয়। নরেনবাবু বললেন, তোমার যত—শান্ত আমার তেমন ছেলে নাকি? আসলে শান্ত কিন্তু তেমনি ছেলে। মেয়েদের প্রতি ওর একটা সহজাত আকর্ষণ। পড়তে পড়তে ও অন্যমনস্ক হয়ে যায়—বড়ো বড়ো ঘন চুলে আঙুল চালাতে চালাতে কী যে মনে পড়ে, কাকে সে আকাঙ্ক্ষা করে বুঝে উঠতে পারে না। জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকে চুপ করে—ঝিরিঝিরি হাওয়া দিক কি অসম্ভব গুমোট হোক—সবটাই ওর কেমন অস্বাভাবিক ঠেকে মনে হয় এমন তো আর হয়নি, আর তো এমন হবে না। হঠাৎ যেন মন কেমন করতে থাকে—মাথা নিচু করে অচেতনভাবেই বইয়ের পাতার উপর পেন্সিল দিয়ে সুন্দর সুন্দর মুখ আঁকে, তারপর সেই মুখের উপর নিজের মুখ রেখে চোখ বোজে। সেই ছোটোবেলায় পাঁচ বছর বয়সের সময় বোনকে কোলে নেবার রোমাঞ্চের পুনরাবৃত্তি হয় তার বুকের মধ্যে।

কিন্তু সত্যি বলতে জীবন্ত শরীরের প্রতি তেমন আকর্ষণ ওর নেই বরং বেশ খানিকটা উদাসীনতা আছে। নিজের মধ্যেই ও সম্পূর্ণ। কেমন একটা উন্মনা আর ঝিমুনো ঝিমুনো ভাব—অতিরিক্ত নম্র আর পাঁচজন থেকে আপনাকে আলাদা রাখার সহজ ক্ষমতা। এজন্যেই কিনা জানি না, না কি ওর সেই আশ্চর্য লাবণ্যভরা বুকের আভাস আর দুই চোখের বিভোরতাই অন্যদের ক্রমাগত ওর প্রতি আকৃষ্ট করে। চোখের তারার অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যও হয়তো এজন্য দায়ী। পুরুষের পায়ের পাতা আলোচনার যোগ্য নয়, কিন্তু ওর পঞ্চাশ ইঞ্চি লোটানো কোঁচার তলা দিয়ে স্যান্ডেলপরা দুটি পায়ের যে কোনো অংশই মেয়েদের চোখে পড়ুক না কেন, স্বতই সে চোখ সেখানে আবদ্ধ হয়ে থাকতো। কী জানি কেন, সে পায়ে একটু হাত ছোঁওয়াবার দুর্লোভও হতো তাদের। বি. এ. পড়বার সময় একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর সামান্য প্রণয়সম্ভাবনা হয়েছিলো, এবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে আর একবার হলো। বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র সে, প্রত্যেক পরীক্ষায় ফার্স্ট সেকেণ্ড হতে হতে এখানে এসেছে, শোনা গেলো ললিতকলাতেও তার অসামান্য দখল। মেয়েদের মধ্যে ফিসফিসানি উঠলো এবং একটি ছবি আঁকার সূত্র ধরেই একটি মেয়ে অত্যন্ত কাছে এসেছিলো তার। আর এ কাছে আসাই শেষ পর্যন্ত এমন একটা অবস্থায় দাঁড়ালো যে সেটা সুশান্তর পক্ষে সত্যি বিস্ময়ের হয়েছিল। স্ত্রী পুরুষে মেলামেশার এই চরম পরিণতি সম্বন্ধে সে সচেতন ছিলো না, তার পক্ষে প্রার্থনার ছিলো শুধু সঙ্গ-মাধুর্য দৈহিক সংস্পর্শ নয়। কিন্তু কোন একদিন মেয়েটি মুখ ভার করে ছলোছলো চোখে বললো, এরকম করে আর ক'দিন চলবে? কেবল দূরে থাকা কেবল—

আশ্চর্য হয়ে সুশান্ত জবাব দিলো, দূরে থাকা মানে ?

এ অসম্ভব।

বুঝলো সুশান্ত। বললো, তুমি কী চাও।

কী চাই, সে কি মুখ ফুটে বলতে হবে ? সে চাওয়া কি তোমারও না ?

আমি তো আর কিছু চাইনে। প্রতিদিন তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে, ভালো লাগছে তোমাকে—তোমার সঙ্গে আমার একান্তই—

চুপ করো! চুপ করো! তীব্রতায় মেয়েটির গলা রুক্ষ শোনালো। চুপ করে রইলো সুশান্ত। দুনিবার অভিমানে মেয়েটির নিশ্বাস দ্রুত হলো—রাগ আর হতাশা মিলিয়ে জল দেখা দিলো তার চোখে। সুশান্ত মৃদুকণ্ঠে বললো, রাগ করলে ?

অস্ফুট গলায় জবাব এলো, অপদার্থ।

আমি তো বুঝতে পারিনে যে—

মেয়েটি অক্ষম রাগে হাত তুলে বাধা দিলো তাকে। তার ইচ্ছা করলো ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয় গালে। আশ্চর্য—! এমন নিরুত্তাপ পুরুষমানুষ দিয়ে সে করবে কী ? কতদিনের কত সুযোগ ও নষ্ট করেছে, কতদিনের কত প্রার্থনা ও ব্যর্থ করেছে—ও মানুষ ? হঠাৎ মেয়েটি স্পষ্ট ভাষায় বললো, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। তুমি কি আমাকে নিয়ে খেলা পেয়েছো ?

এতটুকু হয়ে গেলো সুশান্তর মুখ। বিয়ে ? বিয়ে করবে কেন ? আর খেলাই বা কী করলো! বন্ধুতা কি অন্যায় ?

বলাই বাহুল্য, তারপর ছাড়াছাড়ি হতে ওদের আর সময় লাগেনি। কয়েকদিন সত্যিই খুব খারাপ লেগেছিলো সুশান্তর। রাত্রিতে কতদিন ঘুম ভেঙে ওর মনে পড়েছে মেয়েটিকে, তারপর একদিন মুছে গেছে মন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে।

আসলে স্ত্রীলোকের সঙ্গে বন্ধুতাটাও ওর বন্ধুতার পর্যায়েই আবদ্ধ থাকতো। অন্যের চোখে এটা স্বাভাবিক ছিলো না, কিন্তু দৈহিক সংস্পর্শের আকাঙ্ক্ষা ওর শূন্য ছিলো—কেন কে জানে। এরকম একটা অস্তিত্বহীন প্রণয় নাকি সম্ভব ? ক্রমে ক্রমে মেয়েরা ওকে দুর্নাম দিতে লাগলো। এটা যে তার একটা খেলা, একাধিক মেয়ে ভোগ করবার অপূর্ব কৌশল এবং এর নামই যে দুশ্চরিত্রতা এ বিষয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ রইলো না। এমনিতেই নানা দিক থেকে সে একটা আলোচনার পাত্র ছিলো—কুড়ি বছরের ছেলের পক্ষে অত পরিণত চেহারা বা। বুদ্ধি, সংসারের পক্ষে অমন উদাস বা অদ্ভুত, পণ্ডিতের মতো হাবভাব—সমবয়সীদের মধ্যে কিছুটা ভক্তি, কিছুটা ঈর্ষা, কিছুটা হাসিহাসি—সব মিলিয়ে সে যেন একটা বিচিত্র বিস্ময়। প্রোফেসররাও তাকে যেন খানিকটা সমীহ করতেন। কিন্তু এই মেয়ে-ঠকানো ব্যাপারটায় সবাই একটু আরাম পেলো। তাকে খানিকটা নামাতে পেরে শান্তি পেলো মনে। একটা মানুষ কেবলই জিতবে, কেবলই অন্য জগতের একটি উঁচু

আসনের আদর্শ হয়ে থাকবে, এটা যেন ঠিক সহনীয় ছিলো না। কাজেই একটা শান্তির হাওয়া বইলো তাদের মনে। কাকের মুখে কথা ভাসে। শোনা গেলো রাত একটার আগে সে হোস্টেলে ফেরে না, শোনা গেলো কোনো-কোনোদিন নেশা করেও ফিরে আসে। কথাটা অবিশ্যি একদিক থেকে মিথ্যা নয়। ভালো লাগলে সারারাত গঙ্গার ঘাটেই সে বসে থাকে। চুপ করে তাকিয়ে থাকে জলের দিকে—নৌকোর ফাঁকে ফাঁকে আলোছায়ার লীলা বেঁধে রাখে ওর মনকে। হাওয়া বইলে যখন সবাই জানলা বন্ধ করে—সে তখন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ডেকে তার সাড়া পাওয়া যায় না, চোখের তারার পাশে পাশে শিরাগুলো সব লালচে হয়ে ওঠে। কোনোদিন হয়তো কলেজে না গিয়ে সারাদিন ছবিই আঁকে বসে বসে। আসলে মনের গড়নটাই তার আলাদা। লোকের আকর্ষণ উদ্রেক করে, কিন্তু নিজে সে ধরা ছোঁওয়ার বাইরে। তার অত্যন্ত লাল আর সুদৃশ্য হাতের তেলোর দিকে তাকিয়ে কত মেয়েব বুক থরথর করে, আর সমবয়সী ছেলেরা ভালোবাসায় পড়ে। নিঃশব্দে হেঁটে হেঁটে যখন সে করিডর পাব হয়—পাশে পাশে ছেলেমেয়েরা কেমন একটা সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

দুর্নাম হলো তার। আর সেই দুর্নাম ছাত্রছাত্রীদের দেয়াল ভেদ করে মাস্টারদের কানেও গেলো—মাস্টাবদের কুঞ্চিত কপালের রেখা থেকে পরিচিত মহলেও তা ছড়িয়ে পড়লো এবং শেষ পর্যন্ত বাবার টেলিগ্রাম পেয়ে সে বাড়ি গেলো। পিসিমাব অন্ধকার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রথমটা কিছুই বুঝলো না, বাবাব গম্ভীর মুখও তাকে বিস্মিত করলো। নিভৃতে খবরটা দিলেন মা।

তুই নাকি উচ্ছন্নে গেছিস?

আমি! উচ্ছন্ন কী, মা?

কী জানি বাপু, ভাইবোনে তো ক'দিন থেকে রাতদিন এই জপছেন। তোর বিয়ে ঠিক করেছেন ওঁরা।

ও। সুশান্ত বুঝলো এবার কথার তাৎপর্য—তা বিয়েটা বুঝি এই রোগের ওষুধ?

বোধহয়—। বিয়েতে যে মার সম্মতি নেই তা তাঁর কথার সুর থেকেই বোঝা গেলো। সুশান্ত জিজ্ঞাসা করলো, তা তুমি কী ভ বো আমাকে?

আমি! সস্নেহে হেসে মা মাথায় হাত রেখে বললেন, আমাকে তো ওরা ভাবতে শেখায়নি, শান্ত, আমি কেবল তোকে ভালোবাসতেই পারি। এমন আবেগভরে মা কথাটা বললেন যে সুশান্তর অন্তর আপ্লুত হয়ে গেলো—নিঃশব্দে মার হাত দুটো সে জড়িয়ে ধরলো কেবল। গলার স্বর নিচু করে মা বললেন, আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার তো কোনো মূল্য নেই, কিন্তু সত্যি বলতে এক্ষুনি তোকে বিয়ে দিয়ে হাত পা বাঁধতে আমার ইচ্ছে করে না।

সুশান্ত চুপ করে রইলো। বলাই বাহুল্য, শেষ পর্যন্ত মা বা ছেলে কারো ইচ্ছাই তাঁরা গ্রাহ্য করলেন না। নরেনবাবু যদি বা কিছুটা ইতস্তত করছিলেন, কিন্তু দিদির কথার উপর কিছুই বলতে পারলেন না। সুশান্ত

ছেড়ে দিলো নিজেকে, তারপর পিসিমারই এক দূর সম্পর্কের ভাসুরঝির সঙ্গে এক মাসের মধ্যেই বিয়ে হয়ে গেলো তার। বিয়ের দিন মনটা অত্যন্ত ভারি রইলো সুশান্তর, তাছাড়া হাঙ্গামাতেও কাটলো। তার পরের দিন কালরাত্রি—একেবারে ফুলশয্যার দিন সে নিভৃত হলো স্ত্রীর সঙ্গে। সমস্ত ঘরময় ফুলের নিবিড় গন্ধ, বিছানাটি বেলফুলে সাজানো, খাট বেয়ে বেয়ে নেমেছে ফুলের ঝালর। লাল টুকটুকে জরির পাড় বসানো শাড়ি পরা ফুলের গহনা-মোড়া বৌটির দিকে এবার স্থিরদৃষ্টিতে তাকালো সে। সাদা-সাদা পুষ্ট হাত, সাদা পাথরের মতো মুখের উপব একজোড়া ভাবলেশহীন বড়ো চোখ, সাদা গলা, ঝিরিঝিরি পাতাকাটা চুলের তলায় ছোটো সাদা কপাল - দেখতে দেখতে সুশান্তর হঠাৎ মনে হলো মানুষটা যেন বেঁচে নেই, যেন কফিন থেকে নিষ্প্রাণ একটি দেহ উঠে এসে বসেছে তার কাছে, ভয়ে বিস্ময়ে বুকের মধ্যে যেন কেমন করে উঠলো। তাড়াতাড়ি চোখ সবিয়ে নিলো জানলার বাইরে—উঠে এলো তার পাশ থেকে, মৃদু শব্দে একবার কাশলো—একবার নিশ্বাস ফেললো, তারপর সারা রাত ধরে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে কোনো এক সময়ে হাতের মধ্যে মাথা গুঁজেই চোখ বুজলো। বৌটি কী ভেবেছিলো কে জানে—একটুখানি বসে থেকে ঐ ফুলের মধ্যেই নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলো সে।

বিয়ে উপলক্ষ্যে এমনিতেই পড়াশুনোর যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিলো। পিসিমা বললেন, এক্ষুনি ওকে পাঠিয়ে দে, নবেন। তা নইলে বৌয়ের আঁচল ধরলে আর যেতে চাইবে না।

পাঁচদিনের দিন চলে এলো সে আবাব কলকাতা। আর বৌ গেলো তার পিত্রালয়ে। বাবা আর পিসিমা নিশ্চিন্ত হলেন, আর মার মনে হলো, এ ভালো হলো না।

খবরটা রটতে দেরি হয়নি : তার বিবাহের খবরে বিশ্ববিদ্যালয় সচকিত হলো। মেয়েদের মনে নামলো মেঘের ভার। যে মেয়েটির সঙ্গে সম্প্রতি একটু বেশি মেলামেশা চলছিলো, সে একদিন নিরালা পেয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেললো। কিন্তু সুশান্ত নিজে কিছুই পরিবর্তন অনুভব করলো না। জীবনে যে একটি নতুন মেয়ে অতি ঘনিষ্ঠ অত্যন্ত আপন হয়ে তার কাছে এসেছে, একবারও মনে পড়লো না সে কথা। আপন পরিচিত জীবনের সীমাতেই সে রইলো আবদ্ধ হয়ে। তেমনি সে বিভোর হয়ে ছবি আঁকে—কখনো সারারাত গঙ্গার ঘাটের নরম ঘাসের উপর বসে তাকিয়ে থাকে জলের দিকে—কৃষ্ণচূড়ার সমারোহে এখনো বিমুগ্ধ বিস্ময়ে বিশ্ব সংসার ভুলে যায়। কখনো বইয়েব অতলে ডুবে থেকেই নিঃশব্দ দিন কেটে যায় অলক্ষিতে।

পরীক্ষা এসে গেছে। ছাত্র-ছাত্রী প্রোফেসর সকলেই ঈষৎ চঞ্চল, সুশান্তও মনকে একাগ্র করেছে বইয়ের পাতায়। সে যে ফার্স্ট হবে এ কথা সবাই জানে। সবচেয়ে ভালো জানে সে নিজে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বড়ো তরফে বলাবলি চলেছে তাকে নিয়ে—পরীক্ষার পরে স্কলারশিপ দিয়ে বিলেত

পাঠানো হবে। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ঝকঝক করতে লাগলো সুশান্তর চোখে। কিন্তু ঔজ্জ্বল্য এজন্য নয় যে ভবিষ্যতে সে একজন খ্যাতনামা লোক হবে, ভাবীকাল তাকে চিরকাল মনে রাখবে—তা নয়, সমুদ্রের অকূল জল তাকে টানে। চিত্রতীর্থ ইটালির মাটিতে একদিন সে পা রাখবে—এ কথা ভাবলেও বুকের মধ্যে শিরশির করে তার। দুই চোখ ভরে দেখে নেবে সভ্যতার সব কেন্দ্রস্থল—যাবে প্যারিসে, যাবে বার্লিনে—তারপর? তারপর ভাবনা তার বেশিদূর এগোয় না। বিহ্বল হয়ে একটা ভরা মন নিয়ে চুপ করে বসে থাকে কেবল।

পরীক্ষার দশদিন আগে সে চিঠি পেলো, তার বাবা মৃত্যুশয্যায়। পড়ার ক্ষতি হবে বলে তাকে জানানো হয়নি আগে। ভালো করে একটা চিকিৎসা পর্যন্ত করানো গেলো না। তাকে দেখে মা কেঁদে ফেললেন। গা থেকে সমস্ত গহনা খুলে দিয়ে তার হাতের উপর হাত রেখে বসে রইলেন স্থবির হয়ে। কথা বেরুলো না মুখ দিয়ে। বাবা দুর্বল হাতে সুশান্তকে টেনে নিলেন কাছে—কত আকাঙ্ক্ষার এই তাঁর প্রথম সন্তান। ভিতরে ভিতরে কত স্নেহ সঞ্চিত ছিলো তাঁর ওর জন্যে, ভবিষ্যতের কত আশা জড়ানো এই ছেলে! স্তিমিত গলায় বললেন, শান্ত, ওগুলো ফিরিয়ে দে তোর মাকে। আমার ডাক এসেছে, কেন মিছিমিছি সর্বস্ব খোয়াবি।

বাবা, তুমি চুপ করো।

চুপ করবার সময় তো হলো, বাবা।

আমি তোমাকে কলকাতায় নিয়ে যাবো—

অবুঝ হোসনে।

আমি আজই সব বন্দোবস্ত করে আসবো। নিউমোনিয়া আজকাল তো একটা ছেলেখেলা—

তুই কি বোকা হয়ে গেলি? আমার সহায় সম্বল কী, তুই জানিসনে? তুই চলে যা, পরীক্ষা দে।

সে হবে, তুমি কিছু ভেবো না—

ভাববো না?—কোটরগত দুই চোখ জলে ভরে গেলো নরেনবাবুর। কত ভার দিয়ে গেলাম—

মা ফুঁপিয়ে উঠলেন, তুই ওঁর কথা শুনিসনে খোকা—আমার সর্বস্বের বিনিময়ে ওঁকে তুই ফিরিয়ে আন—কী হবে, কী হবে আমার এ সব দিয়ে! আবর্জনার মতো সব গহনাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি, আর সুশান্ত দুই হাত মুঠো করে নিজের ব্যাকুলতাকে সংযত করবার চেষ্টা করলো।

একদিনের মধ্যেই ব্যবস্থা করে সুশান্ত নরেনবাবুকে কলকাতা নিয়ে এলো—ভাইবোনেরা সজল চোখে দাঁড়িয়ে দরজা ধরে—পিসিমা আর্তনাদ করে উঠলেন। মা এলেন সঙ্গে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। প্রায় তিন সপ্তাহ ধস্তাধস্তির পরে মারা গেলেন নরেনবাবু। শুষ্ক চোখে মাথার কাছে দাঁড়িয়ে রইলো সুশান্ত—মৃতদেহের বুকের উপর অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইলেন মা।

কোথায় রইলো প্যারিসের স্বপ্ন, কোথায় গেল চিত্রতীর্থ ইটালির মায়া—আর কোথায় বা তার পরীক্ষা। একটা ফুৎকারে যেন ঈশ্বর সমস্ত আলো নিবিয়ে দিলেন তার চোখ থেকে। সদ্যবিধবা মায়ের দুটি রিক্ত হাতের দিকে তাকিয়ে তার বুক একেবারে হুহু করে উঠলো। গঙ্গাতীরে বাবাকে শেষ করে মাকে নিয়ে সে যখন ফিরে এলো—ছোটো ছোটো ভাইবোনেরা কান্না ভরা চোখে ঘিরে দাঁড়ালো তাকে, শীর্ণ বুকে করাঘাত হেনে আপন মৃত্যুকামনায় উচ্চস্বরে রোদন করতে লাগলেন পিসিমা। সুশান্ত আর সময় পেলো না শোক করবার। তার পরিণত চেহারা দায়িত্বের গুরুভারে আরো গম্ভীর হলো।

অসুখের সময় খবর দেওয়া হয়েছিল বৌকে। শরীর খারাপের অজুহাতে সে এতদিন আসেনি, এবার তার বাবাই এলো তাকে সঙ্গে নিয়ে। বিয়ের আটমাস পরে এই আবার স্ত্রীর সঙ্গে সুশান্তর প্রথম মিলন। কিন্তু অত্যন্ত উদভ্রান্ত আর বিমর্ষ অবস্থায় দিন কাটছিলো তার, আড়ালে আবডালে দেখা করবার মতো ইচ্ছা বা অবকাশ কিছুই তার ছিলো না। দুশ্চিন্তার ভারে প্রপীড়িত মন, কী হবে, কী করে চলবে—মাথাটা এক একবার যেন কেমন করে ওঠে। কোথায় গেলো তার আকাশচুম্বী স্বপ্নের জাল বোনা, কে এমন করে ছিঁড়ে এনে ফেললো তাকে এই সংসারের আবর্তে, কিছু ভেবে যেন দিশে করতে পারে না। ভিতরে ভিতরে অতল জলে হাবুডুবু খায়, বাইরের চেহারা প্রশান্তিতে স্থির। সজল চোখে মা তাকিয়ে থাকেন অসহায়ের মতো—পিসিমা বিলাপ করেন—আর ভাইবোনেরা এর মধ্যেই তার উপর নির্ভর করতে আরম্ভ করেছে।

শ্বশুর বললেন, কী করবে ভেবেছো? পরীক্ষাটা তো আর দেওয়া সম্ভব দেখছি না।

না।

তবে?

সুশান্ত মাথা নিচু করে রইলো। মুখ গম্ভীর করে শ্বশুর বললেন, নরেশবাবুর বোঝা উচিত ছিল যে এতগুলো ভার তোমার উপরে ফেলা ঠিক না।

বিস্মিত চোখে শ্বশুরের দিকে তাকালো সুশান্ত। মৃত্যু কি কোনো আইন মানে?

এত ফাইফুটুনি না করলেও চলতো। তার উপরে নির্ভর করেই আমি মেয়ে দিয়েছিলাম,—এখন তো দেখছি ঢাকের বাদ্যির মতো সবই ফাঁকি। এত বড়ো পরিবার ফেলে গেলেন, অথচ খাবার সংস্থান রেখে গেলেন না।

আহত হয়ে সুশান্ত বললো, অত্যন্ত অসময়ে গেলেন তিনি, নইলে—

মৃত্যুর আবার সময় অসময় কী হে। ঈষৎ অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠলেন শ্বশুর, সে যখন খুশিই আসে—সেইজন্যেই তো ব্যবস্থা করতে হয় আগে থেকে।

নিজেকে সংযত রেখে সুশান্ত বললো, তা যখন নেই তখন কী করতে বলেন আপনি ?

সে সব ব্যবস্থা করতেই আমার আসা। মেয়ে দিয়েছি যখন দায়িত্ব অবশ্যই আমার। শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলে এদের সবাইকে তুমি দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দাও—সীতা আমার ওখানেই থাকবে যতদিন সুবিধা না হয়। তুমি নিশ্চয় জানো, আর যাই থাক অর্থাভাব আমার নেই, ইচ্ছা করলে আমার কাপড়ের দোকানেও তুমি বসতে পারো, লগ্নি কারবারের ভারও আমি তোমার হাতে দিতে পারি —আর চাও তো চেষ্টা চরিত্র করে ঘুষঘুষ দিয়ে একটা চাকরিতেও—

বাধা দিয়ে সুশান্ত গম্ভীর গলায় বললো, কী করবো তা আমি নিজেই স্থির করেছি।

জামাইয়ের ঔদ্ধত্যে স্তম্ভিত হলেন ভদ্রলোক। অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন। ততোধিক গম্ভীর হয়ে বললেন, তাহলে তাই করো। আমার এই প্রথম মেয়ে—তোমার অন্নাভাব তাকে আমি ভোগ করতে দেবো না।

বেশ তো, নিয়ে যাবেন তাকে।

বেশ।

দস্তুরমতো একটা বিরোধের আবহাওয়া নেমে এলো শ্বশুর জামাইয়ের মধ্যে। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া চুকে গেলে বৌ ঘরে এলো—এ দু'দিন সে শাশুড়ির ঘরে শুয়েছিলো—আজ তিনি এ ঘরেই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। হারিকেনের মৃদু আলোতে তার আবছা মূর্তির দিকে তাকিয়ে সুশান্ত বললো, এসো। দরজা বন্ধ করে সীতা কাছে এসে বসলো। এই ক'মাস সে অনেক বড়ো হয়েছে মনে হলো সুশান্তর। ষোলো বছরের মেয়েকে যেন বাইশ বছরের যুবতী মনে হয়। একটু চুপ করে থেকে সুশান্ত বললো, ভালো ছিলে ?

ছিলুম।

আবার চুপচাপ। কেউ যেন কোনো কথা খুঁজে পেলো না। অথচ এমনও মনে হলো না যে পরস্পর যেন পরস্পরের অস্তিত্বেই বিহ্বল হয়ে আছে। তারা যেন কতকালের মানুষ—কতকাল এক সঙ্গে বসবাস করতে করতে পুরোনো হয়ে গেছে—অবসন্ন হয়েছে। একটা নিশ্বাস পড়লো সুশান্তর। বললো, এই তো অবস্থা দেখছো, পরীক্ষাটাও দিতে পারলুম না। দুঃখ সইতে হবে তোমাকে।

শ্বশুরমশাই কি টাকাপয়সা কিছুই রেখে যাননি ? এতগুলো লোক কি তোমার ঘাড়েই ?

ষোলো বছরের তরুণী আর বাইশ বছরের যুবকের এই প্রথম দাম্পত্য আলাপ। স্ত্রীর কথায় একটু অবাক হলো সুশান্ত। এ ধরনের কথা সে আশা করেনি। বিছানা থেকে আদ্ধেক উঠে বললো, আমিই তো ওদের সব, কার ঘাড়ে যাবে ?

আমার মা তবে ঠিকই বলেছিলেন।

কী বলেছিলেন ?

খুব সহজ গলায় সীতা বললো, বুড়ো তো শুধু মরেই গেলো না, মেরেও গেলো। সেইজন্যেই তো বাবা এলেন।

বিস্বাদে ভরে গেলো সুশান্তর মন। কথা বলতে ইচ্ছা করলো না—আবার শুয়ে পড়ে সীতা বললো, তুমি আমাকে এত মাসের মধ্যে একটাও চিঠি লেখোনি কেন? সবাই তোমাকে নিন্দে করেছে।

কী বলেছে?

কী আবার বলবে, বলেছে যে কলকাতায় থাকে—কত সব মনভোলানো মেয়ে আছে, তাই আর বৌকে মনে পড়ে না।

কে বলেছে?

সবাই! কেনই বা বলবে না, আমার বয়সী বন্ধুদের বরেরা হপ্তায় দুটো চিঠি লেখে—এমনকি কেউ কেউ রোজও লেখে।

তাই নাকি! তা তোমার বন্ধুরাও বোধহয় রোজ লেখেন।

আমিও তো লিখতুম।

রোজ লিখতে?

রোজ লিখবো কেমন করে, তুমি কি জবাব দিয়েছো?

কিন্তু ও চিঠিও কি তুমি লিখেছো?

সীতার মুখে একটা ছায়া ভেসে উঠলো। একটু কুণ্ঠিত গলায় বললো, বা রে! আমি না লিখলে কে লিখবে?

হ্যাঁ, ঐ মোটা মোটা অক্ষরগুলো নিশ্চয়ই তোমার, কিন্তু চিঠির কথাগুলো বোধহয় তোমার মাব রচনা।

যাঃ!

সত্যি বলো।

সীতা চুপ।

ঠিক বলেছি কিনা—

সীতা তবু চুপ করে রইলো। সুশান্ত চোখে হাত চাপা দিয়েই কথা বলছিলো—সরিয়ে নিয়ে বললো, ওসব প্রাণের দেবতা-টেবতা আর লিখোনা, বুঝলে? একটা মানুষ আবার প্রাণের দেবতা হয় কেমন করে?

এতক্ষণকার চুপ-করা সীতা এবার লাফ দিয়ে উঠে বসলো—বললো, হয় গো, হয়। স্বামী মেয়েমানুষের দেবতা ছাড়া আর কী?

নির্লিপ্ত গলায় সুশান্ত বললো, মেয়েমানুষের বলে না, মেয়েদের বলতে হয়। যাকগে, এবার ঘুমোও তুমি। বিছানা ছেড়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়ালো সে। নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলো আকাশের দিকে। ধীরে ধীরে রাত গভীর হয়ে এলো।

পরের দিন সকালবেলা উঠেই দেখা গেলো শ্বশুর যাবার জন্য প্রস্তুত। কন্যাকে রেখে যাবার ইচ্ছা নেই, কিন্তু অশৌচ। এটা না কাটা পর্যন্ত থাকতেই হবে তাকে। অন্তত পিসিমা সেই অনুরোধই জানালেন। সুশান্ত পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলো। শোনা গেলো, সুশান্ত স্ত্রীকে ভরনপোষণ করবার যোগ্য না হওয়া পর্যন্ত কন্যা তার কাছেই থাকবে। আপাতত মেয়েকে

তিনি রেখে গেলেন বটে, কিন্তু কাজ চুকে গেলেই যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর খরচ বাবদ পিসিমার হাতে একশো টাকার নোটও একখানা রেখে গেছেন। সুশান্তর মাথায় আগুন জ্বলে উঠলো। দুই চোখের দৃষ্টি দিয়ে পিসিমাকে সে দগ্ধ করে দিয়ে একশো টাকার নোটটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেলো তক্ষুনি। মনি-অর্ডারে ফেরৎ পাঠিয়ে শান্ত হলো।

দু' হাজার টাকার একটি লাইফ ইনসিওর ছাড়া নরেনবাবু আর কিছুই রেখে যেতে পারেননি। গেলেনও অসময়ে, তাছাড়া এত বড়ো পরিবার প্রতিপালন করে আর উদ্বৃত্তও থাকতো না কিছু। সুশান্ত মানুষ হবে, বড়ো হবে—এই আশাটাই ছিলো তাঁর জীবনে। সাধ্যের অতিরিক্তও তিনি ব্যয় করেছেন তার পিছনে। পারিবারিক কোনো অস্বাচ্ছন্দ্যই তিনি পছন্দ করতেন না। ছেলেপুলের খাওয়া থেকে শুরু করে জামা কাপড় আবদার সবই তিনি অম্লানবদনে স্বীকার করে নিতেন। স্ত্রীর প্রতিও তাঁর অসীম যত্ন ছিলো। মাঝে মাঝে দিদির মুখ ঝামটা শুনতে হতো বটে কিন্তু তবু তিনি হাত গুটোতে পারেননি। অতএব পিতার বিরাট রিক্ত পরিবার নিয়ে কুড়ি বছরের কাঁচা মাথায় পঞ্চাশ বছরের দায়িত্বে সুশান্ত নীরবে মাথা নিচু করলো সংসারের উদ্যত দণ্ডের তলায়। মনকে সে বেঁধে নিলো শক্ত করে, তারপর শ্রাদ্ধশান্তি চুকিয়ে, সকলের যথারীতি ব্যবস্থা করে ধার-দেনা মিটিয়ে তার হাতে রইলো মোট তিনশোটি টাকা। টাকার দিকে তাকিয়ে মার চোখে ধারা নামলো, নিঃশব্দে তাঁর কাঁধের উপর একখানা হাত রেখে সুশান্ত বললো, আমিই তো আছি মা।

আগের মতোই রইলো সব ব্যবস্থা, দুশো টাকা মার হাতে রেখে একশো টাকা নিয়ে ফিরে এলো সে কলকাতায়। অভ্যস্ত শারীরিক আরাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললো নিজেকে। কতগুলো মুখ হাঁ হয়ে আছে তার দিকে—টাকা চাই, টাকা চাই। এই হলো তার একমাত্র মূলমন্ত্র। যে করেই হোক, করতেই হবে কিছু—নিতেই হবে যে কোনো কাজ—যদি বিনিময়ে পাওয়া যায় অর্থ। প্রতিভা আর বুদ্ধি রইলো পড়ে, উদয়াস্ত ছুটোছুটি করতে লাগলো উদভ্রান্তের মতো। অন্তত মাসের শেষে দুই শো টাকা তো তার দরকার। নিজের স্ত্রী বাবার স্ত্রী, পিসেমশায়ের স্ত্রী—আর একান্ত অসহায় সেই ছোটো ছোটো পাঁচটি ভাইবোন। খরচ কি কম! দিকবিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলো একটি চাকরির সন্ধানে। খাওয়া নেই, ঘুম নেই—দেখতে দেখতে মানুষটি যেন একেবারে বদলে গেলো। মাথার অবিন্যস্ত ঘন চুল পাতলা হয়ে গেলো, ফুটো হলো জামা জুতো—মসৃণ ত্বক ধূসর হলো রুক্ষতায়।

এদিকে মাসতিনেক মা চুপ করে ছিলেন, কিন্তু আর পারলেন না। সকালবেলা ধারের দোকানে চা প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে এসে সুশান্ত একখানা মোটা-সোটা চিঠি পেলো তাঁর। পিসিমা বাতের ব্যথায় শয্যাশায়ী—মালিশ কেনবার পয়সা কই, ছোটো ছেলেটা জ্বরে ধুঁকছে সাত-আটদিন, তার আগে

বড়ো মেয়ে ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগে উঠলো—স্কুলের মাইনে বাকি দু'মাসের—তারা নাম কাটাতে চায়—দোকানী ধার দেয় না, উপরন্তু কথা শোনায়, ইত্যাদি ইত্যাদি—তার উপরে বৌমার মুখভার—এই কষ্ট সে সইতে রাজি নয়, বাপকে সে লিখে দিয়েছে নিয়ে যাবার জন্য। ঝি চাকর তিনি উঠিয়ে দিয়েছেন, ছোটো একটা অল্প ভাড়ার বাড়িও দেখে রেখেছেন—কিন্তু তাহলেও তো—

চিঠিটা ঝাপসা হলো সুশান্তর চোখে। চোখের কোণে দুশ্চিন্তার কালো রেখাটা আরো একটু ঘন হলো। খানিক বসে রইলো চুপ করে—তারপর নিশ্বাস নিয়ে তাকালো সে বাইরের দিকে—সঙ্গে সঙ্গে চোখ তার নিবদ্ধ হলো আকাশের উপর। কী সুন্দর! স্বপ্নে ভারাতুর হয়ে উঠলো চোখ -আশ্চর্য, আকাশ এত নীল, এত সুন্দর—আকাশে এত শান্তি!

কদিন থেকেই একটা প্রাইভেট টিউশনির কথা ভাবছিলো সুশান্ত। ইতিমধ্যে কমাস একটা স্কুলমাস্টারিও করছিলো, কিন্তু মাসের শেষে তা থেকে যে কটা টাকা উপার্জন হয়, তা এতই অকিঞ্চিৎকর যে নানাদিক ভেবে সেটা সে ছেড়ে দিয়েছে। তার চাইতে সে সময়টায় ছবি আঁকলে তার উপার্জন বেশি হবে—অথচ কাজও খানিকটা মনের মতো। খানিকটা এইজন্য যে সব ছবিই তো কোনো না কোনো বিশেষ কাজে ব্যবহৃত হবার জন্য আঁকা। একেবারে মনের মতো আঁকার তার অবসর কই? প্রাইভেট টিউশনি করতে কোথায় যেন তার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয়। বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে ছাত্র পড়ানো বা ছবি আঁকায় তালিম দেওয়া কিছুতেই ভালো লাগে না তার। কিন্তু ভালোমন্দ বা মানসম্মানের তো আর প্রশ্ন নেই তার জীবনে—ঘন-ঘন টাকার তাগাদা আসছে মার কাছ থেকে—ছোটো বাড়িতে গিয়ে, সমস্ত কাজ নিজের হাতে তুলে নিয়ে, ছেলেমেয়েদের জামাজুতো সংক্ষেপ করে, কিছুতেই তো কিছু হচ্ছে না—কেবলি বাড়ছে ধার—এর পরেও কি মান আর সম্মান, ভালো আর মন্দ লাগার প্রশ্ন উঠতে পারে? মন স্থির করে ফেললো সে। কিন্তু এক্ষুনি কিছু টাকা না পেলে যে ভাইবোনদের স্কুলে নাম কাটা যাবে, এ কথা ভেবে সে ব্যাকুল হলো।

কী করি! কী করি! খসখসিয়ে কাগজের বুকে রং লাগাতে বসলো সে। কিছুক্ষণের মধ্যে ডুবলো ভাবনা চিন্তা, মন শান্ত হয়ে এলো—অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় কোনো কষ্ট হলো না। তারপর সূর্য যখন আকাশ পরিক্রমা শেষ করে পশ্চিমের দরজায় থরোথরো, তখন ভাঙলো তার তন্ময়তা। চোখ তুলে তাকালো একবার বেলার দিকে—চোখ ফিরিয়ে ঘরের মেঝেতে নামালো দৃষ্টি—ধামা চাপা আছে মেসের ঠাণ্ডা ভাতের রাশি।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে একবার একটা কথা উঁকি দিলো তার মনে। তার শ্বশুর কি এই দুঃসময়েও কিছু ধার দেবেন না তাকে? অন্তত তাঁর কন্যা! কথাটা মনে হতেই অসম্ভব বলে সুশান্ত অন্য চিন্তায় মন দিলো, কিন্তু ঘুরে ফিরে একটি কথাই বারে বারে গুঞ্জন করতে লাগলো তার মাথায়। যুক্তি খুঁজলো

মনে মনে—কেন দেবেন না,—তিনি না দিন, তাঁর কন্যা তো দেবে? তার হাতেও যথেষ্ট টাকা আছে। আমি প্রতিনিয়ত যে লাঞ্ছনা ভোগ করি, অতে কি তার কোনো অংশ নেই—কোনো বেদনাবোধ নেই? কেন থাকবে না? নিশ্চয়ই থাকবে। ভাবতে ভাবতে উত্তেজনা বোধ করলো সুশান্ত। ভালো ঘুম হলো না সারারাত। পরের দিন ভোরে উঠেও দেখলো সেই একই চিন্তা ঘুরছে তার মাথায়। সারাদিন নানা কাজের ভিড়ে কাটলো। তারপর বিকেলবেলা স্নান করে কাপড় বদলে প্রায় নিজের অজান্তেই সে শেয়ালদা স্টেশনে এসে হাজির হলো। নৈহাটি এমন কিছু দূরের রাস্তা নয় কলকাতা থেকে, কিন্তু বিবাহের পরে শ্বশুরালয়ে এই তার প্রথম যাত্রা। শ্বশুরেরও অবিশ্যি কোনো আহ্বান ছিলো না।

ভিড়ে ভারাক্রান্ত ট্রেন। ডেলি প্যাসেঞ্জারদের ফেরবার সময় এটা। পকেটে হাত দিয়ে একটু চিন্তা করে একখানা থার্ড ক্লাশের টিকিট কিনলো সে। তারপর গুতোগুতি করে উঠে বসলো সেই হাটের মধ্যে। চলতে লাগলো ট্রেন—কলকাতার ইট কাঠ ছাড়িয়ে সবুজ সবুজ পানাভরা ডোবা দেখা দিলো,—দেখা দিলো ঝোপঝাড়। ধানের খেতের আল বেয়ে হাঁটা, বিস্মিত চোখে তাকিয়ে থাকা মানুষ—উলঙ্গ শিশু—ময়লা শাড়িপরা ঘোমটা টানা বধূ—তারপর নামলো অন্ধকার। চলন্ত ট্রেনের জানলার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ নাম না জানা কোনো একটা স্টেশনে নেমে পড়লো সে। তাকে নামিয়ে আধ মিনিটের মধ্যেই হুশহুশ করে যখন আবার ছেড়ে দিলো ট্রেন, একটা নিশ্চিন্ত নিশ্বাস নিয়ে চোখ ফিরিয়ে সে স্টেশনের নামটা পড়তে চেষ্টা করলো, তারপর একটা মালগুদামের পাশে একটা কাঠের বাক্সের উপর বসে রইলো চুপ করে। কখন আবার গাড়ি আসবে কে জানে—তখন সে ফিরতে পারবে—কিংবা পারবেই কিনা—কোনো ভাবনাই তার মনে এলো না। শক্ত কাঠের উপর বসে বসে সে দেখলো আবছা আবছা সন্ধ্যা রাত্রির কালোতে গভীর হয়ে এলো। দূরে রেললাইনের ওপারে জ্বলে উঠলো অগুনতি জোনাকি—ঝিঁঝিঁর ডাকে রাত্রি যেন থমথমে হয়ে উঠলো তখুনি, টিমটিম করে স্টেশনে দুটো আলোও জ্বলছিলো। ট্রেনটি আসবার সময় হঠাৎ যেন কারা ভিড় করছিলো—ট্রেনটা চলে যেতেই আবার তারা মিলিয়ে গেলো কোথায়। কেমন একটা অটল নিস্তব্ধতার শান্তিতে নিজেকে খুঁজে পেলো সুশান্ত, মায়ের চিঠির অশ্রুভরা বেদনা আর তার মনকে বিবশ করে রাখলো না। কোনো দুর্বল মুহূর্তে শ্বশুরের কাছে সাহায্যপ্রার্থনার দাবি, স্বামী দরিদ্র বলে যে স্ত্রী সুখভোগের লিপ্সায় পিত্রালয়ে চলে যায় তার কাছে দুঃখের আবেদন—এ থেকে মুক্তি পেলো সে। নিশ্চিন্ত মনে তাকিয়ে রইলো তারা ভরা আকাশের দিকে।

এর কয়েকদিন পরে ঘরে বসে একটি বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকছিলো সুশান্ত—ভেজানো দরজাটা ঈষৎ ফাঁক করে এক ভদ্রলোক মাথা গলালেন ভিতরে, তারপরেই আনন্দিত কণ্ঠে বলে উঠলেন—এই তো! শব্দ করে

দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে দিয়ে নিজে ঢুকলেন, পিছনে তাকিয়ে বললেন, এসো। সচকিত হয়ে চোখ তুললো সুশান্ত, ভালো করে না তাকিয়েই অবাক হয়ে প্রশ্ন করলে, কে ?

আমি হে, আমি। তুমি কোথায় ডুব মেরেছিলে এতদিন—কত খোঁজ করে—

এইবার সেই কণ্ঠস্বর গিয়ে হাতুড়ির ঘা মারলো সুশান্তর বুকের ভিতর। মাস্টার মশায়! দ্রুতপায়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিচু হয়ে পায়ের উপর হাত রাখলো সে। পিছনে মিসেস চ্যাটার্জির দিকে তাকিয়ে আবেগে চোখ জলে ভরে গেলো।

ডক্টর চ্যাটার্জি বললেন, আজকেই একটি ছাত্রের মুখে খবর পেলাম তুমি এখানে আছো। এই দ্যাখো, ইনিও এলেন তোমাকে দেখতে—তারপর ? ব্যাপার কী বলো তো ?

জবাব দিতে গিয়ে একসঙ্গে এক সমুদ্র কথা ভিড় করে উঠলো তার বুকের মধ্যে। কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা—কোথায় ? কোথায় গেলো সব ? বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ছাত্র—বৈজ্ঞানিক চ্যাটার্জির প্রিয়তম শিষ্য সুশান্ত -কোথায় ? কোথায় সে ? সংসারের নিষ্পেষণে বিচূর্ণ এই যে মানুষটা এতক্ষণ ধরে বিজ্ঞাপনের জন্য চুল এলানো স্তন্যদাত্রী বিগলিত মায়ের ছবিতে রং দিচ্ছিলো, তার সঙ্গে কোথায় তার যোগসূত্র ? খানিকক্ষণ মুখ দিয়ে সে কথা বার করতে পারলো না। কতদিন পরে সে দেখলো এঁদের -এঁদের সস্নেহ মুখশ্রী যেন মুহূর্তে ফিরিয়ে আনলো তার পুরোনো দিন, যে সব দিনের তিলতম স্মৃতিও সে মুছে দিতে চেয়েছিলো মন থেকে, তা যেন একেবারে ঝলমলে হয়ে উঠলো সূর্যালোকের মতো। ব্যস্ত বিব্রত হয়ে দুহাতে খাটের উপরকার রং তুলি বই আবোল তাবোল সব সরিয়ে ফেলে অসহায় গলায় বললো, কোথায় যে বসতে দেবো আপনাদের, এই তো আমার ঘর।

সুন্দর ঘর—সস্নেহে মিসেস চ্যাটার্জি বললেন, তুমি যে বৈজ্ঞানিকের চেয়ে শিল্পী বেশি, তারই প্রমাণ এই ঘর। মৃদুহাস্যে মাথা নিচু করলো সুশান্ত। নানা উপলক্ষ্যে তাকে কত যেতে হয়েছে এঁদের বাড়িতে। এই ভদ্রমহিলার সযত্ন মার্জিত ব্যবহারে কতবার সে মুগ্ধ হয়েছে, কিন্তু তার অদর্শনে তাঁরা যে কখনো এমন করে কাছে আসতে পারেন,—একথা সে কল্পনাও করেনি। নিজের ভাগ্যের জন্য অদৃশ্য দেবতার কাছে সে কৃতজ্ঞতা জানালো। একটু পরে মুখ তুলে বললো, আমার যাওয়া উচিত ছিলো।

ডক্টর চ্যাটার্জি বললেন, আমরা তো ভাবছি হঠাৎ তোমার কী হলো। তোমার বাবার মৃত্যু সংবাদ পেয়েছিলাম—কিন্তু তার জন্য তুমি যে পরীক্ষাটাও দিতে পারবে না তা ভাবিনি। তুমি আমার অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার আশ্রয় ছিলে, তোমার মতো ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র আমি আমার পঁচিশ বছরের শিক্ষকতায় দেখিনি। মিসেস চ্যাটার্জি বললেন, তা ও বছর নাহয় গেছে—পরীক্ষাটা তো তুমি এ বছরও দিতে পারতে।

নিশ্বাস ফেলে সুশান্ত বললো, সে আর হয় না।

কেন ? কী তোমার এমন অসুবিধে। সব তো তোমার প্রস্তুতই ছিলো।

আমি কেমন করে বোঝাবো যে কতগুলি প্রাণী একমাত্র আমাকে নির্ভর করেই বেঁচে আছে। আমার পক্ষে পরীক্ষার কথা এখন স্বপ্ন।

ডক্টর চ্যাটার্জি মাথা নেড়ে বললেন, শুনেছি কিছু কিছু, কিন্তু—

তোমার বাবা কি কিছুই রেখে যাননি ? মিসেস চ্যাটার্জি বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, অন্তত একটা বছরও চলতে পারে এমন কিছু—

অত্যন্ত কুণ্ঠিত গলায় সুশান্ত বললো, অত্যন্ত অসময়ে গেলেন, তা ছাড়া—কথা শেষ না করেই সে চুপ করলো।

একটু চুপ করে রইলো সকলেই। ডক্টর চ্যাটার্জি বললেন, তুমি তো আমার কাছেও থাকতে পারো। এই মেসটা তত ভালো দেখছিনে।

ভালোমন্দ ছেড়ে দিলেও তুমি যদি আমাদের ওখানে গিয়ে থাকো আমরা খুবই খুশি হই। মিসেস চ্যাটার্জির গলায় আন্তরিকতা ফুটে উঠলো।

আমার পক্ষেও তো সেটা কম সৌভাগ্যের নয়, কিন্তু—

কিন্তু কী বাবা— আমি তোমার মায়ের মতো, আমার কাছে তোমার তো সংকোচের কারণ নেই।

ডক্টর চ্যাটার্জি সম্পূর্ণ অনুমোদন করলেন স্ত্রীর কথা। বললেন, তুমি বোধহয় জানো না যে আমার ছেলেটি মাসখানেক যাবৎ বিলেতে গেছে, এঁর মন আর টিঁকছে না বাড়িতে। কদিন থেকে ক্রমাগত তোমার কথা বলছিলেন ইনি। আর ভাবছি ওখানে গেলে হয়তো কিছু কিছু পড়াশুনোও হবে তোমার —আমি তো আছি।

সুশান্ত কী বলবে। এই অযাচিত ভালোবাসার কি কোনো তুলনা আছে ? এখানে কি আত্মসম্মানের প্রশ্ন তুলে এঁদের অসম্মান করবে ? দুএকবার আপত্তি জানিয়েই সে রাজি হতে বাধ্য হোলো। মিসেস চ্যাটার্জি বললেন, আমার মেয়েকে কিন্তু পড়াতে হবে। লেখাপড়ায় সেও খুব ভালো। আই এস সি দিচ্ছে সামনের বছর। একটা যে কিছু বিনিময় করতে পারবে এ কথাটা ভেবে সুশান্ত খুব লাঘব বোধ করলো —খুশি হয়ে বললো, নিশ্চয়ই।

পরের দিনই মেসের পর্ব চুকিয়ে একরাশ তুলি আর ছবির কাগজ বুকে করে উঠে এলো সে চ্যাটার্জির বাড়িতে। মেসের বাচ্চা চাকরটা ছলোছলো চোখে কাছে এসে দাঁড়ালো, বদমেজাজি ঝিটা বিষণ্ণ হয়ে তাকিয়ে রইলো মুখের দিকে, ঠাকুর এসে মুখ নিচু করলো—মমতায় বুক ভরে গেলো সুশান্তর। ব্যাগের মুখ খুলে উপুড় করে ঢেলে দিলো তাদের হাতে—তারপর দ্রুত পায়ে নেমে এলো রাস্তায়।

যাবার সময় সায়েন্স কলেজটার পাশ দিয়ে ইচ্ছে করেই ঘুরে গেলো সে। কত মধুর সকাল, কত বিনিদ্র রাত্রি কেটে গেছে তার এখানে কাজ করতে করতে। সাফল্যের আভায় উদ্ভাসিত চ্যাটার্জির প্রতিভাদীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কত সময় ভক্তিতে শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে উঠেছে তার মন। অনেকদিন পরে বড়ো ভালো লাগলো তার। একটুখানি সময়ের জন্য অভাব অভিযোগ

মুছে গেলো মন থেকে। মিসেস চ্যাটার্জি হাসিমুখে দরজা খুলে দিলেন। তাঁতের আটপৌরে শাড়ি আর ব্লাউজে যেন তাঁকে আরো কাছের মানুষ বলে মনে হলো আজ। তাঁর পিছনে পিছনে তাঁর মেয়েও এসে দাঁড়ালো। এর আগে যতদিন সে এসেছে, এসেছে অতিথির মতো। আর আজ এলো সে ঘরের ছেলে হয়ে। তাই মামেয়ের যুক্ত অভ্যর্থনা নিতান্ত আপনজনের মতো অভিনন্দিত করলো তাকে। চকিতে একবার মেয়েটির দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলে। মিসেস চ্যাটার্জি বললেন, উনি এতক্ষণ তোমার আশায় থেকে এইমাত্র বেরুলেন একটু। এসো। কণা, যা তো বাবা, হরিকে পাঠিয়ে দে, ওর জিনিসগুলো তুলে নিক।

কৌতূহলী হয়ে কণা বললো, ঐ ইজেলটা কার? আপনি ছবি আঁকেন?

জানিসনে?—মিসেস চ্যাটার্জি জবাব দিলেন—ওর হাত অত্যন্ত ভালো। সেদিন তো ডক্টর রায় ওর কথাই বলছিলেন। নানা কাগজেই তো আজকাল ওর ছবি বেরুচ্ছে।

মজা তো—। অত্যন্ত ছেলেমানুষের মতো কণা বললো, আমি বেশ শিখতে পারবো আপনার কাছে।

যতটুকু পারি নিশ্চয়ই আপনাকে শেখাবো। মৃদু হেসে বিনীত গলায় বললো সুশান্ত।

হবি এলো। অতি সামান্য জিনিস। তুলে নিতে সময় লাগলো না। মিসেস চ্যাটার্জির নির্দেশমতো সে এবার তার জন্য নির্ধারিত ঘরটিতে গিয়ে নিঃসঙ্গ হবার সুযোগ পেলো।

এখনো, এত বছর পরেও সুশান্তর মনে পড়ে তাঁদের কথা। মিসেস চ্যাটার্জির সস্নেহ সযত্ন নিখুঁত ব্যবহার, ডক্টরের শুভকামনা। তাঁদের বলা-কওয়াব ভঙ্গি, এমনকি তাঁদের কণ্ঠস্বরও যেন শুনতে পায় সে। অথচ তাদের মেয়েটি—মেয়েটিকে কী জানি কেন কিছুতেই মনে পড়ে না আর—তার ব্যবহারটা পর্যন্ত আজ আবছা হয়ে এসেছে সুশান্তর কাছে। কিন্তু সেই সময়ে কত কাছে এসেছিলো সে, কত দুঃখ পেয়েছিলো সে সুশান্তব জন্য। দুঃখের উপলক্ষ্য হলেও তার নিজের তো কোনো দোষ ছিলো না। মন দিয়ে পড়িয়েছে তাকে, ছবি আঁকা শিখিয়েছে, তার পরীক্ষাব সময় অক্লান্ত পরিশ্রম করে নিজের শরীর পর্যন্ত খারাপ করে ফেলেছিলো। কিন্তু তার মধ্যে কৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু কি ছিলো? এমন কী কিছু ছিলো যাতে কণা তিলমাত্রও ভুল বোঝার অবকাশ পায়? অথচ কোনো একদিন হঠাৎ সে অনুভব করলো কণা তাকে ভালোবেসেছে। যেন একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেছে সে। কেমন অগোছালো হাবভাব, চলাফেরার মধ্যে যেন কেমন একটা বেদনার ছায়া, আগের মতো কথা বলে না, তার সঙ্গে চোখাচোখি হলে নিঃশব্দে চোখ নামিয়ে নেয়। মেলামেশার সেই সহজ ভঙ্গি কে যেন শুষে নিয়েছে তার ভিতর থেকে।

অত্যন্ত বিপর্যস্ত ছিলো সেদিন সুশান্তর মন। মার চিঠি এসেছে, বাবার বাৎসরিক কাজের জন্য কিছু টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন তিনি। তাছাড়া

অন্যান অভাবের বিবরণও লিপিবদ্ধ আছে। উপরন্তু তার শ্বশুরের লেখা একখানা চিঠি। পিসিমা এ সময় বৌকে আনাবার কথা লিখেছিলেন, না এলে ভালো দেখায় না—তারই জবাব। চিঠিখানার ভাষা সুখশ্রাব্য নয়, এবং তার ভিতরে জামাইয়ের প্রতি যে-মনোভাব তিনি প্রকাশ করেছেন তাও অসহ্য, কিন্তু সব চাইতে অসহ্য তাঁর অভদ্র ইঙ্গিত তাদের দারিদ্র্য নিয়ে, তার মৃত বাবার উদ্দেশে অপমান জানিয়ে। পিসিমা কিছু অর্থসাহায্য চেয়েছিলেন হয়তো, তারও জবাব আছে পুনশ্চ দিয়ে, আমার এত অর্থ নেই যাতে কাউকে সাহায্য করতে পারি—তাছাড়া এটা আমি নীতিবহির্ভূত বলেই মনে করি, কেননা অযোগ্যকে সাহায্য করা মানেই তাকে প্রশ্রয় দেওয়া। সুশান্ত যদি আমার এখানে এসে থাকে আমি আমার কাপড়ের কারবারে তাকে বসিয়ে দিতে পারি—মাইনে পাবে—খাওয়া-দাওয়ার খরচ লাগবে না—

ক্ষোভে, অপমানে, সুশান্তর সর্বশরীর জ্বলে গেলো, পিসিমার উপরেই তার রাগ হলো বেশি। এই ভদ্রমহিলাই তো ডেকে আনলেন এত বড়ো অপমান—আর এঁর জন্যই তো সুশান্ত বাধ্য হয়েছিলো বিয়ে করতে। চিঠিটা হাতের মুঠোয় পাকাতে পাকাতে ছিঁড়ে ফেললো, একটা অসহ্য উত্তেজনায় পায়চারী করতে লাগলো সারা ঘরে। এক সময় লক্ষ্য করে দেখলো, কখন কণা এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দরজা ধরে—অত্যন্ত শুকনো মুখ—বিষাদে বিবর্ণ চেহারা। নিজের উত্তেজনাকে তক্ষুনি সংযত করে হাসিমুখে বললো, আসুন, আমি ভুলেই গিয়েছিলুম আজ আমাদের ছবি আঁকার দিন।

কণা নড়লো না সেখান থেকে, একটি কথা বললো না—একবার কেবল চোখ তুললো—সুশান্ত দেখলো সে চোখ জলে ভরা।

কী হয়েছে? কোনো অসুখ করেনি তো?

না।

তবে?

কী তবে?

আপনাকে কেমন শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে। তাছাড়া ক'দিন থেকে—

আমার কিছু হয়নি—গলার স্বর ভাঙা ভাঙা, এগিয়ে এসে দাঁড়ালো সে।

সুশান্ত একটু চুপ করে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। তারপর বললো, পাঁচ মাস হয়ে গেলো এখাসে আছি, কেবল তো আপনাদের যত্ন নয়, আপনাদের সঙ্গসুখেও যে আমি কত সুখী, কত কৃতজ্ঞ—

আপনি কি কেবল কৃতজ্ঞ হতেই জানেন, আপনার মনে কি আর কিছুই নেই? কথা বলতে বলতে থরথর করে কাঁপছিলো কণার গলা।

সুশান্ত অবাক হয়ে বললো, এ কথা বলছেন কেন?

কেন? কণা দু'হাতে মুখ ঢাকলো নিচু হয়ে—দু'পাশ থেকে ভিজে ভিজে কালো চুল ছড়িয়ে পড়লো বুকের উপর। সুশান্ত স্তব্ধ হলো। নির্জন দুপুর, নিরালা ঘর—বুকের মধ্যে যেন কেমন ছমছম করে উঠলো তার। মুহূর্তকাল থমকে রইলো, তারপর বললো, বুঝেছি।

কিছুই বোঝেননি, কিছুই বোঝেননি আপনি—

সস্নেহে কণার মাথার উপর একখানা হাত রেখে খুব শান্ত স্বরে সুশান্ত বললো, আপনি তো জানেন আমি বিবাহিত।

জানি।

তবে?

এও জানি যে স্ত্রীর সঙ্গে আপনার সংশ্রব শিথিল।

কিন্তু কর্তব্য?

জীবনে কি কেবল কর্তব্যটাই বড়ো? হৃদয়ের কি কোনোই মূল্য নেই?

হৃদয়বৃত্তিটা একটু যদি কম থাকতো আমার তাহলে আমি যে বেঁচে যেতাম। কিন্তু এ আপনি কী করলেন? কেন এই অযোগ্যকে এতখানি সম্মান দিলেন?

অযোগ্য! তুমি অযোগ্য! হায়রে! কণার কান্নাভরা মুখে একটা হাসির রেখা ফুটে উঠলো। জলে-ভেজা মুখ আর গালের উপর উড়ে-পড়া ছোটো ছোটো চুল মিশে গেলো সেই হাসির সঙ্গে। সুশান্তর শিল্পী মন আর চোখ হঠাৎ স্থির হলো সেখানে, ক্ষণেকের জন্য একটা তীব্র ইচ্ছা তাকে আত্মবিস্মৃত করলো, ধীরে ধীরে মুখ নিচু করলো সে কণার মুখের উপর। কিন্তু পরমুহূর্তেই দ্রুত সরে দাঁড়ালো, ধিক্কার দিলো নিজের অসংযমকে, তারপর ঘর ছেড়ে চলে যেতে যেতে বললো, আপনি শান্ত হোন, আমি আসছি। তারপর দু'দিন পর্যন্ত ভারি উদভ্রান্ত হয়ে রইলো সুশান্ত। কী যে করবে, কী যে করা উচিত কিছুই ভেবে পেলো না। এতদিনের অত ঘনিষ্ঠ পরিবেশ, অত সুযোগ সুবিধের মধ্যেও এ ভুল তো আর কখনো হয়নি। কণা আশা করেছে, অভিমান করেছে—অনেক কথা যা কোনোদিন সুশান্ত ভাবেনি, আজকের কণাকে দেখে সেসব কথা স্পষ্ট হয়ে উঠলো তার মনে—কতদিন কণার চোখে একটা তীব্র বেদনার ছায়া ছড়িয়ে পড়তে দেখেছে সে, অথচ কেন, সে প্রশ্ন কোনোদিন মনে ওঠেনি তার। দৈহিক সংস্পর্শ সম্বন্ধে আসলে সে অচেতন। কেন অচেতন? কেন তার ভালো লাগে না এ সব? এ প্রশ্ন সে নিজেকেই অনেকবার করলো—তারপর তৃতীয় দিন রাত্রির কোনো এক মুহূর্তে বেরিয়ে এলো রাস্তায়। ডক্টর চ্যাটার্জির সৌম্য প্রশান্ত মূর্তিকে স্মরণ করলো মনে মনে—মিসেস চ্যাটার্জিকে অনুচ্চারিত গলায় দু'বার মা বলে ডাকলো—অসংখ্য প্রণাম রাখলো তাঁদের জন্যে—পড়ে রইলো বিছানা, বালিশ, বাক্স—কেবলমাত্র রং তুলি আর প্রায় শূন্য মানিব্যাগটি তুলে নিয়ে কোনো এক নিরুদ্দেশ যাত্রায় পা বাড়ালো চোরের মতো নিঃশব্দে।

সে আজ কোন যুগের কথা—মনেও পড়ে না ভালো করে। দশ বছরের পলিমাটি পড়েছে স্মৃতির উপরে। কত ফুটপাথ আর পার্কের বেঞ্চি—সারা রাত জেগে পোস্টারে রং লাগানো—বিনিদ্র রাত্রির পরে কত স্নিগ্ধ সকাল আর সকালবেলার রাজপথে কত মানুষের বিচিত্র মিছিল, কত দৃশ্যের পুনরুক্তি—ছবির মতো ভেসে ভেসে ওঠে আজ। শিখদের মোটা রুটি আর

মাটির গেলাসে করে কালো রংয়ের চা। কচি কচি ভাইবোনেদের বিষণ্ণ বিবর্ণ চেহারা, মায়ের ব্যথিত মুখচ্ছবি, দরিদ্র স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অনাসক্তি—কিছুই কি ভুলে যাবার? কিন্তু কে তার সাক্ষী? সেই সুদীর্ঘ বছরের পর বছর পুঞ্জীভূত বেদনার ইতিহাস আজ কে মনে রেখেছে? ভাইবোন স্ত্রী? মা? কে? মেয়ের বিয়ের সময় মা বলেছেন, গরিবের ঘরে বাব মেয়ে দেবো না—হোকগে ভালো পাত্র। গরিবদের মন বড়ো নিচু। সুশান্তর মন কি নিচু ছিলো? কাকে জিজ্ঞাসা করবে সে কথা? পিসিমা দেখে যাননি এই সমৃদ্ধি, তিনিই ছিলেন জ্বলন্ত সাক্ষী, তিনি নেই। বুড়ো বয়সের অনেক লোভ আর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তিনি মরেছেন। আজো কোনো ভালো জিনিস খেতে গেলেই তার পিসিমাকে মনে পড়ে, চোখ জলে ভরে যায়।

আজ স্ত্রী ফিরে এসেছেন তাঁর ধনী স্বামীর উপর স্ত্রীত্বের সকল অধিকারের দাবি নিয়ে কর্তব্য করতে, প্রচুর স্বাচ্ছন্দ্যের হাওয়ায় ভাইদের শরীর মসৃণ—বোনেরা বড়ো বড়ো ঘরের বৌ, মা বুড়ো হয়েছেন, তাঁর তিলতম ইচ্ছাটিও অপূর্ণ রাখে না সুশান্ত। কিন্তু তার নিজের? এই যে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত নিজের সকল অস্তিত্বের বিনিময়ে এত স্বাচ্ছন্দ্য এনেছে সে সকলের জন্য, সে কথা কি কেউ একবার চিন্তা করে? তার এই বঞ্চিত বিড়ম্বিত জীবনেও যে কোনো চাহিদা আছে, কেউ কি মনে করে সে কথা? সে নিজেও কি মনে রেখেছিলো এতদিন? ঘুম ভেঙে উঠে সকলের সব চাহিদা মাথায় নিয়ে কাজে ঢুকতো, আর ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে ফিরে আসতো আলো জ্বললে। মাঝে মাঝে কোন এক অনির্দেশ্য ব্যথায় বুকটা যেন কেমন করে উঠতো—কিন্তু সে তো ক্ষণিক। জীবনের এই মধ্যাহ্নে এসে সকল ইচ্ছাকেই সে ভুলে যেতে পেরেছিলো। উঠতে হবে, দাঁড়াতে হবে দারিদ্র্যের সমস্ত লাঞ্ছনার উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে হবে, এই মন্ত্রটিই ছিলো তার যৌবনের সাধনা—সুখ দুঃখের সকল চেতনাকে সবলে উৎপাটিত করেছিলো হৃদয় থেকে। অভাব যে কী ভয়ংকর, গরিব হয়ে বেঁচে থাকা যে কত দুঃখের, সংসার যে কত নিষ্ঠুর—তার তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন মন প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত প্রতিপলে তা অনুভব করেছে—আর আজ? নিয়েছে তার যোগ্য প্রতিশোধ! তার সম্মান, তার প্রতিপত্তি—তার প্রতি সকলের অহেতুক মনোযোগ—সব সে আদায় করে নিয়েছে কড়ায়-ক্রান্তিতে। কিন্তু তবু তৃপ্তি কই? তার মন কি এই চেয়েছিলো? মাঝে মাঝে কাজ করতে করতে আকাশটা চোখে পড়ে, মন উধাও হয়ে যায়। কী যেন সে পায়নি কী যেন পাবার ইচ্ছায় আকণ্ঠ তৃষ্ণায় ছটফট করে। নিতান্ত সাধারণ মানুষের মতোই তার সেই চাওয়া, কিন্তু হাত বাড়ালে দেখে সেই সামান্য পাওনাটুকুও তার জন্য কেউ সঞ্চয় করে রাখেনি।

ছবি আঁকারই কাজ করে সুশান্ত। কিন্তু সে বিজ্ঞাপনের ছবি। হাজার টাকা পায় বিজ্ঞাপনের আপিসে, তাছাড়া প্রয়োগশিল্পে তার মতো ওস্তাদ

আজ ভারতবর্ষে ক'জন? আজকের দিনে সারা ভারতবর্ষে এমন কোন বিশেষ বাড়ি আছে, যার মধ্যে সুশান্তর মাথা এক ঘণ্টার জন্য নিবিষ্ট হলেও তিলমাত্র দ্বিধা না করে তারা মুঠো মুঠো টাকা বার করে দিতে না পারে? তার মতো রঙের সমাবেশ আনতে পারে ক'জন? তার প্রতিভার দাম সে অর্থের বিনিময়ে বিকিয়ে দিয়েছে। টাকা! টাকা! কত চাই? দুহাতে আনবো, ছড়াবো, ছিটোবো,—আর হৃদয় হবে সেই টাকারই স্তূপের মতো ঠাণ্ডা আর শক্ত। এতদিনে নিবে এসেছে তার উত্তাপ, সে এবারে ঠিক মরেছে, বিক্রীত হয়েছে তার অশান্ত আত্মা এই পার্থিব সংসারের মোটা মোটা টাকার অঙ্কে। জীবনের উপর এই তো তার চরম প্রতিশোধ। নাও, নাও, হে সংসার! কত নেবে নাও—রাশি রাশি দিয়ে পূরণ করো তোমার গহ্বর। আর্থিক উন্নতির চরম শিখরে উঠে হৃদয়ের সকল সূক্ষ্ম অনুভূতিকে টিপে টিপে মারলো সে। এই কিছুকাল আগেও যে নিজেকে নিঃসঙ্গ ভেবে একটা দুর্জয় অভিমানবোধ ছিলো তার মনে, সেটা সে মুছে ফেলতে পারলো এতদিনে। মনকে বোঝালো, এই তার জীবন। সকল প্রবৃত্তিকে পোষ মানালো কুকুরের মতো। আকাশে মেঘ করলে কে তাকায়? পূর্ণিমার রাত্রিতে আর কার হৃদয়ে সমুদ্রের জোয়ার নামে? বর্ষায় আর বসন্তে যদি রসের প্লাবন নামে ধরণীতে, তাতে তার আমন্ত্রণ নেই। সে-মানুষ হারিয়ে গেছে।

আসলে জীবনেব সুখদুঃখের সকল চেতনাই আজ তার কাজে লুপ্ত। বদ্ধ জলের মতো গতিহীন আর স্থির তার মন। বিরক্তি নেই, আসক্তি নেই, দুঃখ নেই, সুখ শান্তি কিছু নেই। তার মনের সকল প্রবৃত্তিকেই জয় করে এতদিনে নিরুদ্বেগ হয়েছিলো সে। স্ত্রীর সঙ্গে শিথিল সম্পর্ক শিথিলতর হয়েছে, স্ত্রীর আসক্তি টাকায়—নাও! যত খুশি নাও!—তার ঈর্ষার বিষে সমস্ত সংসারে অশান্তির আগুন জ্বলেছে, জ্বলুক। ভাইয়েদের বিয়ে হয়েছে, ছেলেপুলে হয়েছে। সীতা বরদাস্ত করতে পাবে না এত লোকের ভিড়—হও আলাদা—সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম, অর্থ—যা তুমি চাও, তাই নাও। ভাইয়েদের বড়োমানুষি অভ্যাস, নিজেদের উপার্জনে তা পোষায় না—গহ্বর পূরণ করে সুশান্ত। কেবল মা মাঝে মাঝে পুরোনো দিনের মতো বিষণ্ণ চোখে কাছে দাঁড়ান—মেনে নিতে পারেন না বৌয়ের কর্তৃত্ব, ছেলেদের স্বেচ্ছাচারিতা—তাকে বঞ্চিত রেখে নিজেদের প্রাচুর্য—দাঁত দিয়ে তখন ঠোঁট কামড়ায় সুশান্ত—এই স্নেহের ছোঁওয়ায় একটা দোলা লাগে হৃদয়ের মধ্যে—তার পরেই জলের উপর একটি ভাসমান যন্ত্রের মতো আবার সে নিজেকে ভাসিয়ে দেয় সদম্ভে। কিন্তু সব স্থৈর্য আর এতদিনের অর্জিত সকল শান্তি যেন কে হরণ করে নিলো, হঠাৎ কে যেন তাকে আবার স্বপ্ন দেখালো সীমাহীন আকাশের। জীবনের এক অপূর্ব মাধুর্য আবার কে উপলব্ধি করালো নতুন করে। এত ফুল, এত গন্ধ, এত রূপ, এত রস—কে আবার তাকে নিমগ্ন করলো তার মধ্যে। সব তো মুছে গিয়েছিলো, আবার কেন ঘুম ভাঙলো—আবার কেন ঝংকৃত হয়ে উঠলো হৃদয়ের সকল তন্ত্রী—কেন

বেজে উঠলো দুর্নিবার সুরের আঘাতে। এ যে বন্যা—এ যে বন্যা। সুশান্ত একেবারে ছটফটিয়ে দিশেহারার মতো দিন কাটাতে লাগলো।

কত মেয়ের পদক্ষেপে তার জীবন কতবার পুষ্পিত হয়েছে, কত মেয়ের চোখের জল তাকে বিচলিত করেছে, তাকে কেন্দ্র করে চলেছে কত পরিভ্রমণ, আর কী নির্লিপ্ততায় সে তা পরিত্যাগ করেছে অনায়াসে—কিন্তু আজ এ কী হলো তার। জীবনের মধ্যাহ্নে এসে কার দেখা পেলো। ঐ স্তব্ধ সমুদ্রে কেন এলো এই প্রচণ্ড জোয়ার। মন লাগে না কাজে, কখন কত অসতর্ক মুহূর্তে মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করে তাঁর নাম—আর অদ্ভুত মধুর এক তীব্র উপলব্ধিতে সারা দেহ-মন অসাড় হয়ে যায়।

এমন মানুষকে যে এমন করে জাগালো, সমস্ত জীবনের সব অতৃপ্তিতে যে ঢেলে দিলো এত মধু, যা জানতো না অথচ চাইতো, সেই চাওয়াকে যে রূপ দিলো, সে কে—কোথায় তার বাসা, কেমন সে দেখতে, এসব প্রশ্নই অবান্তর। তিনি তিনিই। তিনি অদ্বিতীয়, তিনি একমাত্র। তার সমস্ত তৃষিত অন্তরাত্মার একমাত্র অধীশ্বরী তিনি। এ ছাড়া তাঁর অন্য কোনো পরিচয় নেই।

তাঁর সঙ্গে দেখা হবার পরে বুকের মধ্যে যেন ভালোবাসার একটা দুরন্ত স্রোত ওঠা-পড়া করতে লাগলো দিনরাত্রি। নিজেকে সম্পূর্ণ উজাড় করে দিয়েও তার মনে হলো নেই, নেই—কিছু নেই—কিছু নেই দেবার। ঈশ্বর, দাও, আরো দাও, আরো দাও, প্রভু—বুকের উপর দুটি হাত যুক্ত করে রাত্রিতে শুয়ে শুয়ে সুশান্ত এই প্রার্থনা করলো মনে মনে।

অবশ্য এই বিহ্বলতা কাটিয়ে ওঠবাব অনেক চেষ্টা করেছিলো সে—কিন্তু দৈবের কাছে মানুষের হার চিরকাল চলে এসেছে, তা নইলে সঞ্চিত সকল শক্তি কেন গেলো ভেসে? কেন অনিবার্য হয়ে উঠলো এই ভালোবাসার আবেগ? একটু দেখা, শুধু দুটি চোখ দিয়ে তাঁকে একটুখানি দেখতে পাওয়া—এ যে তার জীবনে কী, তার ব্যর্থ বিরস কর্মময় জীবনে কতখানি, এ কথা কাকে বোঝাবে সে। নিজের কাছেই নিজেকে যেন নতুন লাগলো। দীর্ঘদিন ধবে সংসারের কত ভার সে নিঃশব্দে একা একা বহন করেছে, কত ইচ্ছা সে অনায়াসে মিশে যেতে দিয়েছে মনের মধ্যে, কত দুঃখ ব্যথার জগদ্দল পাথর আজো তো বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা তুলে কত দিন কত মুহূর্তকে দ্বিখণ্ডিত করে দেয়। তবে? উত্তর নেই এ প্রশ্নের।

সুশান্ত সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলো এখানে, দিনগুলো কাটতে লাগলো একটা মূর্ছার মতো, জীবনে শুরু হলো এক নতুন অধ্যায়। সমস্ত দিন কাজ, আর কাজের শেষে ক্লান্ত দেহ-মনে বাড়ি ফেরা—এ ছাড়া অন্য প্রয়োজন যার নিবে গিয়েছিলো, সে যেন জ্বলে উঠলো সূর্যের মতো। প্রদীপেব পোড়া সলতের মতো তার শুকনো বুক আবার স্নিগ্ধ হয়ে উঠলো তেলের প্রাচুর্যে। জীবনে এলো ছুটির প্রয়োজন। আপিস থেকে শিগগির কবে বাড়ি ফেরার তাড়া দেখা দিলো—এমনকি সুযোগ মতো কামাই করতেও সে দ্বিধা করলো না। সমস্ত দিনের কর্মক্লান্ত শরীরে বাড়ি ফেরার যে একটা

ব্যাকুলতা, জীবনে যেন এই সে প্রথম উপলব্ধি করে রোমাঞ্চিত হতে লাগলো। এ যে কী, কত যে আনন্দ, তা কি আর কোনোদিন জেনেছিলো? যদিও এ বাড়ি তার নয়, এ বাড়ির যিনি রচয়িতা তিনিও তার কেউ নন—তবু সে-চিন্তা তাকে স্পর্শ করলো না—তাঁকে যে দেখবে, শ্রবণ ভরে যে শুনবে তাঁর কোমল কণ্ঠস্বর, প্রসন্ন অভ্যর্থনার আলো নিয়ে তিনি যে আসবেন দ্রুত পায়ে এগিয়ে—এ চিন্তাই তাকে সকল কিছুর অতীত করে রাখলো।

শৈশবে পিসিমার আদেশে বাড়ি ফিরতো, সেচ্ছায় নয়। সন্ধ্যাবেলা সূর্য যখন এইমাত্র ডুবলো—সমস্ত আকাশে যখন রাত্রির একটা আশ্চর্য কালো ছায়া বিস্তৃত হয়ে পড়লো—সেই সময়টায়, সেই সন্ধিক্ষণটায় তার ইচ্ছা করতো না বাড়ি ফিরতে। চারটি দেয়ালে আবদ্ধ ঐ ছোটো ঘরটিতে বসে পাঠ্যপুস্তকের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে গিয়ে কতদিন ঝাপসা হয়ে এসেছে চোখ, একদিনও বাইরের সেই অস্পষ্ট আকাশকে দু'চোখ ভরে সে দেখে নিতে পারেনি। ঘরে বসেই সন্ধ্যায় কেমন একটা গন্ধ সে অনুভব করেছে, অথচ প্রাণশক্তিকে আবদ্ধ রাখতে হয়েছে লণ্ঠনের সেই কেরোসিনের কটু গন্ধে। চরিত্র খারাপ হবে, এই ছিলো পিসিমার ভয়। সূর্যালোক যেন চরিত্রের সতর্ক প্রহরী, আর রাত্রি যেন অধঃপতনের পিছল পথ। কিন্তু মনে মনে যতই কষ্ট পাক, পিসিমাকে অস্বীকার করার মতো মনের জোর তার ছিলো না। তারপর পিতাব মৃত্যুর পরে যে স্বাধীনতা সে পেলো, তাতে বাড়িতে কিসের একটা ভয়াবহ অনুভূতিই তাকে বিরত করেছে। যতক্ষণ বাইরে থেকেছে ততক্ষণই শান্তি। অতগুলি ক্ষুধিত মুখের কাছে রিক্ত হস্তে দাঁড়াতে তার ভয় করতো, সারা বাড়িময় যেন একটা দারিদ্র্যের ফিসফিসানি—তাকে দেখলেই যেন তারা কথা কয়ে উঠতো। তার উপর ছিলো সকলের কেমন একটা অবোধ অহেতুক দাবি—দেবে না কেন, কেন করবে না, বড়ো হয়েছিলো কেন—মা পর্যন্ত কতদিন তাকে অযোগ্য বলেছেন, তাকে শুনিয়ে, অন্য ছেলেদের বাপ নেই বলে তাদের দুরবস্থা বুঝিয়েছেন, কিন্তু তারও যে পিতার অভাবেই সকল ভবিষ্যৎ মুহূর্তে চূর্ণ হয়ে গেছে সে কথা কেউ মনে করেনি। সকলেব সব নির্ভরতা শেষ পর্যন্ত যেন কেমন একটা নিষ্ঠুর দাবিতে গিয়ে পর্যবসিত হয়েছিলো। কাজেই বাড়ি ফেরার জন্য যে কোনো ব্যাকুলতা আসতে পারে সেটা ছিলো তার স্বপ্ন। তারপর দারিদ্র্যের নাগপাশ এড়িয়ে যখন একটু শান্তির আভাস দেখা দিয়েছিলো জীবনে, মার বিষণ্ণ ব্যথিত চোখে একটা আনন্দের আভা ঝিলিক দিয়ে উঠেছিলো—ভাইবোনেদের জড়িয়ে আস্তে আস্তে গড়ে উঠছিলো এক নতুন জগৎ, এমন দিনেই এলেন স্ত্রী, দারিদ্র্যের অংশ এরা যতই ভোগ করে থাক, ধনের অংশে অংশীদার তো একমাত্র তিনি। হাস্যমুখে সে কথাটি নিবেদন করে শ্বশুর স্বয়ং এলেন কন্যাকে রাখতে। সংসারে আবার নামলো কালো ছায়া—অভাবের দিনের প্রচ্ছন্ন স্নেহ আবার মার মনে উচ্ছল হয়ে উঠেছিলো, স্বাচ্ছন্দ্যের শান্তিতে ভাইবোনদের শীর্ণ শরীর মন উজ্জীবিত হয়েছিলো দাদাকে ঘিরে—কিন্তু স্ত্রী এসে আবার নিঃশেষে মুছে দিলেন সেই

শান্তি। স্বামী যে তার—তার বরাতের জোরেই যে আজ সকলে খেতে পাচ্ছে, সে কথাটা তার মূঢ় মনের উপর পিতা-মাতা খুব ভালোভাবেই ছাপ দিয়েছিলেন—সেটা সে ভালো করেই সকলকে উপলব্ধি করালো।—এই তো তার বাড়ি ফেরার ইতিহাস।

বন্ধুবান্ধব আত্মীয়সমাজ সব থেকেই নিজেকে সে একেবারে নির্বাসিত করে রেখেছিলো, দুঃখের দিনে এদের চিনে নেবার অবকাশ হয়েছিলো তার। কোনো প্রবৃত্তি ছিলো না আর সঙ্গলাভের, কিন্তু জীবনের প্রায় প্রান্তে এসে মরুভূমির মধ্যে এ কী উদ্যান আবিষ্কার করলো সে?

কিন্তু ভালোবাসাও যত, দুঃখটাও কি ততই তীব্র নয়? প্রথমটায় এ সত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণই অচেতন ছিলো তার মন, মনের মধ্যে এ কথাটাই তখন বড়ো ছিলো—এই তো যথেষ্ট, এই যে তাঁকে দেখতে পেলাম, ভালোবাসলাম, যা চেয়েছিলাম সারা জীবন ধরে, মূর্তিমতী হয়ে সে যে দেখা দিলো, এই কি যথেষ্ট নয়? এমন মধুর, এমন উজ্জ্বল—হৃদয়বৃত্তিতে এমন যিনি পরিপূর্ণ তাঁর কাছে তো নিজেকে বিকিয়ে দিয়েই সুখ। কী তিনি দিলেন, কী হবে তার হিসাব নিকাশে। সূর্যের উত্তাপে ফুল ফোটে, পরিপূর্ণ চাঁদ সমুদ্রে জোয়ার আনে—তিনিও তাঁর সংস্পর্শ দিয়ে বিকশিত করলেন আমাকে—আমার প্রাণ প্রাচুর্যের উৎস হয়ে রইলেন। কিন্তু ক্রমশ মন যেন হাত পাততে চাইলো বিনিময়ের আশায়। কিছুকাল পরে সুশান্ত স্পষ্ট বুঝতে পারলো, যা মানুষের প্রতি নিশ্বাসের কামনার ধন, তাকে পাওয়া ঠিক এ ভাবে পাওয়া নয়। যৌবনে এই বন্ধুতাই ছিলো তার আদর্শ—মেয়েরা যখন তাকে অন্য ভাবে পেতে চেয়েছে তার অবাক লেগেছে, কিন্তু এতদিনে সে বিশ্বাস করলো সত্যিই সে-পাওয়া পাওয়া নয়, যাকে সত্যি করে চাওয়া যায়, তাকে আরো চাই, আরো নিবিড় করে চাই, সমস্ত দেহ-মন দিয়েই আমরা তাকে প্রার্থনা করি—এবং সুশান্তর দেহমনের এই যে একাগ্র শুচিতা—এ কি সে এই পাওয়াটির জন্যই এতদিন রক্ষা করে এসেছিলো? তার হৃদয় সর্বতোভাবে যা গ্রহণ করতে পারে, তা কি কেবলমাত্র এই মেয়েব মধ্যেই নিবদ্ধ নয়? যাঁকে একটু ছুঁতে পারলেও সমস্ত জীবন মন শান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারতো, সে মানুষ কি একমাত্র তিনিই নন? আস্তে আস্তে এই চেতনা তাকে কেমন একটা অশান্তিতে নিয়ে আসতে লাগলো। কেমন একটা ব্যর্থ ব্যাকুল কান্নার ঢেউ যেন ক্রমাগত গড়িয়ে গড়িয়ে ওঠা নামা করতে লাগলো তার বুকের মধ্যে।

আর তিনি? তিনি তাঁর পরিবেশে শান্ত সমাহিত। তাঁর আকাঙ্ক্ষা আছে, লোভ নেই, চাইবার আছে, না পাবার বেদনা নেই। সকলের প্রাণকেন্দ্র হয়ে আপন হৃদয়ের মহিমাতেই তিনি মহান। তাঁর বন্ধুতার নিবিড় উত্তাপে এই যে তিনি সুশান্তকে পূর্ণ করে রাখছিলেন, এও তাঁর প্রশস্ত প্রশান্ত হৃদয়েরই একটা প্রকাশ। তিনি কি জানেন না, তিনি কি বোঝেন না—বোঝেন না একটা মানুষ এই যে দিনের পর দিন এমন একটা ব্যাকুলতা নিয়ে, আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে ছুটে ছুটে আসে, সে কিসের জন্য? তিনি কি কিছুই বোঝেন

না ? সুশান্তর ঘন পল্লবে ঘেরা বড়ো বড়ো চোখের দুটি কালো মণিতে কী লেখা আছে, কখনো কি তিনি তা পড়েননি ? হয়তো ভালোবাসা যে কোথায় কত উঁচুতে উঠতে পারে, এই আবেগকে তিনি সেখানেই তুলে দেবার সহায়তা করেন। তাঁর অসীম নিথরতা হয়তো এ কথাটাই জানাতে চায় যে অস্তিত্বটা কিছু নয়, সেটা ফাঁকা—আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন, সেটাই চরম, সেটাই সব। সেখানে যাও, সেখানেই শান্তি, সেখানেই মানুষের বঞ্চিত হৃদয়ের পরম আশ্বাস।

সুশান্ত ভাবতে পারে না, প্রাণ মন অস্থির হয়ে ওঠে। কী হবে, কী হবে—এর পর কী—এ ক'টি কথা তাকে অবিরাম শ্রান্ত ক্লান্ত করে ফেলে—সে যেন চূর্ণ হয়ে যায় একটা ব্যর্থ ভালোবাসার গুরু ভারে। তিনি যত্ন করেন, ভালোবাসেন—অবসরের সময়গুলোকে ভরিয়ে রাখেন নিজের অস্তিত্ব দিয়ে—কিন্তু এ কতটুকু ! এ বাড়িটা যেন তারও বাড়ি, এমনিভাবে ব্যবহার করেন তিনি—মিশিয়ে নেন নিজেদের সঙ্গে। সংকোচ করবার অবকাশ নেই, আবার ভয় নেই, ছোটো হবার আশঙ্কা নেই—কিন্তু তাঁকে পাবার অনতিক্রম্য বাধারও তো ক্ষয় নেই কোনোদিন। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে সুশান্তর। মনকে একাগ্র করে ছবির রেখায়, ভুলে যাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে—এক সময়ে তাকিয়ে দেখে, কাগজভরা এ কার মুখ ? এতক্ষণকার সকল শক্তির সমাধি দিয়ে এ সে কী সৃষ্টি করেছে ? দুই চোখ ঝাপসা হয়—সকল শক্তিকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ছড়িয়ে ফেলে বেরিয়ে আসে রাস্তায়। কেমন করে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে জানে না—একটি অতি আকস্মিক মূর্তির আকর্ষণ তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে কেবল।

মনের যখন এ রকম একটা উদ্দাম অবস্থা—সেই সময়ে একদিন প্রবলধারায় বৃষ্টি নামলো। চারদিক অন্ধকার করে দিলো কালো মেঘ। আপিসের বন্ধ দরজার কাচের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো সুশান্ত। কী মনে হলো, কী মনে করলো, দরজার ছিটকিনি খুলে বেরিয়ে এলো রুদ্ধশ্বাসে। রাস্তায় জল জমে গেছে এতখানি—ট্রাম নেই, বাস নেই, একটা ট্যাক্সি, একটা রিক্সা—সব যানবাহন অচল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—একটা প্রাণীর সাড়া পর্যন্ত মেলে না, এই ঝাপসা পৃথিবীতে সেই প্রবল বর্ষণ মাথায় করে লম্বা পা ফেলে হাঁটতে আরম্ভ করলো দক্ষিণ দিকে। বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহ বেয়ে বেয়ে নামতে লাগলো জলের ধারা।

সেই বৃষ্টিস্নাত অদ্ভুত এক মূর্তি নিয়ে তিন মাইল রাস্তা অতিক্রম করে যখন সে এসে পৌঁছলো তাঁর দরজায়—কেউ দেখলে হয়তো আঁৎকে উঠতো। দরজায় আস্তে হাত রাখতেই ভেজানো দরজা খুলে গেলো। নিস্তব্ধ নিঃশব্দ বাড়ি। বসবার ঘরটায় ঢুকে একটু থমকে দাঁড়ালো—কারো সাড়া পাওয়া গেলো না। শোবার ঘরের নীল পরদাটা ঈষৎ আন্দোলিত হলো হাওয়ায়—দেখা গেলো এক রাশ কালো লম্বা চুল মেলে দিয়ে তিনি শুয়ে আছেন খাটে। বাদামি রংয়ের একখানা শাড়ির আঁচল খসে পড়েছে—হাতের

আঙুলে পেজ-মার্ক করা একখানা বই পড়ে আছে পাশে। গভীর নিদ্রায় মগ্ন তিনি। সুশান্ত একটু ভাবলো না, সেই জলসিক্ত দেহে ঢুকলো এসে শোবার ঘরে—কাছে, একেবারে খুব কাছে এসে দাঁড়ালো, তারপর ব্যগ্র ব্যাকুল দুই বাহু বাড়ালো আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে—পরমুহূর্তেই শিহরিত হয়ে দুপা পিছিয়ে গেলো। এ কী! এ সে কী করতে যাচ্ছিলো? এই স্থূল শরীরটার কি এতই ক্ষমতা যে তাকে হার মানতে হবে সেখানে? যিনি আমার আত্মা, যিনি আমার হৃদয়ের অপার্থিব সম্পদ, তাঁকে আমি নামাবো এই পৃথিবীর ধুলো মাটিতে! সমস্ত শক্তি সে একাগ্র করলো হাতের মুঠোয় —দৈহিক আকাঙ্ক্ষাকে যেন সে পিষে ফেললো তার চাপে—তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। বিশ্বাস নেই, বিশ্বাস নেই আর নিজেকে— সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শেষ বারের মতো একবার দাঁড়ালো, তাকিয়ে রইলো খোলা শক্ত কাঠের দরজার দিকে—তারপর বৃষ্টির জলে আর চোখের জলে মেশা একটা বিস্বাদ জলধারা গড়িয়ে পড়লো তার গাল বেয়ে।

সহসা ঘুম ভেঙে গেলো ভদ্রমহিলার। কেমন যেন একটা বিচ্ছেদের কষ্টে ভরে উঠলো মন—কে যেন চলে গেলো, কে যেন মুছে গেল জীবন থেকে—কে? কে? দুই চোখ মেলে বেখেতিনি খুঁজতে লাগলেন তাকে— অনুভব করলেন, যা গেলো তা আর আসবে না তাঁর জীবনে। অকারণে তাঁর চোখও জলে ভরে উঠলো।

বাড়ি ফিরতে চিরঞ্জীবের বরাবরই খুব রাত হয়। সাড়ে দশটা এগারোটা তো বাজেই তেমন জরুরী মিটিং থাকলে মধ্য রাত হতেও বাধা নেই। বাল্যকাল থেকেই সমাজসেবা এবং রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত, সেটাই তাঁর ধ্যান জ্ঞান নেশা, যদিও পেশা অধ্যাপনা। সবাই বলে মানুষ তিনি একান্তই খাঁটি, দেশ এবং দশের মঙ্গলের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ।

দলবাজির ধার ধারেন না, অর্থলোভে বিচলিত হন না, গদির মোহে পা বাড়ান না। আক্ষরিক অর্থেই আদর্শবাদী। যখন এই শহরের এই কলেজের চাকরি নিয়ে এসেছিলেন তখন বয়েস ছিলো আটাশ, এখন চল্লিশ। তখন সঙ্গে বিধবা মা ছিলেন। আজ পাঁচ বছর যাবত তিনি গত। বিবাহ করেননি, কেননা সময় পাননি। সুতরাং সংসারের বন্ধন নিতান্ত শিথিল। একটি অতি অকর্মণ্য অবসর প্রিয় বোকা নিদ্রাকাতর ভৃত্য নিয়ে নেহাতই স্বাধীন জীবন।

বাড়ি ফিরতে সেদিনও খুব রাত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ফিরেই তিনি বড়ো অবাক হয়ে গেলেন। ধাক্কা দিতেই খুলে গেল দরজা। ঘড়িতে দেখলেন বারোটা বেজে তেত্রিশ মিনিট। মফঃস্বল শহরের পক্ষে রাত বারোটা অবশ্যই গভীর রাত। বেশীর ভাগ মানুষই নিদ্রিত, তাঁর মধ্যে তাঁর পুরাতন ভৃত্য গোবর্ধন তো বটেই। গোবর্ধন সন্ধ্যে থেকেই ঘুমোয়। প্রতিদিনই ফিরে এসে দরজা ধাক্কাতে ধাক্কাতে প্রাণান্ত না হওয়া পর্যন্ত তার ঘুম ভাঙে না। আর এতো রাত্রে এলে তো পুলিস ডাকার অবস্থা ঘটে। আরো একটা কাণ্ড করে সে। সারা বাড়ি অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে রাখে। তিনি যতো বলেন, বসার ঘরের আলোটা অন্তত জেবলে রাখবি সে কথা শোনে না। আবার মুখে মুখে বলে, হ্যাঁহ্ অতক্ষণ মিচিমিচি ইলেকটিরি পুড়োই আর কী। আমার তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই কিনা। খেয়ে দেয়ে সত্যি তার কাজ নেই। বেলা পড়তে না পড়তেই চিরঞ্জীব বেরিয়ে যান এক কাপ চা খেয়ে, আর ফিরতে ফিরতে তো এতো রাত। গোবর্ধন আলোই জবালে না। দাদাবাবু বেরুনো মাত্র সেই যে দরজা বন্ধ করে ঘুম লাগায় ওঠে একেবারে ফিরে এলে।

বিকেলে রান্নাবান্নার পাট নেই। গোবর্ধনের রান্না যতো কম খাওয়া যায় ততোই মঙ্গল। পারলে দুপুরেও খেতেন না। মা ছেলেবেলা থেকে

বদভ্যাস করে দিয়ে গেছেন ভাতের। তিনি নেই অথচ অভ্যাসটা আছে। ভাত খেয়েই কলেজে যান। সেই সঙ্গে যেটা মাছের ঝোল নামে নিয়ে আসে তার স্বাদ যে কী ভয়ানক সে শুধু যে খেয়েছে সেই জানে। অন্যমনস্ক চিরঞ্জীব এক ঝাঁকিতে পূর্ণমনস্ক হয়ে চ্যাঁচাতে থাকেন, এটা তুই কী করেছিস, কী করেছিস। লোকটা হদ্দ বোকা, নইলে এতো বছর এ বাড়িতে আছে, এতো বছর ধরে মাকে রান্না করতে দেখেছে, তবু কিছু শিখলো না?

সকলে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে দৌড়ে আরো এক খামচা নুন বা চিনি মিশিয়ে নিয়ে এসে বলে, এবার দেখুন দাদাবাবু ঠিক হয়েছে কিনা। সুতরাং এই লোকের দ্বারা তিনি তাঁর জঠরকে আর নির্যাতিত হতে দিতে চান না। বলেন রাত্তিরে আমার জন্য সব সেদ্ধ করে রাখবি। মাখন থাকে যেন ঘরে, পাউরুটি থাকে যেন। ঐ সবই তিনি খান, সঙ্গে এক কাপ কফি।

সেদিন গোবর্ধনের আলো জেবলে রাখা, দরজা খোলার তৎপরতা ইত্যাদি দেখে তিনি প্রায় তাজ্জব বনে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরেই বুঝতে পারলেন কারণটা কী। এবং বোঝার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর তাজ্জব হয়ে যাওয়ার মাত্রা শতগুণ বৃদ্ধি পেলো। নতমুখী যে মেয়েটি দরজা খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো তাঁকে দেখে ঢুকতে গিয়েও থেমে বললেন, আপনি—মানে—

আমি সীতা। মেয়েটির অস্ফুট গলা শোনা গেল কি গেল না।

সীতা? নামটা শোনা শোনা মনে হলেও ঠিক বুঝতে পারলেন না।

মেয়েটি আবার বললো, আমার বাবার নাম বিধুভূষণ খাস্তগীর। বিধুভূষণ খাস্তগীর? হঠাৎ বহুদূর থেকে ভেসে আসা কোনো গানের অস্পষ্ট সুরের মতো একটা অনুভূতি ধাক্কা দিল মনে। মেয়েটির আপাদ-মস্তক ভালো করে দেখলেন। বিস্রস্ত পোশাক, উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা, অবিন্যস্ত চুল। ঘরে ঢুকে বললেন, আমি ঠিক চিনতে পারিনি।

আমি সে আশা করিনি।

বসুন। কিন্তু এতো রাত্তিরে—আবার ঘড়ি দেখলেন, সাড়ে বারোটা।

এসেছি নটার সময়।

গোবর্ধন কোথায়?

সে আমাকে দরজা খুলে দিয়ে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। বলেছিলো দাদাবাবুর আসতে অনেক রাত হবে।

হ্যাঁ, আমি একটু রাত করেই ফিরি।

আমিই বললাম, তুমি তোমার কাজে যাও আমার খুব জরুরী দরকার দেখা না করে যেতে পারবো না।

জরুরী দরকার? আমার সঙ্গে?

আজ্ঞে।

কী বলুন তো।

সীতা ঢোক গিললো, দৃষ্টি মাটিতে নিবদ্ধ রাখলো, তারপর স্পষ্ট করে বললো, আমি আপনার আশ্রয়প্রার্থী।

আশ্রয়।

আমার সামনে এখন দুটো পথ খোলা, হয় মৃত্যু নয় আপনার দয়া।

এসব কী বলছেন আপনি?

যা সত্য।

আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

মৃত্যুকেই বেছে নিয়েছিলাম, লালবাঁধে গিয়ে বসেও ছিলাম অনেকক্ষণ। মনে পড়লো সাঁতার জানলে ডুবে মরা যায় না কলসী সঙ্গে ছিলো না, মৃত্যুর অন্য উপায়ও আমি জানি না। তা হলে জগতে আপনি ছাড়া আর কার কাছে গিয়ে আশ্রয় চাইতে পারি।

চিরঞ্জীব মুখার্জি ভেবে পেলেন না এ ধরনের কথা এই মেয়েটি তার কাছে বলছে কেন? মাথাটাথা খারাপ হয়নি তো? লক্ষ্য করলেন ভালো করে। নিতান্তই সাব্যস্ত ভঙ্গী কথাবার্তায়ও কোনোরকম গোলমাল আছে বলে মনে হচ্ছে না। নিশ্চয়ই বাড়ি থেকে রাগারাগি করে বেরিয়ে এসেছে। যা বাড়ি। সহানুভূতির গলায় বললেন, অধমকে আপনি যোগ্যতার অতিরিক্ত মর্যাদা দিচ্ছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি বলি কি চলুন আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

সীতা তাকালো। তাকিয়েই রইলো। কালো কুচকুচে হরিণের মতো টানা দুই চোখে যেন দপ করে আগুন জ্বলে উঠলো, বললো, বাড়ি যাবার জন্য আমি এখানে আসিনি।

চিরঞ্জীব সেই রকমই নরম গলায় বললেন, নিশ্চয়ই বাড়ির উপর রাগ করে এসেছেন—

মেয়েটি বললো, রাগ? না রাগ অভিমান আমার জীবনে অবান্তর। বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছি সন্ধ্যে সাতটাতে, ন'টায় আপনার এখানে এসেছি, রাত বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি, আপনার বাড়ি আপনার ঘর, তাড়িয়ে দিলে চলে যাবো সেটা স্বতঃসিদ্ধ কিন্তু বিধু খাস্তগীরের দরজায় আপনাকে পৌঁছে দিতে হবে না।

কিন্তু—কিন্তু—।

আপনি সমাজসেবক, সত্যবাদী, অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করেন না। শুনতে পাই এই সবই আপনার চরিত্রের অলংকার, একটি মেয়েকে আশ্রয় দিতে এতো ভয় পাচ্ছেন কেন?

নিজের জন্য ভয় পাচ্ছি না, ভয় আপনার জন্যই। এই ছোটো শহরে এই রাত্রিবাসের কথা কি অনেক কুশ্রী চেহারায় লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে যাবে না? আমি গ্রাহ্য করি না, কিন্তু আপনার গায়ে কেউ কালি ছিটোক তাও তো চাই না।

আমার গায়ে কালি! অদ্ভুত ভাবে হাসলো, সর্বাঙ্গে কালি মেখেই আপনার দয়ার ভিখিরি হয়ে এখানে এসেছি। এই কালিই আমাকে এই সাহস জুগিয়েছে। হাঁটু ভেঙে মেঝেতে বসে পড়লো, আপনি আমাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে এই বিপদ থেকে রক্ষা করুন।

ককী!

শুধু সবাইকে জানাতে দিন আমি বিবাহিতা, এ ব্যতীত কথা দিচ্ছি অন্য বিষয়ে স্ত্রীর দাবী আমি করবো না।

কি বলছেন? বিনা মেঘে বজ্রপাত হলেও বোধ হয় চিরঞ্জীব মুখার্জি এতো স্তম্ভিত হতেন না।

লোভ নয়, মোহ নয়, প্রেম নয়, প্রলোভন নয়, শুধু একটি নিপীড়িত নির্যাতিত অরক্ষিত মেয়ের এই আবেদন কি আপনি রক্ষা করতে পারেন না? প্রার্থনার ভঙ্গিতে সীতা তার দুই হাত বুকের কাছে জড়ো করলো।

বিপন্ন চিরঞ্জীব তো তো করে বললেন, কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়?

সম্ভব। আপনার পক্ষেই সম্ভব। মৃত্যুর সঙ্গে দেখা করতে না পেরে আমি সেই জন্যই আপনার দরজায় ছুটে এসেছি। আমাকে দয়া করুন, দয়া করুন।

চিরঞ্জীব অন্যমনস্ক হলেন। অনেক ভুলে যাওয়া কথা একসঙ্গে মনে পড়লো তাঁর। মা এক সময়ে এই মেয়েটির সঙ্গে তাঁর বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন। তখন এক পাড়াতেই ছিলেন। মোড় ফিরলেই বিধু উকিলের ইঁট বার করা পুরাতন পৈতৃক বাড়িটি চোখে পড়তো। রাস্তা থেকেই সিঁড়ি উঠে তাঁর বৈঠকখানা অর্থাৎ চেম্বার, অন্দরমহল পিছনে। অনেকগুলো কুচোকাঁচা ছেলেমেয়ে কিলবিল করতো পথের ধারে। সবই বিধু উকিলের। প্রথমপক্ষের এই একটিই মাত্র মেয়ে, ছোটো ছোটোগুলো দ্বিতীয়ার। মেয়েটির মা মারা যাবার মাস দশেক বাদে বিধুবাবু তাকে মাসী পিসি কাকী এই ধরনেরই কোন আত্মীয়ার কাছে রেখে এলেন। সীতা তখন রীতিমতো যুবতী, আই. এ. পাশ করে বি. এ. পড়ছিলো। সেই সময়েই ঐ কলেজে যোগ দেন চিরঞ্জীব। দু এক মাসের মধ্যেই চলে গেল। তার বাবা বলে বেড়ালেন সব সময়ে কাজে কর্মে বেরিয়ে যান, মেয়েকে একা বাড়িতে রাখতে ভরসা পান না। জায়গাটা তো তেমন ভালো না। এই বলে অচিরেই অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে এলেন কোথা থেকে। বছর চারেক বাদে নিজের মেয়েকেও ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। ততো দিনে আরো দুটি সন্তানের জনক হয়েছেন, এবং আর একটির সূচনায় বমি করছেন বিমাতা!

সেই সময়েই মেয়েটিকে দেখে মা মুগ্ধ হন। অনেক প্রশংসা শোনা গেছে। মার মনে সহানুভূতিটাও অত্যন্ত প্রবল ছিলো। সতীন কন্যাকে দিয়ে বিধুভূষণের দ্বিতীয় পক্ষ অমানুষিক পরিশ্রম করাতেন। রান্না, বাসন মাজা, বাচ্চা রাখা, কাঁথা কাপড় কাচা সমস্ত দিনে এক বিন্দু বিশ্রাম ছিলো না। তার উপরে বাক্যবাণ। মা শুনতেন এবং সহ্য করতে পারতেন না। একদিন গিয়ে বিবাহের প্রস্তাব করে এলেন। যদিও চিরঞ্জীব একবারো তাঁর সম্মতি জ্ঞাপন করেনি শোনামাত্রই বলেছেন, পাগল নাকি। ওসব বিয়ে টিয়ের মধ্যে আমি নেই। আমার জীবনের সঙ্গে আমি কোন বন্ধনের শিকল জড়াতেই রাজী নই। মা জেদ করলে বুঝিয়েছেন, আমার সময় কোথায় যে একজন সাধারণ ভদ্রলোকের মতো বিয়ে করে সংসার পাতবো? তুমি তো দেখতেই পাচ্ছ আমার অবস্থা। তবু বিমাতার সংসারে

মেয়েটির দুঃখ দৈন্য নির্যাতন নিপীড়নের কথা শুনতে শুনতে মন তাঁর ভিজে উঠতো। পথে যেতে আসতে কখনো দেখতে পেলে চকিত দৃষ্টিতে তাকাতেন। চোখে চোখ পড়লে মেয়েটির মুখে রক্ত উঠে আসতো, তিনিও কম্পিত বক্ষে ধা ধা করে চলে যেতেন। মনে বেশ একটু রং ধরে উঠেছিলো। কিন্তু প্রস্তাব প্রস্তাবনাতেই সমাপ্তি লাভ করে। বিধুবাবু প্রথমটায় আগ্রহ সহকারেই এগিয়ে এসেছিলেন, একটা পয়সা লাগবে না, শুধু শাঁখা সিঁদুর দিয়েই অব্যাহতি পাবেন, এই সংবাদে খুব পুলকিতও হয়েছিলেন কিন্তু চব্বিশ বছরের ছোটো দ্বিতীয় পক্ষ যখন রুখে উঠে বললো, সংসারের ঘানিটা টানবে কে শুনি? এই শুয়োরের পাল কে চরাবে? অমনি ভয়ে অর্ধমৃত হয়ে গেলেন। ভেবে দেখলেন কথাটা সত্যই। সীতাকে বিবাহ দিলে সীতার বিমাতার সংসারই যে ডকে উঠবে তাই নয় তাঁর নিজের পানটুকু জলটুকু দেবারও আর অবশিষ্ট থাকবে না কেউ। মেয়েকে তিনি দেখেন না বটে, মেয়ে তো তাঁকে দেখে? মেয়েরই বয়সী যুবতী পত্নী যখন অশ্রাব্য কুশ্রাব্য ভাষায় গালাগালির তুবড়ি ছোটান, এই মেয়ের চোখেই স্নেহের ছায়া টলমল করতে দেখে তবু একটা খড়কুটো অবলম্বন পান। মনে মনে না ভেবে পারেন না তড়িঘড়ি করে এই ছোটোলোকের অশিক্ষিত মেয়েটাকে বিবাহ করা তাঁর বোকামি হয়েছে। কী করবেন। শরীরের ক্ষুধা বড়ো ভীষণ। এক বছর যে অপেক্ষা করেছেন তাই ঢের।

এসব অনেক আগেকার কথা। আট দশ বছরের পলিমাটি পড়ে গেছে সেই দিনগুলোর উপব। বাড়ি বদলে কবে চলে এসেছেন অন্য পাড়ায়, মা চলে গেছেন—তাও পাঁচ বছর হযে গেছে। এই তো দেখেও চিনতে পারলেন না সেই মেয়েকে, তার মানে চকিত দৃষ্টিতে চকিতেই দেখেছেন। রাত বারোটার সময় এতোদিন বাদে এসে সে কেন তাঁর পতিত্ব প্রার্থনা করছে? ভেবে পাচ্ছিলেন না কি করবেন, কী বলবেন। বিয়ে কি এমনিই একটা ব্যাপার যে এসে বলামাত্রই হয়ে যায়? তার জন্য প্রস্তুতি লাগে না? বয়েসও কি আর বসে আছে? এ কি বিপদে পড়লেন তিনি। তবু তাঁর চল্লিশ বছরের শক্ত পোক্ত হৃদয়ে একটা মৃদু ঢেউ আন্দোলিত হলো। ঘামছিলেন, পকেট থেকে রুমাল বার করে কপাল মুছলেন তারপর কেসে নিয়ে বললেন, অনেক রাত হয়েছে, আমি গোবর্ধনকে ডাকছি ও আপনার থাকার বন্দোবস্ত করে দেবে। খাবার কষ্ট হবে খুব। বলা যায় কিছুই প্রায় নেই।

মেয়েটির চোখে আশার আলো চিক চিক করলো, একই ভঙ্গিতে বললো, আমি আবারো কথা দিচ্ছি একদিন এক নিমেষের জন্যও সম্পর্কের কোনো দাবী নিয়ে আপনার কাছে দাঁড়াবো না, আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করছি যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যাবো এখান থেকে।

কোথায় যাবেন?

একটা আশ্রমে।

তার মানে বাড়ি ফিরবেন না ?

না।

এতোদিন বিবাহ করেননি কেন ?

ক্রীতদাসীর বিবাহ হয় না।

ক্রীতদাসীর জীবন যাপন না করলেও তো পারতেন।

চেষ্টার ত্রুটি করিনি। যেখানে যতো বিজ্ঞাপন দেখেছি সর্বত্র লুকিয়ে লুকিয়ে আবেদন পাঠিয়েছি। আই. এ. পাশ মেয়ের আজকাল চাকরি হয় না।

আমি তো শুনেছিলাম আপনি বি. এ. পাশ করেছেন।

পরীক্ষার দু চার মাস আগেই বাবা আমাকে তাঁর দ্বিতীয় পত্নীর পরিচর্যার জন্য নিয়ে আসেন এখানে। তারপরের ইতিহাস গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তবে শেষ পর্যন্ত একটা চাকরি আমার জুটেছিলো, আমি সেখান থেকেই মাস দেড়েক আগে ফিরেছি।

সে চাকরি নেই ?

ছিলো। আমিই ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি।

স্কুলের চাকরি ?

কোনো এক গণ্ডগ্রামেব প্রাথমিক স্কুল। চার বছর ছিলাম।

কোনো কৌতূহল প্রকাশ করছি না, কিন্তু সে কাজ কি এতোই অসহ্য হলো। যার বিনিময়ে এই অন্ধকারে ফিরে আসতে হলো আবার ?

সীতা চুপ করে রইলো।

চিরঞ্জীব বললেন, যে আশ্রমে এখন কাজ স্থির করেছেন, সে আশ্রমে কি বিবাহিত না হলে কাজ দেয় না ?

সীতা জবাব দিতে একটু সময় নিল। হঠাৎ উদ্ধত ভাবে বললো, আপনি তো সমাজ সেবা করেন, আপনি কি জানেন না মেয়েরা কতো অসহায়। জঙ্গলে যেমন বাঘের ভয়, একটি মেয়ের পক্ষে একা থাকলে পুরুষের ভয় তার চেয়ে লক্ষ গুণ বেশী। বাঘ তবু খেয়ে ফেলে, একটা অবসান, কিন্তু একজন পুরুষের লোভ একজন অরক্ষিত মেয়েকে—থামলো, অনেকক্ষণ চুপ। ঘরের মধ্যে নিঃশ্বাস পতনের শব্দও যেন ডুবে গেল। তারপর বললো, আপনাকে জানানো দরকার এই চার বছর আমার অক্লেশে কাটে নি। অনেক উৎপাত সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু আমরা চারজন মেয়ে একসঙ্গে ছিলাম। জড়াজড়ি করে ভয়ডর নিয়েই চলছিলো কোনো রকমে। মাস তিনেক আগে আমার জ্বর হলো একদিন। ওরা তিন জন স্কুলে চলে গেলে নির্জন দুপুরে মাটির ঘরে একাই আমি শুয়েছিলাম, এই সুযোগে দুর্জন ঢুকে এলো, আমি আমাকে রক্ষা করতে পারলাম না।

গর্জে উঠলেন চিরঞ্জীব, কোথায় কোন গ্রাম বলুন আমাকে। আমি তাকে শায়েস্তা করবো। আমি যাবো সেখানে। লাফিয়ে উঠে বাঘের মতো পদচারণা করতে লাগলেন। কী ভেবে থামলেন। বললেন, আপনি তো মাস দেড়েক আগে ফিরেছেন, তখন কেন আসেননি ?

স্তব্ধ থেকে সীতা বললো, আমি—আমি তখনো বুঝতে পারিনি।

কী বুঝতে পারেন নি ?

নিয়তি আমাকে কোথায় টেনে এনেছে। যা জানার যা বোঝার সবই আজকের ঘটনা। এরপরেই আমার পিতা এবং বিমাতা আমাকে নির্দয় প্রহারে জর্জরিত করে, বার করে দেন বাড়ি থেকে। আমার প্রতি মৃত্যুও বিমুখ। আপনিই আমার শেষ আশা শেষ আশ্রয়।

এতোক্ষণে ছবিটা স্পষ্ট হলো। সহসা বিদ্রূপে ঝলসে উঠে বললেন, ও, এই জন্যেই বুঝি একটা পদবীর দরকার ?

সীতা তাকিয়ে থাকলো।

চিরঞ্জীব জানলার ধারে গিয়ে পিছন ফিরে বললেন, অসম্ভব।

সীতা ভিক্ষায় আনত হলো, শুধু এইটুকু, শুধু এইটুকু আমাকে বলবার অধিকার দিন আমি বিবাহিত কেবলমাত্র এই—

না না। আপনি বাড়ি যান।

বাড়ি ? বাড়ি কোথায় ?

সেটা আমার জানবার কথা নয়।

এইবার ভিক্ষা ভুলে দলিতা ফণিনীর মতো ক্রুদ্ধভঙ্গিতে সে উঠে দাঁড়ালো, নিষ্ঠুর। হিপোক্রীট। একজন মেয়ের সর্বনাশ করে এভাবেই সব পুরুষ সরে দাঁড়ায়।

কী বলছেন আপনি ? আমি আপনার সর্বনাশ করেছি ?

আপনাকে আমি এর চাইতে অনেক অনেক বড়ো বলে জানতাম। দেশোদ্ধাবের ভান দেখে সেটা সত্য বলে ধবে নিয়েছিলাম। তা হলে এই আমাদেব শহরের মহাপ্রাণ চিরঞ্জীব মুখার্জি। মরতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে আমি এঁর কাছেই ছুটে এসেছিলাম ? ভেবেছিলাম সমাজের সব অন্যায়েরই একটা প্রতিকার আর কারো কাছে না পেলেও এখানে পাবো। বিদ্রূপে সীতাও ঝলসে উঠলো।

কিসের অন্যায় ? চিরঞ্জীব অবিচলিত।

দরজা ধরে নিজেকে সামলালো সীতা, একটি পুরুষের প্রলোভনের পাপে একটি নিষ্পাপ মেয়েকে কেন বলি দেওয়া হবে এভাবে বলতে পারেন ? কোথায় তার দোষ ? আপনাদের পুরুষ শাসিত সমাজে সে মেয়ে হয়ে জন্মেছে শুধুই তো এই ? গর্ভধারণ করবে মা, জন্ম দেবে মা, লালন পালন রক্ষণাবেক্ষণ সব করবে মা আর পরিচয় দিতে গেলে তার পিতৃপদবী চাই-ই চাই। কেন এই অন্যায় ? কেন মায়ের সন্তান বললেই আপনাবা তাকে গলা টিপে মেরে ফেলবেন ? কেন ? কেন ? এই প্রাণ আমার ইচ্ছেতে জন্ম নিয়েছে ? তবু তার জন্যে কেন মরতে হবে আমাকে। তা নইলেই ঠেলে দেবেন গণিকাবৃত্তির দরজায়, নিজেদের পশুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে প্রায়শ্চিত্ত করাবেন মেয়েটিকে দিয়ে। কেবলমাত্র সেই মেয়েটিই তো নয়, একটি প্রাণকণিকাকেও সংহার করেন আপনারা। নরক। নরক। সবচেয়ে বড়ো বেদনা আপনিও সেই নরকের কীট। অথচ দশ বছর যাবত এই নরকের

কীটটিকেই আমি দেবতা জ্ঞানে পুজো করে এসেছি, অতি বড়ো দুঃখের দিনেও এই মানুষের অস্তিত্ব স্মরণ করে আমি কল্পনায় সান্ত্বনা পেয়েছি। বলতে বলতে তার গা থেকে জড়িয়ে থাকা চাদরটা খসে পড়ে গেল, প্রচণ্ড প্রহারে রক্তাক্ত দেহের অনেকখানি উন্মুক্ত অংশ দেখতে পেয়ে চিরঞ্জীব শিহরিত হলেন। সীতা ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল।

এরপরে অনেকক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এই মুহূর্তে এই মেয়েটি তাকে যা যা বলে গেল, মনে পড়লো, এই ধরনের বক্তৃতায় তিনি অনেক সময়ই মুখর হয়ে ওঠেন। আন্তরিকতারও কোনো অভাব থাকে না। তরুণরা এবং মহিলারা জয়ধ্বনি করেন, বয়োজ্যেষ্ঠরা ধিক্কার দেন। এতো দিন এই সব বিশ্বাসেই অটল ছিলেন কিন্তু যে মুহূর্তে নিজের উপর এসে দায়টা বর্তালো, তৎক্ষণাৎ তাঁর চিরাচরিত পুরুষবৃত্তি কেমন রোঁয়া ফুলিয়ে জাত ভাইদের সপক্ষে দাঁড়িয়ে গেল। ছি। এটা অন্যায় হয়েছে। এটা তিনি ঠিক করেননি। ঘড়ি দেখলেন দুটো বাজতে পাঁচ ঃ এই গভীর রাতে কোথায় চলে গেল অসহায় মেয়েটি? এতোক্ষণে একটা অন্যায় বোধ তাঁকে উদ্বুদ্ধ করলো। সমাজ সেবী হিসেবে অর্জিত অহংকার খোঁচা দিল মহাপ্রাণের ভূমিকায় অবতীর্ণ আত্মাকে, সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুতপায়ে ধাবমান হলেন এবং ফিরিয়ে নিয়ে এসে বললেন, দেখুন আমার বয়েস চল্লিশ, আমি চিরকুমার, আমার পক্ষে বিবাহ প্রহসন! কিন্তু এটা খুবই সত্য কথা, বিবাহের মর্যাদা না পেলে একটি সন্তানসম্ভবা কুমারী মেয়ে মৃত্যু ব্যতীত কোথাও গিয়েই স্থান পাবে না। সমস্ত পুরুষের হয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত আমার করাই উচিত। আমি কাল সকালেই রেজিস্ট্রার ডেকে আপনাকে সেই প্রতিকারহীন অসহায় অবস্থা থেকে বিবাহের মর্যাদায় উত্তীর্ণ করবো। একটি শর্ত, আপনিই যেন আপনার শপথ থেকে একবিন্দু সরে না দাঁড়ান। মনে থাকবে?

আরক্ত মুখে সীতা বললো, আমি আবারও ঈশ্বরের নামে শপথ করছি, একটি প্রাণকণিকাকে রক্ষা করার জন্য আমার বত্রিশ বছরের লাঞ্ছিত বঞ্চিত অপমানিত বুভুক্ষু হৃদয় আপনার কাছ থেকে যে ভিক্ষালব্ধ সম্মান নতমস্তকে গ্রহণ করবে, কখনো কোনো কারণেই সম্পর্কের দাবী তুলে আমি সেই সম্মানের অবমাননা করবো না। আমি একটি কুষ্ঠাশ্রমে সেবিকার কাজ নিয়ে যাচ্ছি সেখানেও খাওয়া থাকার বন্দোবস্ত আছে তবে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে তার জন্য। এখন যিনি আছেন, তিনি মাস দুই বাদে তাঁর কর্মভার অন্যকে বুঝিয়ে দেবেন। এই দু মাস আমাকে যদি এ বাড়িরই কোনো একটি ঘরে আশ্রয় দেন কৃতজ্ঞ হবো।

ঠিক আছে। আপনার যতোদিন অন্যত্র যাবার সুবিধে না হয় এখানেই থাকবেন।

যেমন আপনার ভৃত্য গোবর্ধন আছে! গলা বন্ধ হয়ে এলো সীতার, আমি তার চেয়ে একবিন্দু বেশী সুযোগ সুবিধা চাইবো না, সেটাও প্রতিজ্ঞা করছি।

নরম হলেন চিরঞ্জীব, কী আশ্চর্য! এসব বলছেন কেন। আমাকে যতোই ছোটো ভাবুন, আমি ততো ছোটো নই।

সত্যি সত্যিই পরের দিন বেলা বারোটার সময় সীতা খাস্তগীর কলমের এক আঁচড়ে সীতা মুখার্জি হয়ে গেল। কোণের দিকের একটি পরিত্যক্ত ঘরে আশ্রয় মিললো তার। অস্থায়ী আবাস হলেও মেয়েরা গৃহস্থালি না করে পারে না। সেই ঘরকেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে গুছিয়ে নিল। প্রথম দুদিন গুহাবাসী হয়েই কাটিয়েছিলো। চিরঞ্জীবের প্রাত্যহিক জীবনে সে কিছুই জানে না, চলতে ফিরতে কখন দেখা হয়ে যাবে সেই আতংকেই বেরুতে পারেনি। বোঝা গেল বাড়ি থাকার মেয়াদ তার খুব কম। সকালে উঠেই প্রথম কাজ গোবর্ধনকে তোলা। গোবর্ধন উঠে উনুনে আঁচ দিয়ে সারা বাড়ি ধোঁয়ায় অন্ধকার করে ফেলে। ভদ্রলোকের বোধ হয় চায়ের তৃষ্ণা খুব প্রবল। কতোবার যে খোঁজ নেন উনুন ধরলো কিনা, জল ফুটলো কি না। আর কতোক্ষণ দেরী হবে, তার ঠিক নেই। গোবর্ধন একটা করে তো আর একটা ভোলে, এটা দেয় তো সেটা দেয় না, ওটা আনে তো অন্যটা পড়ে থাকে, তবে এটা বোঝা যায় দাদাবাবুকে সে প্রাণতুল্য ভালোবাসে দাদাবাবুকে ভালো রাখতেও তার অসাধ নেই, কিন্তু নেহাৎই অপারগ। একা একা বুদ্ধি করে কোনো কাজই সে করতে পারে না। যে চাটা সে করে নিয়ে যায়, এতো অপেক্ষার পরে এতো আকাঙ্ক্ষার সেই চা খেয়ে প্রায়ই ভদ্রলোককে রাগারাগি করতে শোনা যায়। হয় ভয়ংকর চিনি দেয়, নয় ভয়ংকর দুধ দেয়, একদিন জলের মতো পাতলা অন্য দিন কাঁথার মতো ভারি। ঐ চায়ের সঙ্গে বা পরে আর কোনো আহার নেই। বারোটার সময় ভাত খেয়ে কলেজ। ফিরতে ফিরতে চারটে বাজে। আবার চা, সঙ্গে রুটি মাখন। তক্ষুনি আবার বেরিয়ে যান. ফেরেন রাত্তিরে।

সীতা ঘুরে ফিরে বাড়িটা দেখলো। যেভাবে রেখেছে এরা বোঝার উপায় নেই কেমন। রান্নাঘরে ঢুকে জিনিসের প্রাচুর্য দেখে অবাক হয়ে গেল। কী সুন্দর সুন্দর সব বাসন কী অযত্নে পড়ে আছে। রোজ একটা ভাঙা উনুন ধরানো নিয়ে কতো কাণ্ড করে গোবর্ধন, কতো দেরী হয়ে যায় চা দিতে আর বাড়িটা তো কালি ঝুলি মাখিয়ে শেষ করে। অথচ আরো তিনটে উনুন আছে। একটা পুরোনো দিনের প্রাইমাস স্টোভ একটা কেরোসিনের আর একটা ইলেকট্রিক।

বললো, এগুলো ঠিক নেই গোবর্ধন? গোবর্ধন বললো, তা তো জানিনে বৌদি, মা থাকতে ব্যবহার করতেন, আমি ধরাতে জানি না।

বৌদি ডাকটাতে দাঁতে কাঁকর পড়লো। মেনে নিতেই হয়। বললো, এক কাজ করো একটু পরিষ্কার টরিষ্কার করে দাও আমি দেখি। গোবর্ধন এক বাক্যেই রাজী। তেল টেল ভরে দেখা গেল সব ঠিক।

শোনো কাল সকালে আর তুমি উনুন ধরিও না, আমি উঠে স্টোভ জেবলে

চা করে দেব, তুমি নিয়ে যেয়ো। খুব খুশি গোবর্ধন। বাড়িতে মা গেছেন পর থেকে ভালোই লাগে না তার, বৌদি এসে আবার বেশ বাড়ি বাড়ি হয়েছে।

শুধু চা নয়, রান্নার পাটটাও আস্তে আস্তে হাতে নিল সীতা। বেকার জীবন অসহ্য। তাছাড়া যে দু মাস এখানে খাবে থাকবে, কিছু তো বিনিময় করতে হবে? একদিন চিরঞ্জীব বেরিয়ে গেলে পায়ে পায়ে তাঁর ঘরে গিয়েও ঢুকলো। কাচা হলো বিছানার চিটচিটে ময়লা চাদর, বালিশের ওয়াড়, তোষক রোদে দেওয়া হলো। এই করতে করতে বাড়ির শ্রী ছাঁদও ফিরে গেল বা যাবার সময়ও এগিয়ে এলো।

ঐ স্কুলের চাকরিটা ছাড়বার জন্য ঐখানে বসে বসেই সে অন্য কাজের চেষ্টা করছিলো। যে জন্তু তাকে থাবা মেরেছিলো, সেই জন্তু শুধু একদিন খুবলে খেয়েই নিরস্ত ছিলো না, প্রতিদিন সুযোগের অপেক্ষায় ছায়ার মতো তাকে অনুসরণ করেছে। অন্য একটা অবলম্বন না পেয়ে বুকভরা ভয় আর ত্রাস নিয়েই পড়ে থাকতে হচ্ছিলো। মাসখানেকের মধ্যেই কোনো সূত্রে এই কুষ্ঠাশ্রমের কাজটাব খবর পেয়ে যেন বর্তে গেল। কুষ্ঠাশ্রম হলেও চাকবিটা ভালো। দায় দায়িত্ব মাইনে সবই সম্মানযোগ্য। বলা যায় এক ধরনের ইনচার্জ। মিশনারীদের প্রতিষ্ঠান। নিরাপদে থাকতে পারবে ভেবে অন্তত আশ্বস্ত বোধ করছিলো। এটা ঠিক হতেই সেখান থেকে পালালো সে। এলো এখানে। আর কোথায় আশ্রয়? সেই পিতার সংসার। মা না থাকলে পিতার সঙ্গে কী অর্থহীন সম্পর্ক! তবু সেই পিতার নাম ধাম পদবী গলায় লটকেই ভবসমুদ্রে পাড়ি দিতে হবে।

ভদ্রলোক সত্যি তাকে উদ্ধার করেছেন, সমস্ত পুরুষজাতির কলঙ্ক মোচন করেছেন। এখন সেও তার কথামতো চলে যেতে পারে তা হলে তারও মান রক্ষা হয়।

তা অবশ্য হলো না। পাকা খবর এলো প্রায় তিন মাস কাটিয়ে। এর মধ্যে সব মিলিয়ে মুখোমুখি দেখা বোধ হয় দিন তিনেকই হয়ে থাকবে। তাও দৈবাৎ। হাসিমুখেই চিরঞ্জীব সম্ভাষণ করেছেন: ভালো?

সীতা মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছে।

তিনি আবার বলেছেন, কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?

অসুবিধে কিসের?

আমি বড়ো অযোগ্য, কিছুই পারি না। গোবর্ধন তো আমারি জুড়ি। আপনি আসায় কুঁড়েমি করার আরও সুবিধে হয়েছে। সুবিধে অবশ্যি যার সবচেয়ে বেশী হয়েছে সে ব্যক্তি আমি। সীতা চুপ। সুতরাং আলাপ বেশী দূর এগোয়নি।

আর একদিন। সেই একই সম্ভাষণ, ভালো? সেই ঘাড় নেড়ে সম্মতি জ্ঞাপন।

আমি দু-একদিনের জন্য কলকাতা যাচ্ছি, একা থাকতে ভয় করবে না তো?

না, ভয় কিসের ?

আজ সকাল থেকে এতো ঘুরেছি—

চকিতে তাকিয়ে সীতা বলেছে, বাড়ি যখন একটা আছে, দুপুরে তো তো ফিরলেই হতো।

বাড়ি ? তা আছে। কোনো নিঃশব্দ অস্তিত্বের ভৌতিক যন্ত্রও আছে, কিন্তু অপেক্ষা করার তো আর কেউ নেই ? কী হবে ফিরে ?

খাওয়া হয়নি বোধ হয় ?

কোথায় আর।

চোখেমুখে ব্যাকুলতা নিয়ে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়িয়েছিলো, চিরঞ্জীব বাধা দিলেন, থাক—।

সবই গুছোনো আছে—।

গোবর্ধনই দিতে পারবে।

ও।

চুক্তিতে কি এটা ছিলো ?

কী ?

এই গৃহিণীপনা ?

সীতার মুখে একঝলক রক্ত উঠলো।

আর একদিন। সীতাই গিয়ে দাঁড়িয়েছিল দরজায়, গোবর্ধন বললো, জ্বর হয়েছে ?

ইজিচেয়ারে শুয়ে একটা বই পড়ছিলেন, চমকে উঠে বসে তাকালেন, ও আপনি ?

সকালের চা খাবার সবই তো ফেরত গেছে।

ইচ্ছে করছে না।

যা ইচ্ছে করে বললেই তো করে দেওয়া যায়।

কার জন্য ?

সীতা জবাব দিল না।

আমার জন্য ?

সীতা জবাব দিল না।

আমার জন্য কারোকে কিছু করতে হবে না।

আবার বই মুখে নিয়ে এলিয়ে শুলেন। দাঁড়িয়ে থেকে চলে এলো সীতা।

আর আজ। আজ চলে যাচ্ছে সে। কিন্তু চিরঞ্জীব কোথায় ? সকাল থেকেই তিনি অনুপস্থিত। অথচ জানেন আজ সে চলে যাবে। গাঢ় অভিমানে ভরে যায় মন। সময় হয়ে গেল, বসে আছে সব গুছিয়ে। আশ্চর্য, মানুষটার দেখা নেই। একটা পাখী পুষলেও তো মায়া হয়, এই তিন মাসে সীতা কি সেটুকুও অর্জন করতে পারলো না। হাজার হোক স্ত্রী তো। আইনসিদ্ধ ভাবেই স্ত্রী। শেষদিকে একটা স্বামীর কর্তব্যও তো সীতা আশা করতে পারে ? কী নির্মম। অথচ সেই মানুষের সংসারটাকে ছেড়ে যেতে বুক ভেঙে যাচ্ছে তার। যতোবার ভাবছে আর কোনোদিন ফিরবে

না ততোবার কতোদিনের শুষ্ক চোখ উপচে পড়ছে জলে।

দাদাবাবুর এই ব্যবহারে গোবর্ধনও কম দুঃখিত হলো না। যদিও সে জানে না, এই যাওয়াই বউদির শেষ যাওয়া। ভেবেছে কয়েকদিন বাদে আবার আসবে। তবে এদের হাবভাব চালচলন সবই যেন কেমন। দাদাবাবু অবশ্য বলেছে, সে তো স্বদেশী করে, বিয়ে করেছে জানাজানি হলে জেল হয়ে যাবে, সুতরাং সে যেন বাইরে কিছু বলে না বেড়ায়। তা বাইরে না হয় গোপন থাকুক, ভিতরে ভিতরে এমন করে কেন?

সময় মতো সাইকেল রিক্সা নিয়ে এলো সে। সীতা উঠে বসলো। এই প্রথম সিঁদুর পরেছে, মাথায় আঁচল তুলে দিয়েছে। এই ক'মাসে এলোপাথারি কম কাপড়চোপড় এনে হাজির করেন নি চিরঞ্জীব। এসেছিলেন তো এক কাপড়ে। রেজিস্ট্রেশনের দিন কেনা শাড়িটাই পরলো। সঙ্গে নিয়েছে আর একখানা। না নিয়ে তো উপায় নেই? তবু যতো কম গ্রহণ করা যায়। শুধু তো কাপড়-চোপড়ই নয়, একখানা নোট লিখে টাকাও চাইতে হয়েছে, গোবর্ধনের হাতে যদি আমাকে শ' খানেক টাকা ধার দেন অত্যন্ত উপকৃত হই। মাইনে পেলে দু' কিস্তিতে শোধ করে দেব। তারপরে লিখেছিলো, নিজের যত্ন নেবেন, ভালো থাকবেন, জানবেন যেখানেই থাকি নিরন্তর আপনার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করবো ঈশ্বরের কাছে।

সেই টাকা পাথেয় করেই আবার এক অজানার উদ্দেশ্যে ঝাঁপ দিচ্ছে। তবু আজ তার বুকে অনেক বল। সে একজনের স্ত্রী। যার স্ত্রী সে তো এনে দিল না, টাকা পেয়ে গোবর্ধনকে দিয়েই সিঁদুর আনিয়েছে, লোহা আনিয়েছে, ব্যবহার করতে পেরে ধন্য মেনেছে জীবন। সারা দুনিয়াটার মধ্যেই যেন আর ভয় বা লজ্জা বলে কিছু নেই।

মফস্বল শহরের স্টেশন, জাঁকজমকও নেই ভিড়ও নেই। সে পৌঁছতে পৌঁছতে ঘস ঘস করে চলে গেল একটা ট্রেন! আর একটা এলো। গুড়ের হাঁড়িতে মাছির মতো ভনভন করলো কিছু যাত্রী, কিছু ফেরিওয়ালা আর কিছু কুলি তারপর আবার নীরব। দূর থেকে দেখা গেল তার ট্রেনও আসছে, আর সঙ্গে সঙ্গেই কথাটা মনে হলো তার। সঙ্গে সঙ্গেই সে নিস্পৃহ হৃদয়ে ভাবলো বেঁচে থাকার আর কী অর্থ কার জন্য? কিসের জন্য? জলে ডুবতে পারিনি সাঁতার জানি বলে, ট্রেনে কাটা পড়তে বাধা কোথায়।

লোকজন ঠেলে নব বিবাহিত ঝলমলে চেহারা নিয়ে ছুটলো সে।

ইচ্ছে করেই বাড়ি ফেরেন নি চিরঞ্জীব! তাঁর আত্মসম্মানে যথেষ্ট ঘা লেগেছে। হাজার হোক তিনি স্বামী, সীতার নিশ্চয়ই যাবার আগে একটা অনুমতি বা অনুমোদনের প্রশ্ন ছিলো। এতোদিন একসঙ্গে থাকলো ভদ্রতা বলেও তো একটা জিনিস আছে? কী উদ্ধত। কী হৃদয়হীন। কী জেদ। বিয়ের আগে মানুষ একরকম ভাবে, বিয়ের পরেও কি তা ভাবতে পারে? সীতা যখন একজন প্রায় অপরিচিত মেয়ে মাত্র ছিলো, তখনকার সঙ্গে এই

কমাসের সীতা কি এক ? এমন কি সেদিন, যেদিন অতি ঘনিষ্ঠ দুজন সাক্ষী রেখে, দূর শহর থেকে একজন রেজিস্ট্রার এনে দরজা বন্ধ ঘরে অতি সংগোপনে সে গ্রহণ করেছিলো সীতাকে। কাছাকাছি বসেই বুকটা কাঁপছিলো, কেমন অন্যরকম হয়ে গিয়েছিলো মনের গতি। রাত্রিবেলা যখন ছাড়াছাড়ি হয়ে দুজন দু-ঘরে গিয়ে ঢুকলেন একক বিছানায় শুয়ে কতোক্ষণ ঘুম এলো না। শুধু কি সেই রাতেই ? আর কোনো রাতে নয়ঃ দিনেও কি নয় ? সীতা ঘুরছে ফিরছে, কাজ করছে, তাঁর অনুকোটি চৌষট্টি অভ্যাসকে ইচ্ছেকে পরম যত্নে পালন করছে, কী খাবেন কী পরবেন কখন বেরুবেন কখন ফিরবেন সমস্ত বিষয়ে একাগ্র হয়ে নিবিষ্ট রেখেছে মনোযোগ, এসব কি তাঁকে অবিশ্রান্ত আলোড়িত করে নি ? করেছে। ধীরে ধীরে এই অনুভূতি তাঁকে চূড়ান্ত প্রেমের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। দু মাস কেটে যাবার পরেও যখন সীতা গেলো না, নিশ্চিন্ত বোধ করেছিলেন। ভেবেছিলেন এইবার একটা বোঝাপড়ায় আসবার চেষ্টা করবেন। লজ্জা। সংকোচ। কুণ্ঠা। বেশী বয়সের দোষ। একান্ত যুবকের মতো দস্যু হয়ে ছিনিয়ে নিতে পারলেন কই ? বলতে পারলেন কই, তোমার চুক্তিতে তুমি স্ত্রীর দাবী করবে না বলেছ কিন্তু আমি তো স্বামীর অধিকার আরোপ করবো না এমন কথা কখনো বলিনি।

এই অনুরাগ তাকে এতো দূর নিয়ে গেছে যে তার সম্ভাব্য সন্তানের কথা ভাবলে পর্যন্ত হৃদয় পিতৃস্নেহে দ্রাব হয়ে ওঠে। সেই যে একা রেখে কলকাতা গেলেন, কী চিন্তা। অন্যমনস্ক ভাবে চলতে গিয়ে প্রায় গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেলেন। আর তক্ষুনি মনে হলো সীতার কী হতো ? টাকা কই ? পয়সা কই ? চিরবাউণ্ডুলে মানুষ তিনি, যা আয় করেন তাই দু হাতে খরচ করেন, এখন তো আগের মতো মুক্ত জীবন নেই ? এখন তাঁর অনেক দায়িত্ব। তিনি না থাকলে ওর তো দুর্গতির একশেষ হবে। আহা সীতা। কতো দুঃখ পেয়ে তাঁর ঘরে এসেছে। কতো বিশ্বাস নিয়ে তাঁর ঘরে এসেছে।

এই যাওয়ার কথাটা তো তিনি জানতেনই না। গোবর্ধনকে দিয়ে বলে পাঠান হলো। কেন ? একবার নিজে এসে দাঁড়াতে পারলো না ? নিজে এসে বললে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেতো ? মুখোমুখি কথা বললে নিশ্চয়ই তিনি তাঁর মতটা জানিয়ে দিতেন। চিরঞ্জীব মুখার্জির স্ত্রী সীতা মুখার্জি গিয়ে কোথায় কোন আশ্রমে আয়ার কাজ করবে একথার তিনি ঘোরতর প্রতিবাদ করতেন। ঠিক আছে থাক, যেখানে খুশি যাক, যা খুশি করুক, তাঁর তো আর কোনো দায় দায়িত্ব রইলো না ভালোই হলো।

কাল সারারাত এই একই ভাবনায় জ্বলেছেন, বারে বারে উঠেছেন, বসেছেন, জল খেয়েছেন, আর ভেবেছেন, কেন তিনি তাঁর সম্পর্কের জোরটা খাটাবেন না। অবশ্যই সে অধিকার তাঁর আছে। কিন্তু ভাবা পর্যন্তই কাজে আর করে উঠতে পারেন নি। ভদ্রতার দায় বড়ো বিষম দায়। সেইজন্য সকাল না হতেই বাড়ি থেকে পলাতক। শুনেছেন ন'টা সাতচল্লিশে গাড়ি

ছাড়বে, তার মানে সীতা বাড়ি থেকে ন'টাতেই বেরুবে। তিনি ঢুকবেন তার পরে।

কিন্তু ঢুকে সেই শূন্য বাড়িতে কী করবেন? কেমন করে থাকবেন? অসম্ভব। অসম্ভব। ঠিকানাটাও তো জানেন না।

এর পরেই তাঁর ভাবনা উল্টো গতি নিল। সীতার কী দোষ? বাড়ি তাঁর, সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁর, সীতাকে তিনি যে চুক্তিতে থাকতে দিয়েছেন, কী সাহসে সীতা তার বাইরে পা বাড়াবে? সাধারণ মেয়ে হলে হাতে পায়ে ধরতো, সীতার মতো মেয়ে মরে যাবে তবু অপমানের সঙ্গে ঘর করবে না। যেদিন এসেছিলো, দাবি নিয়েই এসেছিলো। চিরঞ্জীব মুখার্জিকে অনেক অনেক বড়ো ভেবেই এসেছিলো, নিজ মুখেই বলেছে দশ বছর যাবত তাঁকেই সে তার শ্রদ্ধার উচ্চাসনে বসিয়ে রেখেছে। তার মানে কি এই দাঁড়ায় না, সেই থেকে, মানে মার সেই প্রস্তাবের পর থেকেই মন তার তাঁর প্রতি আকৃষ্ট। তাই যদি না হবে তবে সেদিন আত্মহত্যা করতে না পেরে সেই বিপন্ন মেয়ে তাঁর পতিত্বই প্রার্থনা করবে কেন? তিনি অন্ধ, দেখেও দেখেন নি, বুঝেও বোঝেন নি, দান গ্রহণ করেছেন, প্রতিদানের কথা মনে পড়েনি।

ঘড়ি দেখলেন, আর অমনি দৌড়ে গিয়ে একটা সাইকেল রিক্সা ধরে উঠে পড়লেন। স্টেশনে গিয়ে পৌঁছতে পৌঁছতেই ছেড়ে দিল ট্রেন। বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন। ছোট্ট একটা ভিড় চোখে পড়লো। সীতাকে ঘিরেই সেই ভিড়। প্রকাশ্য দিবালোকে এতোগুলো লোকের চোখ এড়িয়ে সে এবারও আত্মঘাতী হতে পারে নি। একজন কুলিই 'হেই দিদিমণি কী করছো' বলে তাকে আটকে দেয়। কিন্তু সীতা নিজে বলছে, মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলো, এই লোকটি তাকে রক্ষা করেছে।

একই রিক্সায় পাশাপাশি বসে নিঃশব্দে বাড়ি ফিরতে ফিরতে চিরঞ্জীব বললেন, তুমি কার উপরে প্রতিশোধ নিচ্ছিলে? আমি তোমার কী ক্ষতি করেছি?

চুপ করে থেকে সীতা বললো, কারো উপরেই নয়। আপনাকে ছেড়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই আমার কাছে অনেক সহনীয় বলে মনে হয়েছিলো।

ইষ্টিশানের মিষ্টিফুল

অপুষ্টিজনিত অপুরন্ত গড়ন নিয়ে তেরো বছর বয়েস পর্যন্তও কোনো অসুবিধে ছিলো না, কিন্তু তারপরেই কেমন অন্য রকম হয়ে গিয়ে হঠাৎ ভারি মুশকিলে পড়ে গেল।

কাপড় চোপড়ের মধ্যে তার দুটি ছেঁড়া ময়লা চটচটে হাফ প্যাণ্ট, ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে পাওয়া ছেড়া পাতলা একটা গেঞ্জি, আর কালো একটি ঢলঢলে সার্ট। এই বসনভূষণ নিয়েই ছুটোছুটি করে কাজকর্ম বাগিয়ে চলে যাচ্ছিলো একরকম, কিন্তু চোদ্দয় পা দিয়ে সহসা পরিস্থিতি একেবারে অন্যরকম হয়ে উঠলো। অর্থাৎ সে মেয়ে বলে পরিগণিত হলো। এতোদিন ছেলে কি মেয়ে এই সচেতনতা একবিন্দুও ছিলো না। তার জন্ম কর্ম সবই এই শিয়ালদা স্টেশনে। শুনেছি তাদের বাড়ি পাকিস্তানে ছিলো, বাবা কর্মকার ছিলো, বাড়িতে দাদু ঠাকুমা কাকা কাকিমা মা বাবা এবং সকলের ছেলে মেয়ে নিয়ে বিরাট পরিবার ছিলো। এও শুনেছি যখন সকলে তার মাকে বন্ধ্যা বলে গাল দিতে শুরু করেছে তখনি সে পেটে এসে তাকে সেই কলঙ্ক থেকে মুক্তি দেয় এবং তার বাবা ব্যবসায় দারুণ উন্নতি করে। সুতরাং অদেখা ভ্রূণস্থ শিশুর জন্য সকলেরই যথেষ্ট আগ্রহ এবং আদরের সৃষ্টি হয়। অনেক ঘটা পটা করে, ঠাকুর পুরুত ডেকে, জ্ঞাতি গুষ্ঠি খাইয়ে সপ্তামৃত হয়েছিলো মায়ের। কথা ছিলো সাধে আরো ঘটা হবে, আর ভালোয় ভালোয় যদি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তখন কালীমোহন কর্মকার, অর্থাৎ তার বাবা নাকি আরো যা উৎসব করবে তা এখন জানাবে না।

তখন বাবার বয়েস চল্লিশ, মায়ের তিরিশ। এবং কালীমোহনের বিয়ে হয়েছিলো তার অন্তত কুড়ি বছর আগে। সুতরাং এই সম্ভাবনা একান্তই আঁধারে আলো।

কিন্তু জন্ম পর্যন্ত তো দূরের কথা, সাধ পর্যন্তও এগুনো গেলো না। দেশ পাকিস্তান হয়ে গেল, মার খেয়ে বিতাড়িত হিন্দুর দল সর্বস্ব খুইয়ে শুধুমাত্র পৈতৃক প্রাণটুকু নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে একদিন শিয়ালদা স্টেশনে এসে পৌঁছুলো। পৌঁছে তার ঘোমটা টানা মা তাকিয়ে তাকিয়ে কোথাও স্বামীকে দেখতে না পেয়ে উচ্চৈস্বরে কেঁদে উঠলো, আর তখুনি ব্যথা উঠলো। দলের মধ্যে তাদের কাকা কাকিমা ঠাকুমাও ছিলো। কাকা

কাকিমা যে যার কোথায় চলে গেল ছেলে মেয়ে নিয়ে, ঠাকুমা বসে রইলো শিয়রে। জন্ম হলো তার। জন্মের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে হাত পা খিঁচিয়ে ধনুষ্টংকার হয়ে মরে গেল মা, ঠাকুমা বুকে তুলে নিয়ে শুকনো দুধ চাটাতে লাগলেন। অবশ্য আর একজনের ভরা দুধ সে পেলো। সে হওয়ামাত্রই যেমন তার মা মারা গেছে, এর আবার বাচ্চা মারা গেছে। বুকভরে দুধ এসেছে, ফুলে জ্বর হয়ে যাচ্ছে, খাবার শিশু নেই। খবর পেয়েই ঠাকুমা দৌড়ে গেল তাকে নিয়ে, চোখবুজে পরিতৃপ্তি সহকারে পেট ভরে খেয়ে সে আরো ঘুম দিল। সাতবছর পর্যন্ত বেঁচেছিলো ঠাকুমা। তখন আদর ছিলো, চুমু ছিলো, কোলের কাছে নিয়ে শোয়া ছিলো, কোথায় কোথায় ঘুরে খাদ্য সংগ্রহ করে এনে ইটের ফাঁকে আগুন জ্বালিয়ে রান্না করার পাট ছিলো, কষ্টে দুঃখে হলেও ছিলো সবই। এখন আর কিছুই নেই। শুধু নামটা আছে। ঠাকুমার দেওয়া নাম, দুঃখী।

ঠাকুমা দেখতে খুব সুন্দর ছিলো, ছেলেবেলা থেকে স্বর্ণকারের মেয়ে স্বর্ণকারের বৌ স্বর্ণকারের মা হয়ে ধনে দৌলতে সে সৌন্দর্য ম্লান হবার অবকাশ পায়নি। প্রথম যখন নিরুপায় হয়ে ঘোমটা টেনে ভিক্ষায় নেমেছিলো, লোকেরা ভিক্ষুক জ্ঞানে ভিক্ষা দেয়নি, দিয়েছে ভদ্রঘরের বৌ দুর্দশায় পতিত হয়েছে বলে। কিন্তু ঠাকুমা তাকে নিয়ে কখনো ভিক্ষায় বেরোয়নি। সেটা বেশী দুঃখ, বেশী লজ্জা। বলেছে ঘুরে ঘুরে মরে যাবি। তুই থাক, এই দাগ দেওয়া ঘরে বসে বসে খেলা কর, আমি আসি। যখন খুব ছোটো তখন ঐ দুধ-মা তো ছিলোই, অন্যদের হেপাজতেও রেখে যেতো। একটু বড়ো হয়ে দুঃখী আর বসে থাকেনি। হাতে পায়ে চঞ্চল মেয়ে ছুটে ছুটে সকলের কাজ করে দিয়েছে। সবাই বলে সেও নাকি তার ঠাকুমার মতোই সুন্দর হবে। আয়না তো নেই, তাই দেখেনি। ঠাকুমা মরে যেতে খুব কেঁদেছে কয়েকদিন। ওদিকে দুধ মাও মরে গেছে সে গেছে ঠাকুমার আগেই। সে অসুস্থাই ছিলো, মনের দুঃখে আর সুস্থ না হয়ে মরে বেঁচেছে। পুরোনো লোকরাও আস্তে আস্তে কে কোথায় চলে গেছে।

শতচ্ছিন্ন হাফপ্যাণ্ট আর সার্ট পরে, স্টেশনের কুলিগিরি নিয়ে সে এখানেই আছে। যা পয়সা পায় তাতে মাসে একবার চুলে বাটি ছাঁট দিয়ে, চা রুটি খেয়ে চমৎকার কেটে যাচ্ছিলো, কিন্তু এই তেরো বছর পার হয়েই যতো ঝামেলা।

ছেঁড়া সার্ট ছেলেদের বুক ঢাকে, এতোদিন সে নিজেও ছেলে ছিলো. তাই তার ঢাকতো। এখন গামছাটা কোমরে বা মাথায় না বেঁধে বুকের উপর দিতে হয়। যারা তাকে কুলি হিসেবে মোট নিতে ডাকে সবাই ছেলে বলেই ডাকে। কুলির সর্দারটাও তাই জানে। কিন্তু তাকে ড্রেস দেয়নি, নম্বর দেয়নি। কেন দেয়নি কে জানে। তার জন্য নাকি আবার কী নিয়ম কানুন আছে। মেয়ে হলে যে ভীষণ মুশকিল তা সে জানে। এখানে টেঁপি মেয়ে ছিলো, গুণী মেয়ে ছিলো, পুঁটি মেয়ে ছিলো, কী ফাট! ছেলেগুলো ছিঁড়ে খেতে চেয়েছে। শেষে তারা পালিয়ে কোথায় চলে গেছে।

ঐজন্যে সে জীবনেও মেয়ে হতে চায়নি। বনে যেমন বাঘের ভয়, তার চেয়ে বেশী ভয় সংসারে অরক্ষিত মেয়ের। ভগবানটা যেন কী! এ ভাবে কেউ বিশ্বাসঘাতকটা করে!

চায়ের দোকানের বাবু তাকে খুব ভালোবাসে। বলে,—এই ছোকরা আমার বাড়িতে কাজ করবি? খাবি দাবি মাইনে পাবি।—কেন করবো না বাবু। পেলেই করবো। কিন্তু করেনা। ঘুরে ঘুরে ছুটে ছুটে মাল বয়ে বিড়িটা আধটা খেয়ে ইচ্ছেমতো শুয়ে ঘুমিয়ে, রেডিয়োয় শোনা কিশোর-কুমারের গান গেয়ে বেশ দিন কাটে তার। কেন সে বন্দী হতে যাবে লোকেদের বাড়িতে? তারপর টের পেয়ে গেলে? না, মরে গেলেও সে মেয়ে হবে না।

কিন্তু এখন? এখন কী করবে?

কয়েকদিন আড়ে আড়ে ঠারে ঠারে, লুকিয়ে পালিয়ে সচেতন হয়ে শীত করে বলে গামছা গায়ে দিয়ে কাটিয়ে কাটিয়ে চমৎকার একটা পুরোনো কোট পেয়ে গেলো। আলপাকার কোট, পোকায় কেটেছে, সৌদামিনী দিদা এনে তাকে দিল। বললো, ইস্টিশন ছেড়ে তো নড়বিনা, দ্যাখ গিয়ে, ঐ গম্বুজওলা বড়ো বাড়ির লোকেরা আরো কতো দিচ্ছে। এই সৌদামিনী তার ঠাকুমার সঙ্গে ভিক্ষায় বেরুতো, এক দাগের ঘরে শুতো, ঝগড়া করতো না। সেই থেকে তাকে ভালোবাসে।

আলপাকার কোট গায়ে দিয়ে বাটি ছাঁটা চুল নিয়ে বড়ো হয়ে ওঠা দুঃখী তার মেয়েত্ব ঢেকে এতোদিন বাদে পা দিল স্টেশনের বাইরে। গম্বুজওলা বাড়িটায় যাওয়া দরকার। এখন শীতকাল, শীত ফুরোলে গ্রীষ্মেও কি এই কোটটা সে সর্বক্ষণ গায়ে দিয়ে থাকতে পারবে? কুটকুট করবে না? যদি বা আর কিছু পাওয়া যায়। একটা প্যাণ্ট পাওয়া তো জরুরী। কে জানে, বন্ধু বান্ধবরা কে কোন ফাঁকে ধরে ফেলবে সে মেয়ে। কেননা প্যাণ্টটা শুধু তো ছেঁড়াই নয় ঢিলাও ভীষণ। কতো সাবধানে যে বসতে হয়। বেরিয়ে দেখা গেল, গম্বুজওলা বাড়িটা সৌদামিনী ঠাকুমা যতো কাছে বলেছে, মোটেই ততো কাছে নয়। রাস্তা পার হয়ে আরো অনেকটা গেলে আবার ডাইনে ঢুকে তবে। স্টেশনের বাইরের চত্বরে এসে সে অনেক দাঁড়িয়েছে, গাড়ি ঘোড়া ট্রাম বাস দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে গেছে লোকজন দেখতে দেখতে খাওয়া-দাওয়া ভুলে গেছে, তারপর আবার ট্যাক্সী আসতে দেখেই সনন্দ হয়ে দৌড়েছে মাল টানতে। মেয়ে তো! তার উপরে দেখতে খুব ছোট্ট খাট্ট। এই সেদিন পর্যন্তও তো সবাই তাকে আট দশ বছরের ছেলে ভেবেছে। হঠাৎ যে কেন এমন দামিয়ে উঠলো শরীর কে জানে। তবুও মাথায় তো ছেলেদের মতো বাড়েনি তাই আলপাকার হাঁটু পর্যন্ত লম্বা কোটে তাকে মেয়ের সাজ পরলে যতো বড়ো লাগতে পারতো তা লাগছে না। এখন দশ এগারো বছরের বালক বলে মনে হচ্ছে। সেই চেহারা নিয়ে, বড়ো বড়ো চোখে সে টলটল করে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে দূরের বাড়িটায় যাবে কিনা ভাবছিলো। চত্বরে দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখা, লোক দেখা আর ট্রাম বাস দেখা এক জিনিস।

নেমে তাদের সঙ্গে মিশে দূরের রাস্তায় যাওয়া অন্য। এর চেয়ে সৌদামিনী ঠাকুমার সঙ্গ ধরাই ভালো ছিলো। কিন্তু সে যে কখন কোন সকালে বেরিয়ে যায় টের পায় না দুঃখী। তখন সে ঘুমিয়ে থাকে। অবশ্য এত ভয়েরই বা কী আছে! কতো লোক তো যাচ্ছে। ছোটো ছোটো বাচ্চারা পর্যন্ত। তবু সঙ্গ ধরলো। হাতে রেশনের ভারি থলি নিয়ে কেৎরে কেৎরে যে ছেলেটা চলে যাচ্ছিলো, তার পিছে পিছে হাঁটতে লাগলো। একসময় ছেলেটা বললো, এই তুই কে রে? তখন থেকে আমার সঙ্গে সঙ্গে আসছিল?

দুঃখী বললো, রাস্তাটা কি একা তোমার যে আর কেউ হাঁটতে পারবে না।

এক থাপ্পর লাগাবো—ছেলেটা মারমুখী হয়ে ঘুরে দাঁড়ালো।

ইস্টিশনের কুলি হলেও দুঃখী খিস্তিখেউর ঝগড়ায় পটু নয়। মাত্র এক পুরুষের ভিক্ষুক তো গৃহস্থ বক্ত তখনো টাটকা। তা ব্যতীত জন্মটা পথে হলেও ভদ্র ঠাকুমার ভদ্র আদরে সাতটা বছর সে ভদ্রভাবেই লালিত হয়েছে। স্টেশনে কারো সঙ্গেই তার ঝগড়া নেই, কারো সঙ্গেই তার বিরোধ নেই। আলস্যও নেই বলে যে যা বলে অমনি অমনিই করে দেয় কতো সময়। সেজন্য ভালোও বাসে সকলে। তার বয়সী সব ছেলেরা যখন বসে বসে গুলতানি করে, সে সুন্দর করে মুড়ি মেখে দেয় তাদের, ছাতু মেখে দেয়। বুড়ো কুলিয়া যখন বলে, এ দুখিয়া, একটু হাত পা টিপে দিবি? অমনি টিপতে বসে যায়। তাই এই বাধ্য নির্বিবাদী ছোটো ছেলেটাকে সকলেই মায়া করে, ভালোবাসে। বলা যায় ধমক ধামক করেই না কেউ।

এই ছেলেটা থাপ্পর মারবো বলায় সে ঘাবড়ে গেল। ছেলেটা তার চেয়ে বেশ একটু বড়ো, চেহারাটাও রাগী রাগী।

দুঃখী চুপ করে থেকে বললো, তুমি কদ্দুর যাবে?

তাতে তোর কী? ভাবছিস ছিনতাই করবি?

না, না, ছি, আমি কেন ছিনতাই করবো? দুঃখী জিব কাটলো, আমি ইস্টিশনে বাবুদের মাল তুলি, ছিনতাই করি না।

তবে আমার পিছে পিছে আসছিস যে?

বলবো?

না বললে তোকে কি আমি ছাড়বো?

আমি ঐ গম্বুজওলা বাড়িটায় যাবো।

গম্বুজওলা বাড়িটায়? তা যা না, আমার সঙ্গে কী?

আমি ইস্টিশনের কুলি, সব সময়ে ইস্টিশনেই থাকি। আজই প্রথম বাইরে এসে খুব ভয় ভয় করছে. তাই তোমার সঙ্গে রাস্তা পার হয়ে, সঙ্গে সঙ্গেই হাঁটছিলাম।

মিথ্যুক।

তুমি ইস্টিশনে চলো, যাকে জিজ্ঞাসা করবে সেই আমাকে চেনে, তখন দেখো আমি কোনোদিন কারো কিছু নিয়েছি কিনা।

ছেলেটা হাতের ভারী থলি দুটো পথে নামিয়ে দম নিল। বললো, আচ্ছা, আমার এই থলিটা যদি তুই বিনি পয়সায় ঐ গম্বুজওলা বাড়ি পর্যন্ত

নিয়ে যাস তবেই বুঝবো তুই সত্য কথা বলছিস।

দুঃখী তক্ষুনি রাজী, দাওনা, আমি অনেক ভারি মাল নিতে পারি।

তবে দুটোই নে দেখি কেমন পারিস।

তবে একটা মাথায় দাও, একটা হাতে দাও।

বদমাইসী করে পালাবি নাতো?

না না। দুঃখী হাসলো। আমি কি বাবুদের মাল নিয়ে পালাই?

তবে নে।

ছোটো থেকে মালটানায় অভ্যস্ত দুঃখী এই মাল নিয়ে সামান্য বেঁকে গেলেও তেমন বিপন্ন বোধ করলো না। বরং ছেলেটার সঙ্গে গল্প করতে করতে পথটা পার হতে ভালোই লাগলো তার।

ছেলেটা বললো, তোর নাম কী?

দুঃখী।

কুলিগিরি করে তোর পেট ভরে?

হ্যাঁ-এ্যাঁ-এ্যাঁ।

কী খাস?

ছাতু, রুটি, চা, ভাত, যখন যেমন পাই।

তোর মা বাবা নেই?

না।

আমারও মা নেই কিন্তু বাবা আছে। সৎমাও আছে। সে আমাকে খুব খাটায়, মারে, স্কুলে পড়ায় না—এই দেখছিস না জোচ্চুরি করা সব কার্ড দিয়ে কতো র‍্যাশন ধরিয়েছে—

বেশী ধরে কী হবে?

যা লাগবে খাবে, বাদ বাকী ব্ল্যাক।

ব্ল্যাক কী?

তুই দেখছি একটা রাম হাঁদা। এই বিদ্যে বুদ্ধি নিয়ে ইস্টিশনের কুলি? ইস্টিশনের মিষ্টি ফুল, সাধের বাগান গোলাপ ফুল।

কবিতা বলছো? আমি ও একটা জানি। আমার ঠাকুমা শিখিয়েছিলো, পারিবে না এ কথাটি বলিও না আর, কেন পারিবে না তাহা ভাবো একবার।

এই শোন—

কী?

আমি যদি কুলি হই কেমন হয় রে?

খুব ভালো।

এই সৎ মায়ের হাত থেকে আমি ঠিক পালাবো। আমাকে তো ওরা চাকর খাটায়। শুধু কি র‍্যাশন? হাট বাজার উনুন ধরানো, বাসন মাজা, ভাইবোনদের স্কুলে দিয়ে আসা—

তোমার বাবা কিছু বলে না?

বাবা বলবে? তাহলেই হয়েছে। বাবা তো বৌ-এর কথায় চলে। যা তা নালিশ শুনে একেক দিন খড়ম দিয়ে কী মার মারে!

আহারে!

গুড়ের ব্যবসা করে তো? খুব লাভ। পাকা বাড়ি করে ফেলেছে, মা কতো গয়না গড়ালো, আমার এদিকে এই একটা পুরোনো বুশ সার্ট আর এই একটা ছেঁড়া প্যাণ্ট। আর ভাইদের? ওরে বাবা—

তবে তো তোমার খুব দুঃখ।

তোর মতোই।

না না আমার কোনো দুঃখ নেই, আমাকে কেউ বকে না মারে না, এই তুমিই প্রথম থাপ্পর দিতে চাইলে। ছেলেটা এবার হাসলো। রাগ ভাবটা কমেছে। নরম করে জিজ্ঞেস করলো, গম্বুজওলা বাড়িটায় কেন যাবিরে?

ওরা অনেক জামা কাপড় বিলোচ্ছে, আমার তো কিছু নেই? তাই ভাবছি, যদি পাই—

পথ শেষ হয়ে গেল, এবার দুজন চলে গেল দুদিকে। কিন্তু কয়েক-দিনের মধ্যেই ছেলেটাকে ইস্টিশনে ঘোরাঘুরি করতে দেখে দৌড়ে এলো দুঃখী, ওমা, তুমি!

এই তো তুই। তোকেই আমি খুঁজছিলাম।

কেন?

আমিও কুলিগিরি করবো। এই দ্যাখ, আজ আমাকে কী ভয়ানক মেরেছে। আমিও ছাড়িনি। সহ্য করতে না পেরে আমিও একটা লাঠির বাড়ি দিয়ে পালিয়ে এসেছি। এরপরে আর তো ওখানে যাওয়া যাবে না।

কিন্তু এখানে যে বাইরের লোককে ঢুকতে দেয় না।

তুই একটা বন্দোবস্ত করে দে লক্ষ্মীটি—

আচ্ছা দেখি। তুমি বরং এক কাজ করো, আজকাল রাত্তিরে রেল লাইনের ওপিঠে ফাঁকা জায়গায় থাকি আমি। ভিতর থেকে সব তাড়িয়ে দিচ্ছে তো? বদলে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছি। দেখবে একটা মাটির ঢিবি, ঠিক তার পিছনে একটা গোলপাতার ভাঙা ঘর। একটা কুকুর আছে, বাচ্চা দিয়েছে তিনটে, তাকে দেখলেই চিনতে পারবে ঘরটা, এখন চলে যাও সেখানে, তারপরে বসে দেখি ঢোকানো যায় কিনা। খুব পুলিশ লেগেছে কদিন। বড্ড চুরি ডাকাতি হচ্ছে—

ছেলেটার সঙ্গে দেখা হলো আবার রাত্তিরে। সারাদিনে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলো। আজ খুব মাল টানাটানি হয়েছে, বেশ ভালো রোজগার হয়েছে, খুশিমনে গান গাইতে গাইতে ঘরে এসেছিলো। কুকুরটা গড়িয়ে পড়ে আহ্লাদ করে অভ্যর্থনা করলো। মনের সুখে বড়ো পাউরুটি নিয়ে এসেছিলো, দুখণ্ড দিলো তাকে। চার আনার আলুর ঝোল কিনে এনেছিলো, বললো, এটা তোকে দেবো না, নতুন বাচ্চা হয়েছে ঝোল ঝাল খেলে অসুখ করে। তারপর চালের তলায় পা দিয়েই ছেলেটাকে শুয়ে থাকতে দেখে দাঁড়িয়ে গেল সেখানে।

বেহুঁসে ঘুমুচ্ছে। যেন নিজের বাড়ি। একদম খিঁচরে গেল মনটা। সত্যি যদি সে ছেলে হতো হয়তো বা অন্ধকারে একলা কোণে মাঠের মধ্যে এই

ভাঙা চালের তলায় আর একটা লোককে সঙ্গী পেয়ে সে বেঁচে যেতো। কিন্তু তা তো নয়। এমন কি এই ছেলেটাও যদি একটা মেয়ে হতো তা হলেও কোনো ঝামেলা ছিলো না। এখন কী করে?

ছেলেটা পাশ ফিরে বললো, জল, জল। ঘরের কোণের কলসী থেকে জল দিতেই হলো। শুনেও জল দেবেনা তাতো আর হয় না। টি টি পক্ষী হবে নাকি শেষে। জল দিতে গিয়েই বুঝতে পারলো আসলে ছেলেটা ঘুমে বেহুঁস নয়, জ্বরে বেহুঁস। তখন কষ্ট হলো। তখন ছেলেমেয়ের প্রভেদ ভুলে, ভয় ভুলে নিজের ছেঁড়া কাঁথাটা চাপা দিয়ে দিল। সাতদিন ভুগলো। আর এই সাতদিনই তাকে থাকতে দিতে হলো, খেতে দিতে হলো, তারপর ভালো হয়ে বাইরে বসলে বললো, এবার যাও।

ছেলেটার নাম অজিত। অজিত বললো, কোথায় যাবো? দুঃখী বললো, তার আমি কী জানি? অজিত চুপ করে রইলো। দুর্বল হয়ে গেছে খুব। মোট বইবে এমন শক্তি ওর নেই। দয়া হলো দুঃখীর। তবু স্টেশনে যাবার আগে বলে গেল, এসে যেন দেখি চলে গেছ। আমার খুব অসুবিধে হচ্ছে।

দু'জনের খাবার সংস্থান করতে হয় বলে, আজকাল হাত পা ছড়িয়ে যে একটু বসবে, সময়ই হয় না। উপরন্তু চায়ের দোকানের কাপ ডিশ ধোয়ার কাজটাও নিয়েছে। বড়ো বড়ো মেইল ট্রেনগুলো এলে ছুটে যায়, তার ফাঁকের অবসরে কাপ ডিশ ধোয়।

বলে গেল বটে এসে যেন না দেখি, মনে মনে প্রার্থনাও করলে সেটা, তবু ফিরতে ফিরতে সে কথা ভেবে রাত্রিবেলা বেশ একটু কষ্ট হলো। আর ঘরে এসে যখন দেখলো সত্যিই সে চলে গেছে জল এসে গেল চোখে। দুটো রুটি নিয়ে এসেছিলো, দুজনের মতো আলুর ঝোল নিয়ে এসেছিলো, একা একা আর খেতে ইচ্ছে করলো না।

চুপচাপ শুয়েছিলো, চোখে ঘুম আসছিলো না, রাত বাড়ছিলো, হঠাৎ কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে ওঠায় ভয় পেয়ে গেল। আর তারপরেই ছেলেটা শিস দিয়ে বললো, কী রে লালু, আমাকে চিনিস না?

দুঃখী অবাক হয়ে চালের তলা থেকে বাইরে এসে বললো, একী। তুমি যাওনি? কোথা থেকে এলে?

আকাশে চাঁদ উঠেছে, ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না, একটু হেসে অজিত বললো, এই যে। একেবারে কড়কড়ে চারটে টাকা হাতে দিল সে, আমার সারাদিনের রোজগার।

তার মানে?

তুই তাড়িয়ে দেবার পরে দুপুরে সত্যিই আমি চলে গিয়েছিলাম। কী করি ভাবতে ভাবতে একটা জায়গায় গিয়ে দেখি আমার মতো ছেলে দৌড়ে দৌড়ে ট্যাক্সি ডেকে দিচ্ছে বাবুদের, গাড়ি পাহারা দিচ্ছে, মুছে দিচ্ছে। রেঁস্তোরায় খেতে যাচ্ছে তারা, বেরিয়ে এসে মোছাচাছা পরিষ্কার গাড়ি নিরাপদে আছে দেখে পয়সা দিচ্ছে তাদের। দৌড়ে দৌড়ে ট্যাক্সী ডাকার

সাধ্য আমার নেই, কিন্তু গাড়ি দেখা আর মোছা সেটা করতে পারলাম। এতোরাত পর্যন্ত তাই করছিলাম। আজ রাতটা আমায় থাকতে দে, কাল যেখানে হয় চলে যাবো।

এসো। ডেকে নিল দুঃখী, বললো, টাকাটা আমায় দিচ্ছ কেন, টাকা দিয়ে আমি কী করবো! বসো, খেয়ে নাও আগে। রুটি তরকারী এনেছি।

তুই খেয়েছিস?

এইবার খাবো।

খেতে খেতে অজিত বললো, আচ্ছা দুঃখী, তোর বয়স কতো রে?

ঠাকুমা মরেছে আমার সাত বছর বয়সে, তারপরে ছ'বছর কাটলো।

মানে তেরো?

হ্যাঁ।

তোর নাম দুঃখী কেন রেখেছে?

দুঃখের মধ্যে জন্ম, তাই।

দুঃখিনী রাখা উচিত ছিলো।

দুঃখী বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠে বললো, কেন?

লেখাপড়া তো শিখিসনি তাই জানিসনা দুঃখীর স্ত্রীলিঙ্গ দুঃখিনী। আমি ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছি, জানিস? আমার মা তখনো বেঁচে ছিলো কিনা! আব আমি ছিলাম মাত্র একজন। অজিত দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। দুঃখীর বুকটা ঢিপ ঢিপ করছিলো, সে খেতে পারছিলো না, ভয়ে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিলো। বুঝতে পারছিলো এই সাতদিন একত্র থাকার ফলে যে ত্রাসে সে সর্বদাই শঙ্কিত সেই ত্রাসের কারণটা জেনে ফেলেছে ছেলেটা। মনে পড়লো খুব জ্বরের সময় যখন নিচু হয়ে মুখে জল দিয়েছে বা খাবার দিয়েছে বা মাথা ধুয়ে দিয়েছে তখন ঘোর ঘোর চোখেও যেন কী আবিষ্কাব করেছে অজিত।

হঠাৎ উঠে পড়ে বললো, শোনো, আমি আবার স্টেশনে যাচ্ছি, আজকে আমাদের সব কুলিদের একটা মিটিং আছে। তুমি থাকো, সকালে চলে যেও।

অজিতের আঠোরো বছর, বয়েস, সংমায়ের তাড়না সত্বেও মুখশ্রী সুকুমার, স্বাস্থ্য সতেজ। হেসে বললো, আমাকে ভয় পাচ্ছিস?

ভয়? কেন? ভয় পাবো কেন?

তবে চলে যাচ্ছিস কেন?

আমি কি তোমাব ঘরে আছি, যে ভয় পাবো? আমি ইস্টিশনের কুলি, আমার মতো আরো কতো ছেলে সেখানে কুলি খাটছে, তারা আমার বন্ধু, আমার কোনো ভয়ের কারণই নেই, তারাই আমাকে রক্ষা করবে।

ছেলে হলে করতো। কিন্তু মেয়ে হলে কি করবে?

মেয়ে! এখানে তুমি মেয়ে দেখলে কোথায়? বলতে বলতে দুঃখী পায়ে পায়ে বাইরের দিকে চলে এলো, যাতে সুযোগ মতো এক দৌড়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে পারে।

অজিত নিস্পৃহভাবে তেমনি বসে থেকে বললো, এই সাতদিন আমি তোর সঙ্গে আছি, পাঁচদিন ধরে জানি তুই মেয়ে, হঠাৎ এতো ভয় পাচ্ছিস কেন? আমি মনে মনে একটা কথা ঠিক করেছি।

কী কথা! দুঃখী ঢোক গিললো।

আমি তোকে বিয়ে করবো।

বিয়ে!

আমার খুব পছন্দ হয়েছে তোকে, আমাকে তোর ভালো লাগে না?

দুঃখী স্তম্ভিত বিস্ময়ে তার তেরো পূর্ণ চোদ্দোয় পা দেওয়া কিশোরী হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করে তাজ্জব হলো। এই অনুভূতি তার চেনা নয়।

অজিত বললো, তুই আমার বৌ হবি, আমি তোর বর হবো। দুজনে মিলে খেটে খুটে যা আনবো আমাদের ঠিক কুলিয়ে যাবে। কিন্তু বিয়েটা দেবে কে, বলতো?

দুঃখী চুপ।

কালীঘাট জানিস? সেখানে নাকি গরীব দুঃখী সকলেই খুব কম পয়সায় বিয়ে করতে পারে। যাবি সেখানে?

আস্তে আস্তে ঘরে এলো দুঃখী, উল্টোদিকের ছেঁড়া মাদুরে বসলো, কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, তুমি সত্যি বলছো?

মিথ্যে কেন বলবো? আমি কক্ষনো মিথ্যে কথা বলি না।

একবার বলেছিলাম, তারপরেই আমার মা মরে গেল।

তা হলে—

তুই আমাকে যা বলবি তাই আমি করবো। তুই ঘুমো, নিশ্চিন্ত মনে ঘুমো। ভয় ছাড়। কোনো মেয়েছেলের গায়ে কি কোনো ভদ্রলোক হাত দেয়? আর যে আমার বৌ হবে, তাকে কি আমি নোংরা করতে পারি? বসা থেকে শুয়ে পড়লো সে। ভাঙা ঘরে জ্যোৎস্নার ঢেউ, ঘুম ঘুম গলায় বললো, চাকরি আমি ঠিক পাবো, একটু দেরি হবে হয়তো, হোক। তোকে আমি আর তখন ছেলে সেজে কুলিগিরি করতে দেব না। দুঃখী কি ঘুমুলি?

না।

তোকে শাড়ি কিনে দেব। কাচের চুড়ি কিনে দেব। দুঃখী, তোকে আমি খুব ভালোবাসি, খুব ভালোবাসি। তুই ঠিক আমার মায়ের মতো ভালো।

দুঃখীর বুকে বীণা বেজে উঠলো। দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী মেয়ে হয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লো কখন।

সেইদিন সকালে

অনুরাধা মিত্রর বয়েস বত্রিশ, কোনো একটি মেয়ে কলেজে সাত বছর যাবৎ পড়াচ্ছেন, আপাতত অধ্যক্ষার পদে উন্নীত।

চেহারা অত্যন্ত কাঁচা, মুখশ্রী লাবণ্যময়। মাথার চুল ঘন এবং খাট। বেশভূষায় খুব পারিপাট্য নেই, কিন্তু রুচি আছে। স্বভাব নরম, গলার স্বর নিচু, কথাবার্তা নম্র এবং মিষ্টি। দেখে মনেই হয়না এতোবছর মাষ্টারি করছেন। বত্রিশ বছর বয়সেও তাঁর স্বাভাবিক লাবণ্য বাইশ বছরের মেয়ের মতোই সতেজ।

এখন শীতের ছুটি, ভেবেছিলেন এই ছুটিতে এবার লম্বা ভ্রমণে বেরুবেন। কলেজের অন্য দু'জন সহকর্মিণী দক্ষিণ দিকে যাচ্ছেন, উদ্দেশ্য ওয়ালটেয়ারের রাগী সমুদ্র দেখে, গোপালপুরের ঠাণ্ডা সমুদ্রে স্নান করে ফিরে আসবেন। অনুরাধাও তাদের সঙ্গ নেবেন ঠিক ছিলো, হঠাৎ বদলে গেল সেই প্রোগ্রাম। এখন তিনি কলকাতা গিয়ে বিয়ে করবেন স্থির হয়েছে। অর্থাৎ এতোদিনে মনস্থির করতে পেরেছেন।

বিয়ে করে ছুটি কাটিয়ে এবারের মতো তিনি কর্মস্থলেই ফিরে আসবেন। তারপর চেষ্টা করবেন কলকাতা বদলি হতে। সরকারি চাকরি, বদলি হওয়া অসম্ভব নয়, হোমরা চোমরাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ও আছে কিছু। এর মধ্যে অবশ্য আরো দু'বার প্রস্তাব এসেছে, চেষ্টা চরিত্র করে থেকে গেছেন নিজেই। জায়গাটা খুব ভালো লাগে তাঁর। এ নিয়ে মা বাবা অনেক গঞ্জনা দিয়েছেন, তিনি গায়ে মাখেননি।

অনুরাধার ভাবী স্বামী ডক্টর মুন্সী একজন মস্ত ডাক্তার। অনেকদিন যাবৎই অনুরাধার পাণিপ্রার্থী। তিনি বহুকাল বিপত্নীক, কিন্তু কোনো সন্তানাদি নেই। কলকাতার দক্ষিণতম প্রান্তে নিরিবিলিতে মস্ত একটি বাড়ি কিনে সেখানেই বাস করছেন, অনুরাধার বাবাও বছর দু'য়েক যাবৎ তাঁর প্রতিবেশী হয়েছেন।

ডক্টর মুন্সী হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ এবং অনুরাধার মা রিউমেটিক হার্টের রোগী। সুতরাং প্রাত্যহিক ডাক্তার। বিশেষত মায়ের মেয়েটিকে দেখার পর থেকে তিনি যখন দর্শনী নিতে নারাজ হলেন, তখন থেকে ঘনিষ্ঠতাটা বেশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলো। ইদানিং বাড়ির মানুষ। ছুটি ছাটায় কলকাতা গেলে সর্বদাই অনুরাধার সঙ্গে দেখা হয়, মুখেচোখে যথেষ্ট প্রেমভাব ফুটিয়ে রাখেন, অনুরাধা এড়িয়ে চলেন।

তা বলে অনুরাধার যে অন্য কোনো প্রেমিক আছে তা নয়। আসলে বিয়েতেই তাঁর উৎসাহ কম। কেন কম তার কোনো সঙ্গত কারণ আছে বলে মনে হয় না। অনুরাধার মা বলেন, বইয়ের পোকা বই নিয়েই মত্ত থেকে থেকে আর কোনদিকে তাকাতে পারলো না। কথাটা সম্ভবত সত্য। অনুরাধা ছেলেবেলা থেকেই পড়াশুনোয় এক নম্বর। সব পরীক্ষাতেই তাঁর কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য রকমের ভালো। এম. এ. পাশ করে বৃত্তি নিয়ে ক্যালিফোনিয়ার কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পঁচিশ বছর বয়সে ডক্টরেট হয়ে ফিরে এসেছেন, এসে থেকেই উত্তর বাংলার বাসিন্দা।

অনুরাধার আরো দুটি বোন আছে, তারা দুজনেই বিবাহিত। দুজনেই সন্তানের জননী। দ্বিতীয় বোনটি অনুরাধার পাঁচ বছরের ছোট, তার পরেরটি তিন বছরের। দু'জনেই বি এ. পাশের উপরে আর ওঠেনি, মা বাবাও টানেননি। বরং ভেবেছেন, এদের উপর খরচ করে পণ্ডশ্রম ছাড়া যখন আর বিশেষ কিছু হবার নয়, তখন সুবিধে মতো পেলে বিয়ে দেওয়াই ভালো।

তিনবোনের মধ্যে সব দিক থেকেই অনুরাধা শ্রেষ্ঠ। লেখাপড়ায় তো বটেই, চেহারা চরিত্রেও তার সঙ্গে অন্য বোনেদের তুলনা হয় না। অনুরাধা শান্ত, বাধ্য এবং মা বাবার মতে, মা বাবার দুঃখ বোঝেন। অনুরাধাকে তাঁরা বলেন তাঁদের উপযুক্ত ছেলে। এক সময় অনুরাধাব অনুরাগীদের সংখ্যা অগণ্য ছিলো (এখনো নগণ্য নয়) কিন্তু অনুরাধাও যেমন তাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরেই নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন, তাঁর মা বাবাও মেয়ের সেই অস্বীকারকে মেনে নিয়ে পরোক্ষে অবিবাহিত থাকতে উৎসাহ দিয়েছেন। এই যোগ্য সন্তানটির উপার্জন তাঁর বাবার আয়ের সঙ্গে মিলিয়ে সংসারকে যথেষ্ট সচ্ছল করেছিলো। অনুরাধার মা অন্য দুটি মেয়েকে ভালোভাবে মানুষ করতে পেরেছিলেন অক্লেশে, বিয়েও দিতে পেরেছেন, সুতরাং তার আকর্ষণ কম নয়।

অবশ্য অন্য দুই মেয়ের বিয়ের আগে তাঁরা যে বড়ো মেয়ের বিয়ের কথাও না চিন্তা করেছেন তা নয়, তবে তেমন ভাবে নয়। বলেছেন, এমন মেয়ের জন্য কি ইচ্ছে করলেই মনোমত পাত্র পাওয়া যায়? তাছাড়া মেয়ে নিজেই যখন মাথা পাতছে না—

কিন্তু এখন তাঁর খুব ব্যস্ত। ডক্টর মুন্সীর মতো একজন শাঁসালো পাত্রকে তাঁরা হাতছাড়া করতে নারাজ। বলতে গেলে মা এখন রীতিমতো কান্নাকাটি সুরু করেছেন। বলছেন, তুই যদি এমন করিস আমি তবে বাঁচবো না। বয়েস তোর বত্রিশ পূর্ণ হয়ে গেল, এখনো যদি বিয়ে না করিস তবে আর কবে করবি? মেয়েদের মা হবারও তো একটা নির্দিষ্ট বয়েস আছে? সেই সময়টাকেও তো ধরবি?

মায়ের অন্য কান্নাকাটিগুলো তেমন ছোঁয়নি অনুরাধাকে। খুব অন্যায় ভাবে মনে হয়েছে মা বাবা সব সময়েই নিজেদের কথা ভেবেই কথা বলেন। পাশের বাড়িতে ডাক্তার জামাই বাস করা মানেই চিকিৎসার সুবিধে, আর এতো কাছে অনুরাধার মতো (যে মেয়েকে তাঁরা ছেলে বলেন) মেয়েকে

রাখতে পারা মানেই বিপদ আপদ প্রয়োজন বৃদ্ধ বয়েস—সব কিছুরই নিশ্চিন্ত নির্ভর। কেননা, অনুরাধা বিয়ে করুন চাই না করুন, এর আগে তাঁরা কোনোদিন এতো পীড়াপীড়ি করেননি, অথচ এর চেয়ে বা এর সমতুল্য সুপাত্র অনেকবার এসেছে গিয়েছে।

কিন্তু শেষের কথাটা প্রাণে লেগেছে অনুরাধার। শিশুদের ভীষণ ভালোবাসেন তিনি। এক সময়ে বোনেদের কম করেননি। বিশেষত ছোট বোন দেবযানীকে। যানু বলতে পাগল ছিলেন। এখন যানুর গাপ্পাগোপ্পা বছর খানেকের ছোট ছেলেটাকে দেখেও মনটা বেশ উদ্বেল হয়ে ওঠে। বলেছিলেন, তোর তো ঘন ঘন দুটো, এটাকে দে আমি পুষ্যি নিই। হেসে হেসে আদর করে চুমু খেতে খেতে ঠাট্টা করেই বলেছিলেন, কিন্তু সত্যি যদি যানু দিতে রাজী থাকতো, কী করতেন, বলা যায় না।

অবশ্য একথা ঠিক বত্রিশ পূর্ণ তেত্রিশ বছর বয়সের একজন মেয়ে এমন কিছু বয়স্ক নয় যে সন্তান জন্মাবার নির্দিষ্ট বয়সের শোকে এখ'ন মাথায় হাত দিয়ে বসতে হবে, তবে শেষ পর্যন্ত যদি বিয়ে করতেই হয় এবং সন্তানের কথাটা নিতান্ত গৌণ বলে ভাবা না যায় তাহলে এখন থেকেই সচেষ্ট হওয়া ভালো। ঠিকঠাক মতো সব যদি হয় তাহলে এই বিচক্ষণ ডাক্তারটিকেই বা নয় কেন?

পাত্র হিসেবে লোকটি লোভনীয় তো বটেই। ভদ্রলোকের বয়েস একচল্লিশ, চেহারা টকটকে, উপার্জনে সিদ্ধহস্ত। তা ছাড়া বলা যায় প্রায় দেড় বছর যাবৎ তিনি অনুরাধার একনিষ্ঠ ভক্ত। মেজবোন বিশাখা বলে, তোমার প্রেমে উনি হাবুডুবু খাচ্ছেন। শুনতে খুব মন্দ লাগে না। হাজার হোক, একজন কৃতী পুরুষ তো বটে? কিন্তু তবু যে কেন নিজের ভিতরে এতটুকু তাগিদ অনুভব করেন না কে জানে। আসলে ঠিক ক্লিক করে না।

না করলো। তবু এবার তিনি মনস্থির করেছেন। ভেবে দেখেছেন ক্লিক তাঁর আর কারো সঙ্গেই করবে না। ওটা আর কাজ করছে না তাঁর হৃদয়ে। মাঝে মাঝে নিজের উপর রাগও হয় সেজন্য। নিজেকে অসুস্থ মনে হয়।

যুক্তি দিয়ে বুঝে নিয়েছেন, আসলে প্রেম আর বিবাহ এক বস্তু নয়। একটার মূল্য অপার্থিবতায়, অন্যটা পার্থিব হিসেবে অনিবার্য। অতএব? অতএব গত দু'মাস আগে ঠিক করেছেন বিয়েটা বরং করেই ফেলা যাক। একজন সঙ্গী তো হবে? মা তো হওয়া যাবে? আর ফাউ হিসেবে চিরকালের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখে নিজের মা বাবাকেও সন্তুষ্ট করা হবে।

খবর পেয়ে ডক্টর মুন্সী একটা প্রেমপত্র লিখে ফেলেছিলেন, উড়ে এসে একবার কিসের ছুতোয় যেন দেখাও করে গেছেন। তখনও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে আপত্তি করবার কোনো কারণ ঘটেনি। এরপরে মা লিখেছেন, অনেক কপাল করলে এমন জামাই পাওয়া যায়। প্রণামী হিসেবে আমাকে একশো সত্তর টাকা দিয়ে একখানা গরদ কিনে দিয়েছে, তোমার বাবাকে র সিল্কের বুশসার্ট কিনে দিয়েছে। আরো যে কতো ভাবে কতো কিছু করে তার ঠিক নেই। গাড়িটা তো বলতে গেলে নিজেদের মতো করেই ব্যবহার করি আমরা। তোমার বাবাকে নিয়মিতই ড্রাইভার গিয়ে আপিসে পৌঁছে

দিয়ে আসছে। দিন ক্ষণ সবই ঠিক করেছি, তুমি ছুটি হওয়া মাত্র একটা দিনও নষ্ট না করে প্লেনে চলে এসো।

প্লেনেই যাচ্ছেন অনুরাধা। অন্যান্য বার ট্রেনেই যান। ট্রেনে চড়তে ভালোবাসেন তিনি। কিন্তু এবারের কথা আলাদা।

ভোর রাতে উঠে ট্যাক্সি চড়ে তাই বাঘডোগরা এসেছেন। এমন সুন্দর রোদ উঠেছে, নির্মল আকাশ, দূরে ঝকঝকে পর্বতমালা, ঘাসে ঘাসে শিশির বিন্দু। মুক্তোর মতো উপমাটা পুরোনো, কিন্তু সত্য।

এখনো বেশ খানিকটা দেরি আছে প্লেনের। তা থাক। ভারি ভালো-লাগছিলো এই প্রান্তরে এই সকালটি। এক পেয়ালা চা খেয়ে উজ্জ্বল রোদের মধ্যে তিনি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, প্রজাপতি দেখছিলেন, বাগান দেখছিলেন, আবার ফিরে ফিরে আসছিলেন। যাত্রী সংখ্যা কম, মাত্র দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে এক দম্পতি খুব খাচ্ছেন সেই থেকে।

অনেক পরে আর কিছু করবার না পেয়ে যখন ওজন নিচ্ছিলেন, এই সময়ে আর একটা গাড়ি এসে থামলো। আরো যাত্রী এলো। ধুপধাপ নেমে পড়লো তারা, অনুরাধা পিছন ফিরে তাকালেন। আর তাকিয়েই চমকে উঠলেন, আরেঃ এড্, এড্ গর্ডন না?

দেখতে পেয়ে এড্ও লাফিয়ে এলো, চিনতে তারও এক মুহূর্ত দেরি হয়নি। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, চোখে চোখ রেখে সে প্রবলভাবে হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললো, কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য!

কী আশ্চর্য! বিহ্বল কণ্ঠে অনুরাধাও উচ্চারণ করলেন শব্দটি।

তারপর? বলো, কেমন আছ? নীল চোখে ছায়া ফেললো এড্।

তুমি কেমন আছ? অনুরাধার গলার স্বরও গাঢ় হলো।

জানো, তোমার ঠিকানার জন্য আমি কী না করেছি।

থাক। কবে এলে বলো?

তিন সপ্তাহ।

তি-ন সপ্তা-হ?

আর দেখা হলো এদ্দিনে? অথচ ভারতে আসার চেষ্টা আমার সেই থেকে। কেন, বলো তো?

কেন আবার, দেশ দেখা।

না!

তবে?

তুমি। তোমার জন্য।

আহা।

কলকাতা গিয়ে সাতদিন ছিলাম, শহর তোলপাড় করেছি এই নামের মানুষটিকে খুঁজে, কেউ বলতে পারেনি। কতো অনুরাধা মিত্রই না আছে সেখানে, শুধু আমি যাকে চাই, তার দেখাই মিললো না।

শুনে সুখী হলাম।

কোথায় যাচ্ছ?

কলকাতা। তুমি কোথায়?

আমি? আমি কোথাও না। আমার বন্ধু দু'জনকে তুলে দিতে এসেছি, ওরা যাচ্ছে কলকাতা।

তুমি নও কেন? তুমিও চলো না।

মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে। তিনদিন হলো দার্জিলিং পাহাড়ে আছি। কাল নেপাল যাবো।

তারপর?

তারপর সপ্তাহের শেষে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন।

আবার হাত বাড়িয়ে হাত ধরলো এড্, কী ভালো লাগছে তোমাকে দেখে, কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে। তুমি ঠিক তেমনি আছ। আরো, আরো, আরো বেশী সুন্দর হয়েছো।

হঠাৎ বুকের মধ্যে সাত বছর আগেকার মতো একটা কম্পন অনুভব করে স্তব্ধ হলেন অনুরাধা। তিনি লাল হয়ে উঠলেন। সামলে নিয়ে বললেন, মন রেখে কথা বলার অভ্যেস দেখছি আগের মতোই আছে।

সবই আগের মতো আছে। কেমন দেখছো?

কেমন আর। সেই চিরাচরিত এড্, তেমনি ছটফটে, ফুর্তিবাজ হন্তদন্ত এড্। অনুবাধা তাকিয়ে থেকে অন্যমনস্ক হলেন। লস্ এঞ্জেলেসের দিনগুলো মনে পড়লো। সেই নিঃসঙ্গ নির্বান্ধব প্রবাসে এই ছেলেটিই একদিন পৃথিবীর সমস্ত নির্যাস এনে ঢেলে দিয়েছিলো।

কী ভাবছো?

না কিছু না।

আমাদের ইয়ুনিভারসিটি ক্যাম্পাসটা মনে আছে তোমার?

খুব।

সেই যে ছোট্ট একটা তৈরী জঙ্গল ছিলো, তৈরী সাঁকো ছিলো, তলায় নুড়ি ফেলা ফেলা জল, তুমি আর আমি প্রায়ই ইচ্ছে করে পড়ে যেতাম সেই জলে—

তুমি এখন কী করছো?

দাড়ি টারি রেখেছি, ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছি, মাঝে পীমকোরের সঙ্গে চলে গেলাম আফ্রিকা—

তোমার গান বাজনা? ছবি?

দরকার মতো তাও কাজে লাগাই। অভাবে পড়লেই বাজাই গাই পথে ঘাটে ছবি আঁকি বসে বসে—

বীট না হিপি।

দুটোর একটাও না! বলতে পার ভবঘুরে।

ভবঘুরে হতে গেলে কেন?

একটা উদ্দেশ্য ছিলো।

কী?

একজনের উপর প্রতিশোধ।

প্রতিশোধ ?

নিজেকে আমি খড়কুটোর মতো ঝড়ে উড়িয়ে দেখতে চেয়েছি, কোথায় গিয়ে পড়ি।

কোথায় গিয়ে পড়লে ?

একেবারে লক্ষ্যভেদ। দেখছো না কেমন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি।

আমার কথা যেন কতো মনে ছিলো তোমার।

ছিলো না ?

ছিলো ?

কী প্রমাণ চাও ?

এড্।

বলো।

নেপাল কি যেতেই হবে ?

যেতেই হবে।

কেন ?

আমার কর্তারাই আইটিনেরারি ঠিক করে দিয়েছেন, তার আর নড়চড় হবার উপায় নেই।

কর্তারা মানে ?

আমার কি ডলার আছে যে আমার ভ্রমণপঞ্জী আমি তৈরী করবো ? ছলে বলে কৌশলে ভক্ত বান্ধবদের পটিয়ে পাটিয়ে কতো কাণ্ড করে যে তিন সপ্তাহের জন্য এসেছি তার ব্যাখ্যা শুনিয়ে আর এই মূল্যবান সময় নষ্ট করতে চাই না। এখানে কোথায় থাকো, বলো।

শহরের নাম বললে কি চিনবে ?

আর চিনেই বা কি হবে। তোমার প্লেন তো উড়লো বলে।

আজ খুব লেট হচ্ছে, বোধহয় কিছু যান্ত্রিক গোলোযোগ ঘটেছে।

আরো লেট হোক, আরো গোলোযোগ ঘটুক, প্লেনটা একদম অকেজো হয়ে যাক। ইচ্ছে করছে গুলি মেরে ওটাকে ফুটো করে দিই আজ।

ববির খবর কী ? নেলীর সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছিলো ?

হলো, গেলো, আবার বিয়ে করলো—

আর হ্যারি ? তার প্রেমিকা তো তোমারও প্রেমিকা ছিলো।

এড্ চোখ টিপলো, ছিলো বুঝি ? আর হ্যারি তোমার ছিলো না ?

হিংসুক।

হ্যাঁ, হিংসুকই তো। ওকে দেখলে আমার খুন করতে ইচ্ছে করে।

কেন ?

হ্যারিই আমার সকল দুঃখের মূল।

কী দুঃখ ?

আমি পরে জেনেছিলাম, হ্যারিটা সব সময় আমার বিরুদ্ধে লাগতো তোমার কাছে। জানি, তোমার উপর ওর দুর্বলতা ছিলো। তাই বলে আমার সঙ্গে ওর তুলনা ? ভালোবাসার ও জানে কী ?

সব তুমিই জান, না ?

নিশ্চয়ই।

ওসব ভুলে যাও।

কেন ভুলবো ? সে দুঃখ কি ভোলবার ? ভোলা যায় ? আমি ভেবেই পাইনা কেমন করে তুমি আমি ফেরার আগেই চলে গেলে কোনো খবর না রেখে। হ্যারিটা হাসছিলো।

তুমিও তো চলে গেলে কিছু না বলে।

মোটেও না। আমি তোমার ডর্মের দরজায় ডিটেইল নোটিশ লিখে সেঁটে দিয়ে গিয়েছিলাম। লস এঞ্জেলেস থেকে নিউইয়র্ক—ওরকম একটা রাইড পেলে কেউ না নিয়ে পারে ? বলো, তুমিই বলো ? সেটা কি দোষ ? আর ঠিক হলো একেবারে হঠাৎ, বলতে পারা যায় তিন বন্ধু মিলে হঠাৎই ঠিক করে ফেললাম। মাত্র তো কয়েকদিনের ব্যাপার, থ্যাংকস গিভিংয়ের ছুটিটা শুধু।

আমি রাগ করেছিলাম।

আর তুমি যে জুডির সঙ্গে রাইড নিয়ে শিকাগো গেলে বসন্তের ছুটিতে, সেই বেলা ?

এড্‌টা একটা খ্যাপা। বিষণ্ণমুখে হাসলেন অনুরাধা, নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ঘোষণাটা শুনছো ? আমার এবার প্লেনে ওঠার সময় হয়ে গেল।

তাকিয়ে থেকে অপ্রস্তুতভাবে এড্‌ হাসলো, লজ্জিত ভাবে বললো, ও হ্যাঁ, আমি দুঃখিত, এসব কথা বলা আমার উচিত হয়নি বোধহয়। চলো, পিঠে হাত রাখলো সে, তোমাকে তুলে দিয়ে আসি। বড্ড উত্তেজিত স্বভাব আমার, তুমি তো সবই জানতে একদিন, সে কথা ভেবে ক্ষমা করে দিও। ওঃ হো, একেবারে ভুলে গেছি, এসো, এসো, আমার বন্ধুদের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দি।

আলাপ হলো। একে একে সবাই উঠে গেল প্লেনে। বাইরে চুপ চাপ দাঁড়িয়ে রইলো এড্‌, লস এঞ্জেলেসের বিখ্যাত ছাত্র, বিখ্যাত গায়ক বাদক কন্দর্পকান্তি এড্‌ গর্ডন। যাকে ছাড়া কোনোদিন কোন ফুর্তি জমতো না, কোনো বনভোজনে উৎসাহ থাকতো না, কোনো মেয়ের মন উঠতো না। যাকে একদিন অনুরাধা ভালোবেসেছিলো, যাকে অদেয় কিছুই ছিলো না, যাকে দেখে আজ এতোদিন বাদেও বুকের মধ্যে সেই বাইশ চব্বিশ বছরের হৃৎপিণ্ডটা সজোরে দোল খাচ্ছে।

সরলভাবে সব চিঠিতেই মাকে তিনি ওর কথা লিখতেন, ওর গুণপনার কথা সবিস্তারে জানাতেন, মা জবাবে শুধু হুঁ হাঁ সার দিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করতেন না। না, অনুরাধাও তাই বলে তখন এমন কথা কখনো ভাবেননি, যে এক্ষুনি বিয়ে করতে হবে। দু'জনেরই ছাত্রজীবন, দু'জনেরই বয়স অল্প, দু'জনের সামনেই আশার সমুদ্র।

প্রায় বছর গিয়েই কিন্তু আলাপ হয়নি, শুধু চলতে ফিরতে চোখো-চোখি। একদিন গরুর মাংস খাওয়া নিয়ে খুব তর্ক হয়েছিলো কয়েকটি ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে; ছোটোখাটো একটা বক্তৃতা দিয়ে অনুরাধা বলেছিলেন,

আমাদের যদি নানারকম ট্যাবু না থাকতো, আমরা যদি খাওয়া দাওয়া বিষয়ে আরও খানিকটা উদারপন্থী হতাম, এতো অনাহারের কষ্টে মরতে হতো না। এই যেমন মুসলমানরা শুয়োরের মাংস খায় না, হিন্দুরা গরু খায় না—

ব্যস, আর যাবে কোথায়। হরি তেওয়ারীই প্রথম ঠেসে ধরলো সাতহাত মালের তলায়, তারপরেই একসঙ্গে সব ভারতীয় বেড়াল ডেকে শিস দিয়ে, হেসে, নানারকম মন্তব্যে অনুরাধাকে কাঁদিয়ে ছাড়লো এক ঘর ছেলেমেয়ের কাছে। আর সেই সময়েই তেইশ বছরের জন্মদিনে তেইশটি টাটকা রক্ত গোলাপ হাতে নিয়ে নায়কের প্রবেশ। সে যে কী করে জেনেছিলো সেদিন তার তেইশ বছরের জন্মদিন কে জানে। ইটালিয়ান বন্ধু মারিয়া বলেছিলো, এ ছেলের সাংঘাতিক স্মরণ শক্তি, কথা প্রসঙ্গে আমিই মার্চ মাসে বলেছিলাম, আনু আর আমি পাঁচ মাসের ছোটবড়ো। আমার জন্মদিন অমুক তারিখে আর অনুর অমুক তারিখে।

ঝাপসা চোখে হেসে অনুরাধা গ্রহণ করেছিলো সেই ফুল। তারপর এড্ তাকে আর মারিয়াকে নিয়ে খেতে গেল একটা হোটেলে। শনিবারের বিকেল ছিলো, গাড়ি করে চক্কর দিল দিক্‌বিদিকে, বললো, মারিয়া, আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। মারিয়া বললো, কেন? সুখের আতিশয্যে।

মারিয়া হাসতে হাসতে বললো, জানি জানি, এড্ গর্ডনের সুখের উৎসটা কোথায়?

সেই সময়ে অনুরাধার মনেও আর কোনো দুঃখ ছিলো না। বিকেল বেলাকার অপমানের জ্বালা কখন যেন জুড়িয়ে গিয়েছিলো।

ভারতীয় ছাত্ররা তারপরেও তাকে অনেক জ্বালিয়েছে। বিদেশে এসে দেশের নিন্দে করছে এই অপরাধে বয়কট করেছে। 'মাতাহারি' নাম দিয়েছে। কিন্তু সব দুঃখ নিরসন করে দিয়েছে এড্। তার হৃদয়ভরা ভালোবাসার স্রোতে সব ভাসিয়ে দিয়েছে।

বিদেশে পড়তে এসে একটি বিদেশী ছেলের প্রতি এই অনুরাগ, শান্ত ভীরু, মা বাবার বাধ্য অনুরাধার মনে সর্বদাই একটি ভয়ের শিখা জ্বালিয়ে রাখতো। এই যে কখনোই তাঁদের মনঃপূত হবে না সে বিষয়ে তিনি অনেক কারণেই নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন। এবং সেই জন্যই ভেবেছিলেন, থিসিসের কাজটা হয়ে গেলেই চাকরি নিয়ে নেবেন একটা, আরো কিছুদিন অন্ততঃ এখানে থাকা যাবে নিশ্চিন্তে। তারপর দেখা যাবে স্রোত কোনদিকে গড়ায়। এর মধ্যেই টেলিগ্রাম এলো, মায়ের হার্টের অবস্থা খুব খারাপ, যদি শেষ দেখা দেখতে চায় অনুরাধা যেন তৎক্ষণাৎ চলে আসে।

টেলিগ্রাম পেয়ে কেঁদে কেটে অনুরাধা খুন। মাস্টার মশায়রা ছুটোছুটি করে চেষ্টা চরিত্র করে সেদিন রাত্রেই তুলে দিলেন প্লেনে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা পৌঁছে বাড়ি গিয়ে যখন দেখলেন, মা বহাল তবিয়তে তরকারী কুটছেন বসে বসে, একটা অসহ্য কষ্টে টনটন করে উঠলো বুকটা। সে কষ্ট ওর জন্য, এড্ গর্ডনের জন্য।

চিঠিটা ভারতীয় ছাত্ররাই লিখেছিলো, আতঙ্কিত মা বাবা মেয়েকে সেই

কুপথ থেকে ফিরিয়ে আনতে এই মিথ্যা টেলিগ্রাম করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় খুঁজে পাননি। তারপর কিছুদিন একটা সাংঘাতিক টানাপোড়েনের মধ্যে কেটে গেলো দিন। একদিকে মায়ের হার্টফেল করে মৃত্যুভয়, অন্যদিকে তাঁর নিজের জীবন। শেষ পর্যন্ত মায়ের জীবনের জন্য নিজের জীবনই উৎসর্গ করলেন তিনি। মা প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন, অনুরাধা যেন আর কোনো সংশ্রব না রাখে সেই বিদেশী ছেলেটির সঙ্গে।

আর প্রতিজ্ঞা না করিয়ে নিলেই বা কী হতো? বারো হাজার মাইল দূরে বসে কী করতে পারতেন অনুরাধা? তারচেয়ে বরং এই ভাবেই একটা নিষ্পত্তি করতে পেরে, একথা ভেবে তিনি নিজেকে শান্ত করতে চেয়েছিলেন যে অন্য মানুষটা অন্তত ভুলে যাবার সুযোগ পাবে।

সুযোগ অবশ্য অনুরাধাও পেয়েছিলেন বৈ কি। নইলে এই সাত বছরের প্রথম বছরটা বাদ দিলে ক'দিন তিনি মনে করেছেন ওকে। সত্যিই ভুলে গিয়েছিলেন। সত্যিই সব দাগ মুছে গিয়েছিলো।

কিন্তু দাগ কি সত্যিই মুছে যায়? এ দাগ কি শ্লেট পেনসিলের দাগ? মানুষের হৃদয় কি এতোই অনুগত। না। বাইরের শাসনে যতোই চুপ করে থাকুক, তার জেদ সে ছাড়ে না। ছাড়ে না বলেই বত্রিশ পূর্ণ তেত্রিশের অনুরাধাকে সে আর কোনো সুখের দিকে হাত বাড়াতে দেয়নি, শক্ত করে দরজা এঁটে বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। আর আজ? কী অপ্রত্যাশিত ভাবেই না সচল হয়ে উঠেছে সব যন্ত্রপাতি, রক্তের স্রোত কী দ্রুত বয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ফেটে যাবে বুকটা। অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকা এডের দিকে তাকিয়ে কষ্টের সমুদ্র উথলে উঠলো, বিচ্ছেদের নতুন যন্ত্রণা দলা পাকিয়ে উঠলো কান্না হয়ে।

প্লেনের সিঁড়িটা প্রায় সরিয়ে নিচ্ছিলো, ছটফটিয়ে উঠলেন অনুরাধা, তরতরিয়ে নেমে এলেন নীচে, এড্ রুমাল উড়িয়ে ঝাপসা জানলায় উঁচু হয়ে তাকেই খুঁজছিলো, পাশে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে লজ্জার রং মাখিয়ে বললেন, এই, কী দেখছো?

সে কী তুমি! তুমি নেমে এসেছ যে। এড্ অবাক।

চলো, তোমাকে আমার কোয়ার্টারে নিয়ে যাই, নইলে দেশে গিয়ে আবার নিন্দে করবে, বলবে কোনো ভদ্রতাজ্ঞান নেই।

সত্যি যাচ্ছো না? দুই কাঁধে দুই হাত রেখে দুই চোখে আলো জ্বালিয়ে তাকিয়ে থাকলো এড্।

নীল কাগজের টিকিটটা ছিঁড়ে ফেলতে ফেলতে অনুরাধা ছোট্ট করে বললেন, অসম্ভব।

গুণীজনবাঞ্ছিত

আমি একজন অতিশয় সাধারণ যুবক। আমার জীবনে কোনো কল্পনার প্রসার নেই। আমার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত সংকীর্ণ গণ্ডিতেই আবদ্ধ। মার্চেন্ট আপিসে চাকরি করছিলাম। মামার মৃত্যুতে সামান্য কিছু টাকার অধিকারী হয়ে বসলাম। মামা অবিবাহিত ছিলেন—আমি তাঁর একমাত্র ভাগ্নে—এবং অত্যন্ত প্রিয়। প্রিয় আমাকে হতেই হবে, কেননা আমার মতো ছেলেরা স্বভাবতই স্তিমিত হয়, গুরুজনদের ভক্তি করে, এবং পাঁচজনের মনরক্ষার জন্য নিজের সর্বনাশ করতেও পশ্চাৎপদ হয় না। মামার সামনে সিগারেট খেতুম না, মাথা আঁচড়াতাম না, দাড়ি কামাতাম না—মামা আজকালকার দিনের সঙ্গে আমার তুলনা করে খুশিতে অস্থির হয়ে যেতেন। সে জন্যেই বোধহয় তাঁর লাইফ-ইনসিওরেন্সের পলিসি আমার নামেই সাইন করে রেখেছিলেন। একটু অসময়ে মরলেন তিনি, এবং তাঁর পাঁচ হাজার টাকার ইনসিওরেন্সের অধিকারী আমাকেই হতে হলো। আমি কি খুব খুশি হয়েছিলাম? বরং টাকাগুলো নিয়ে কী করবো তাই ভেবেই আরো উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। অনেক অনেক রকম পরামর্শ দিলো—অবশেষে একটি বাড়ি কিনে ফেললুম আমি। পাঁচ হাজার টাকায় কলকাতার মতো জায়গায় যে একটি বাড়ি পাওয়া যাবে এমন কল্পনাও আমি করিনি, কিন্তু পাওয়া গেলো। মামার টাকাটাও যেমন আমার পক্ষে দৈব, বাড়িটিও তেমনি দৈবের দয়া বলেই আমি মেনে নিলুম। আসলে বাড়িটির যিনি মালিক, তিনি বোধহয় কোনো কৌশলেই বাড়িটি আপন করায়ত্ত করেছিলেন, আর বাড়িটির প্রতি কী যেন কেন তাঁর একটা প্রকট বৈরাগ্য দেখতে পেলুম—ও যেন হাতছাড়া করতে পারলেই তিনি রক্ষা পান, এ রকমই তাঁর মনের ভাব। পাঁচ হাজার, পাঁচ হাজারই সই। আমার সুবিধে হয়ে গেলো।

বাড়িটি ছোটো, কিন্তু বড়ো সুন্দর। চারপাশে একটু একটু জমি—আগাছার জঙ্গলে ভর্তি—তার মধ্যে ছড়ানো ছিটোনো নানা রংয়ের বুনো ফুল। দেয়াল ঘেঁষে একটি লম্বা লিচু গাছ। আমার মন প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। মাত্রই তিন খানা ঘর, তবুও ঘুরে ঘুরে দেখতে আমার অনেক সময় লাগলো। আমিই যে এই বাড়ির মালিক এ কথা আমি এক মিনিটের জন্যও ভুলতে পারলুম না। আমার বাড়ি, একান্তই আমার, এ কথাটা যেন আমার বুকের মধ্যে গুনগুন করতে লাগলো। আমি মুহূর্তের জন্য মনের মধ্যে একটা

স্বপ্নের আবেশ অনুভব করলুম। আমি দেখতে পেলুম কোনো একটি সলজ্জ শঙ্কিত আলতাপরা পদক্ষেপে সমস্ত বাড়ি যেন ভরে উঠেছে। এতদিনে মনে হলো আমার বিবাহ করা দরকার।

আমি থাকতুম আমার এক দূর সম্পর্কীয়ের বাড়ি। ছাত্রাবস্থা থেকেই আমার এই দশা। কলকাতায় মেসে থেকে পড়াশুনো চালাবার মতো সংস্থান আমার ছিলো না। কেননা আমার বাবা আমার শৈশবেই মারা যান এবং মাব সামান্য কিছু গহনা ছাড়া আমার আর অন্য কোনো মূলধন ছিলো না। অতএব টিউশনি করে হাতখবচ আর পড়ার খরচ চালানো সম্ভব ছিলো, কিন্তু মেসের খরচ পোষাতো না। প্রথমবার এসে এক পিসতুতো বোনের বাড়ি ছিলুম, তারপব জ্যাঠতুতো কাকার—তারপর বর্তমানে মাসির দেওরের বাড়ি। এখন চাকবি করি, মেসে থাবতে পারতুম কিন্তু এ ভদ্রলোক নিজে থেকেই আমাকে আপ্যায়িত করেছিলেন। খবচ অবিশ্যি দিতুম।

মামা মিলিটারিতে কাজ করতেন, মাঝেমাঝে ছুটিছাটায় আসতেন আমাদের দেখে যেতে—আমার নম্রতায় মুগ্ধ হতেন, আর তারপর তো এই ফল। আমাব আব একদিনও দেরি করতে ইচ্ছে কবলো না। সবাই আমার বোকামিতে অবাক হলো। সবাই বললো, বাড়িটা পরিষ্কার করিয়ে ভাড়া দাও, মোটা ভাড়া পাবে। আমার মন মানলো না। কী হবে অত টাকা দিয়ে। চিরকালই তো এর তার বাড়ি কাটলো। নিজের বাড়িতে নিজে থাকবো, এ আমার কতকালের স্বপ্ন, এই একটা ছোটো আকাঙ্ক্ষাকে আমি কিছুতেই মন থেকে দূর করতে পারলাম না। মাকে চিঠি লিখে দিলাম দেশে। তারপর সামান্য একটু চুনকাম করিয়েই নিজের অতি স্বল্প সম্পত্তি—একটা ট্রাঙ্ক আর একটা সুটকেশ—নিয়ে একদিন সকালবেলা এসে উঠলাম এ বাড়িতে। রবিবার ছিলো। সামনেই চায়ের দোকানে জলযোগ সেরে দুপুরবেলা ঘুরে ঘুরে দুটো একটা জিনিস কিনে আনলুম—একটা চাকরের ব্যবস্থা করে এলুম—একটা ক্যাম্প খাট পর্যন্ত। একটা কুঁজো—দুটো কাচের গ্লাস—মনে করে করে সংসারের টুকিটাকি শেষ পর্যন্ত অনেক কিছুই এনেছিলুম মনে আছে। কোণের ঘরের দক্ষিণের জানলা ঘেঁষে খাটটি পাতা হলো। কুলিটাকে বকশিস দিয়ে বিছানা পাতিয়ে নিলুম। রাস্তার কল থেকে এক কুঁজো জলও এনে দিলো। এবার আমি হাত-পা ছড়ালুম বিছানার উপর। নিস্তব্ধ দুপুর—লিচু গাছটা হাওয়ায় কাঁপছিলো—জানলা খুলে তাকিয়ে দেখতে দেখতে আমার যে কী ভালো লাগলো। লিখতে জানি না, নইলে সমস্ত দুপুর বসে-বসে কবিতা লিখতুম। নিঃশব্দে আমার সুখের সময় গড়িয়ে গেলো, বিকেলে উঠে দরজায় তালা দিয়ে আবার বেরুলাম। রাত্রিবেলা ফিরলাম একেবারে সংসার নিয়ে। স্পিরিট স্টোভ, কেটলি, কাপ—চাল, ডাল, হাঁড়িকুড়ি—আমি যে কত কৃতী কাউকে দেখানো গেলো না, এই যা দুঃখ। তবু মনে মনে মার কথা ভেবে রোমাঞ্চিত হতে লাগলুম, তিনি আসবেন এবার তাঁর ছেলের সংসারে—ছেলের বুদ্ধি দেখে আশ্চর্য হয়ে বলবেন, তুই এতও পারিস? খাওয়া দাওয়া সেরে এসেছিলুম। খানিকক্ষণ এধর ওধর

ঘুরলুম—বিছানাটা টান করলুম নিজের হাতে—তারপর এক সময়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে আলো নিবিয়ে শুলুম এসে বিছানায়। একটু দূরে একটা বাড়িতে আলো জ্বলছিলো, কোন এক সময় তাও নিবে গেলো,—আমি নির্ঘুম চোখে চুপ করে শুয়ে শুয়ে উপভোগ করতে লাগলুম নিজের বাড়ির আরাম। আস্তে আস্তে সিগারেটটা শেষ হলো।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানি না—কেন ঘুম ভাঙলো তাও জানি না—থমথমে নিঃশব্দ ঘরে চোখ মেলে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলুম। ভূত সম্বন্ধে আমার মনে ইতিপূর্বে কোনো বিকার ছিলো না, তাই এই নিরালা নির্জন রাতে একলা একটি ঘরে আছি, এ নিয়ে তিলমাত্র উদ্বেগ ছিলো না আমার। কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম আমার ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে ছোটো নরম পাতলা পা ফেলে ফেলে একটি মেয়ে এগিয়ে এলো ভিতরে। কাঁধের দুই পাশে তার লম্বা লম্বা কালো চুল বেয়ে পড়েছে, দুটি নিটোল সরু আর সাদা হাত বুকের উপর ন্যস্ত, হাওয়ার মতো হালকা শরীর নিয়ে আস্তে আস্তে ঘরের মাঝখানটিতে এসে সে স্থির হয়ে দাঁড়ালো। তারপর হাঁটু ভেঙে বসে পড়লো মেঝের উপর—দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলো কান্নায়। তার কান্নার অনুচ্চারিত শব্দ আমার সমস্ত প্রাণমন মথিত করলো। আমার বুকের মধ্যেও যেন একটি কান্নার ঢেউ বয়ে গেলো। তার অব্যক্ত মূর্তির দিকে তাকিয়ে আমি প্রাণপণে আমার সমস্ত শক্তিকে কণ্ঠে একত্রিত করে রুদ্ধ গলায় বললুম, তুমি কে? চমকে মুখ তুললো মেয়েটি। কান্নায় তার গাল ভেজা, দুঃখের গভীরতায় অতলস্পর্শী তার চোখ। আমি ভালো করে এবার তার মুখ দেখলুম—কী বললো সে মুখকে? সে মুখ কি সুন্দর? সে মুখ কি অবিস্মরণীয়? সে মুখের আকর্ষণ কি অনিবার্য? তা তো নয়! কিন্তু সে মুখ অদ্বিতীয়, অতুলনীয়, অচিন্ত্য! তাকিয়ে দেখতে দেখতে আমার মনে হলো আমার সমস্ত জীবনের সকল ইচ্ছা সকল কামনা যেন মূর্তি নিয়ে এসেছে আমার কাছে। সমস্ত দিন ধরে কি আমার অচেতন মন এই মেয়েটিকেই প্রার্থনা করেছিলো? আমি একটু ভয় পেলুম না, একটু অস্বস্তি বোধ করলুম না, কেবল মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলুম তার দিকে, আমার বুকের কম্পন দ্রুত হয়ে উঠতে লাগলো। মেয়েটি আমাকে দেখে আশ্চর্য হলো। কতক্ষণ অপলকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো সেখান থেকে। এইবার সে আমার কাছে আসবে, তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাবো—আবার কেমন একটা উত্তেজনায় আমি উঠে বসলাম বিছানায়, ভাঙা ভাঙা গলায় বললাম, তুমি কে?

মেয়েটি এসে আমার বিছানা থেকে একটু দূরে দাঁড়ালো, দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বললো, আমি রাধা। আমার মনে হলো তার কণ্ঠ বেয়ে যেন গান ঝরে পড়লো। কেমন একটা অদ্ভুত মধুর আওয়াজে ভরে উঠলো ঘর। ফাঁকা মাঠে ডাক দিলে যেমন প্রতিধ্বনি হয়, তার সেই সঙ্গীতময় কণ্ঠও আমার বুকের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। আমি কথা বলতে পারলুম না। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে আবার বললো, তুমি কে? তুমি কেন

এসেছো ? কেন আমার এই অতল দুঃখের তিলতম শান্তিটিও হরণ করছো তোমরা ? আমাকে দয়া করো, দয়া করো—হে পৃথিবীর নিষ্ঠুর মানুষ—আমাকে দয়া করো। তারপর সে দু' হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলো, পাখির মতো নরম হালকা শরীর সেই ক্রন্দনবেগে কেবল কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো।

আমি ব্যথিত হয়ে বললুম, শান্ত হও। তুমি কী চাও আমি জানি না—তোমার কোনো ইচ্ছার আমি অসম্মান করবো না—কিন্তু তুমি বলো তুমি কী চাও।

মেয়েটি একটু আন্দোলিত হলো। হাতের পাতা থেকে মুখ তুলে বললো, আমি তো বলতেই চাই, কিন্তু কেউ শোনে না—আমাকে দেখলেই সবাই চীৎকার করে ওঠে, সবাই পালিয়ে যায়—অথচ আমার মৃত্যুর আগে কত লোক আমাকে ভালোবাসতো—কত লোকের সংস্পর্শে আমি ধন্য হতাম। এই ঘর, এই বাড়ি, কত পদস্পর্শে একদিন মুখরিত ছিলো। এইখানে, ঠিক এই জানলার পাশেই আমরা ঘুমুতাম—কত সুখরাত্রি—কত বিনিদ্র অবকাশ—কত মধুর আলাপনে আমরা সময় কাটিয়েছি তা কি তুমি জানো ? একটু থেমে—তারপরে এখানেই একদিন এই নিঃসঙ্গ শয্যায় কোনো এক রাত্রে আমার শেষ নিঃশ্বাস পড়লো।

মেয়েটি স্তব্ধ হলো। আমি উদভ্রান্তের মতো বিহ্বল গলায় বললুম, কেন ? কেউ কি ছিলো না তোমার ?

ছিলো না ? বলো কি তুমি ? আমার কেউ ছিলো না ! আমার তো তিনিই ছিলেন—পৃথিবীতে কোন সুখ আছে, কোন আনন্দ আছে যা আমি তাঁর কাছ থেকে পাইনি ! তাহলে শোনো—

মেয়েটি আবার হাঁটু ভেঙে মেঝের উপর বসলো—দুটি হাতের পাতা মেঝের উপর রেখে শরীরের ভর রাখলো তার উপর। হাত বেয়ে বেয়ে ছড়িয়ে রইলো তার লম্বা চুল—আমি বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে তার কথা শুনতে লাগলুম।

আমার স্বামী ছিলেন দুর্লভ চরিত্রের মানুষ। তা কেবলমাত্র এইজন্যে নয় যে তিনি আমাকে অতিরিক্ত ভালোবাসতেন। মানুষ হিসেবেই তিনি অতি উচুদরের ছিলেন।

আমি যখন তাঁকে বিয়ে করলুম সমস্ত আত্মীয়রা আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ালো। তাঁদের ধারণার সঙ্গে আমার ধারণার কখনোই কোনো সংযোগ ছিলো না—তাই তাঁদের চোখ আর আমার চোখও ছিলো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আসলে তিনি গাইয়ে বাজিয়ে মানুষ বলে নানারকম সুনাম দুর্নামের অকারণ ভাগী হতে হয়েছিলো তাঁকে। যে কোনো তুচ্ছ কথাও পল্লবিত হয়ে রটনা হতো তাঁর সম্বন্ধে। কিন্তু তিনি খাঁটি শিল্পী—ও সব পার্থিব নিন্দা প্রশংসা তাঁকে স্পর্শ করতো না। সাধারণ মানুষের মতো তাঁর চরিত্র ছিলো না বলে অনেক কথা তিনি বুঝতেও পারতেন না।

সমস্ত যন্ত্রের উপরই ছিলো তাঁর অপ্রতিহত ক্ষমতা। ঈশ্বর তাঁর আঙুল-

গুলোকে যেন সুর দিয়ে গড়ে দিয়েছিলেন। যে যন্ত্রের উপর যে মুহূর্তে তিনি আঙুল ছোঁয়াতেন সেই মুহূর্তেই তা যেন প্রাণ পেয়ে কথা বলে উঠতো। আর সে সুর গতানুগতিক সুর ছিলো না—সে সুর কী? সেই অনির্বচনীয় অনুভূতিময় শব্দসমন্বয়কে আমি কী নাম দেবো? হাওয়ায় হাওয়ায় লীলায়িত হয়ে ফিরতো তাঁর সুর—সে সুর শুনলে মানুষ আত্মবিস্মৃত না হয়ে পারতো না। একদিন মনে আছে—কোনো এক রাত্রে আমরা পাশাপাশি শুয়ে গল্প করছিলাম। তাঁর বাঁ হাতের উপর ছিলো আমার মাথা। ডান হাত দিয়ে তিনি আমার চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। আমি কৌতুক করে বললুম, ও সঙ্গীতজলধি—তোমার আঙুলকে কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না—হঠাৎ যদি এখন আমার চুল একটা চাঁদের আলোর গান গেয়ে ওঠে!

চাঁদের আলোর গান? সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গলা যেন ভ্রমরের মতো গুঞ্জন করে উঠলো। আমার লম্বা চুলের মধ্য থেকে হাত তুলে নিলেন তিনি, তারপর বললেন, দাও বাজাই।

সে কী?

বা রে, তুমিই তো বললে। দাও, একটা চুল ছিঁড়ে দাও।

সত্যি?

সত্যি বলছি। তুমি তো ভালো কথাই বলেছো—চুলও তো একরকম সূক্ষ্ম তারই—বাজবে না কেন। নিশ্চয়ই বাজবে। উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে বিছানার উপর উঠে বসলেন তিনি। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলুম তাঁর মুখ। সে মুখ কি মানুষের? না দেবতার? আমি দিলুম একটা চুল ছিঁড়ে। লম্বা চুলটার একটা দিক আস্তে দাঁতে কামড়ে ধরলেন, আরেকটা দিক টান করে হাতে টিপে ধরে ঠিক তারযন্ত্রে যেমন করে আঙুল চালায় সে রকম করে বাজাবার চেষ্টা করলেন। আমি তাকিয়ে আছি স্থির চোখে, আমার কান সজাগ। হঠাৎ একসময়ে অত্যন্ত অবিশ্বাস্যভাবে জয়জয়ন্তীর একটি খণ্ডস্বর যেন শুনতে পেলাম আমি—আমার তক্ষুনি মিশে গেলো—আবার শুনলুম, আবার মিশে গেলো—শেষে অতি সূক্ষ্ম শব্দে একটানাভাবে বেজে চললো। আমি যেন কোনো ভৌতিক ব্যাপার দেখছি। আমার স্বামীকেই আমার ভয় করতে লাগলো। এ কে? এ কি মানুষ? গভীর আবেগে আমার কান্না এলো। হঠাৎ আমি তাঁর দু'পায়ের মধ্যে মাথা গুঁজে বললাম, থামাও! থামাও! আমার ভয় করছে। পট করে চুলটা ছিঁড়ে গেলো। কিন্তু তিনি থামলেন না—মাথা থেকে আরেকটা চুল ছিঁড়ে নিয়ে আবার বাজাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সে আর বাজলো না। ঐ এক মুহূর্তের জন্য কি ঈশ্বর এসেছিলেন তাঁর আঙুলে?

ক্লান্ত হয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন। আমি বললুম, ক্ষমতার সীমা আছে জানতুম—দেখলুম তা নেই। তিনি আমাকে হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিয়ে মৃদু হাসলেন।

সঙ্গীতে আমার কান ছিলো অতিশয় তীক্ষ্ণ। এ দখল আমার জন্মগত!

স্বামীর সংস্পর্শে তা পরিণত হয়েছিলো শুধু। তাঁর নানারকম সব অদ্ভুত যন্ত্র ছিলো। মিস্ত্রি দিয়ে নানা আকারের সব খোল তৈরি করাতেন, তারপর তার বসাতেন নিজে। প্রচলিত কোনো যন্ত্রের মতো ছিলো না সে সব, আর প্রচলিত কোনো রাগরাগিণীর চর্চাও করতেন না তিনি। তিনি ছিলেন স্রষ্টা। সমস্ত হৃদয়ভরা ছিলো তাঁর সুর—সুর তিনি তৈরি করতেন নিজে। যখন তিনি সুর তৈরি করতেন তখন অবিশ্রান্ত আমাকে কাছে বসে থাকতে হতো। সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম কোনো ভুলও আমার কানকে ফাঁকি দিতে পারতো না। উনিও যে ভুল কিছুতেই ধরতে পারতেন না, সে সব পরমাণু ভুলও আমার কানকে নাড়া দিতো।

একদিন ওঁর বিশেষ একটি প্রিয় যন্ত্রে উনি সুর তৈরি করছিলেন—আমি চোখ বুজে আত্মবিস্মৃত হয়ে শুনছিলুম। কিন্তু যতবারই উনি অন্তরায় এসে পৌঁছোন, ততবারই কোথায় যেন কী ব্যাঘাত হয়, আর আমার চোখ আপনা থেকে খুলে যায়। যেন ভাত খেতে খেতে হঠাৎ কাঁকর পড়েছে দাঁতে, তেমনি করেই আমি শিহরিত হয়ে উঠি। আমার স্বামী বললেন, কিছুতেই ভুল হতে পারে না—তোমারই বাড়াবাড়ি—আমি ঠিক করছি।

আমি বলি, উঁহু।

আচ্ছা, আবাব শোনো—আবার তন্ময় হই—কিন্তু ঐ জায়গায় এসে ঠিক তেমনি শিহরিত হয়ে উঠি আবার। বার বার দশ বারেও যখন ঐ ভুলের কোনো মীমাংসা হলো না তখন দেখলুম আমার স্বামীর চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠছে—শিল্পীর সুবৃহৎ চোখে অপার যন্ত্রণা। আর একবার যেই শিহরিত হলুম অমনি উনি সেই যন্ত্রের বাটটি দিয়ে আমাব মাথায় একটা আঘাত করলেন। ঐ আঘাতে সমস্ত তারগুলো একসঙ্গে ঝনঝন করে বেজে উঠেই স্তব্ধ হয়ে গেলো। আমি মাথায় হাত দিয়ে হাঁটুতে মুখ গুঁজলাম। মুহূর্তে সে যন্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি—তাঁর সকলের চেয়ে প্রিয় যন্ত্র এটি—সকলের চেয়ে অভিনব ছিলো এর সুরঝঙ্কার—সকলের চেয়ে বেশি চিন্তা করতে হয়েছিলো এটি উদ্ভাবন করতে। মেঝের উপর আছাড় খেয়ে ফেটে গেলো—উনি উন্মাদ হাতে তারগুলোও পটপট করে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর এসে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে—ব্যাকুল আগ্রহে তুলে ধরলেন আমার মুখ, তারপর আমার অশ্রুসিক্ত গালের উপর প্রবল আবেগে নিজের মুখ ঘষে ঘষে আদর করতে করতে বললেন, তোমার চেয়ে প্রিয় আমার কেউ না—কিছু না—ঐ যন্ত্রটাও না! যার জন্য তোমাকে আঘাত করবার মতো দুর্মতি আমার হয়েছিলো, ঐ দ্যাখো তার দশা। ভেবেছিলাম কঠোর অভিমানে মুখ ফিরিয়ে থাকবো, কিন্তু এর পরে কি তা সম্ভব? মুখ মুছে বললুম, আমার পাগলা শিব—তারপর সযত্নে তুলে আনলুম যন্ত্রটি—কাপড়ের আঁচলে মুছে সন্তানস্নেহে হাত বুলোতে লাগলুম ঐ ভাঙা কাঠ আর ছেঁড়া তারগুলোর উপর। ভর্ৎসনা করে বললুম, ছি ছি ছি, এ তুমি করলে কী?

অনেক গুণীমানীই পা রাখতেন আমার এই অপরিসর ঘরে। আমি

সানন্দে সকলকে অভ্যর্থনা জানাতুম—চা করে দিতুম নিজের হাতে—আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতায় যতটুকু সম্ভব সযত্ন ব্যবহার করতুম তাঁদের সঙ্গে। তাঁরা সবাই আমাকে তাঁদের বন্ধুতা দিয়ে কৃতজ্ঞ করতেন। অনেককেই বলতে শুনেছি, গুণীর যোগ্য স্ত্রী আমি। কিন্তু আমিও যে একজন গুণী এ কথা যিনি বললেন তাঁকে উপলক্ষ্য করেই আজ আমার এই পরিণতি।

সংসারের সকল ভারই ছিলো আমার উপর। এ সব বিষয়ে আমার স্বামী ছিলেন নিতান্ত উদাসীন। আমি কী করলুম, ভালো করলুম কি মন্দ করলুম, এ নিয়েও তাঁর কোনো চিন্তা ছিলো না। তিনি সদাসহাস্য, সদাসুখী। আমি যে তাঁর গৃহে আছি এটাই ছিলো তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়ো আনন্দ। এ বাড়ির প্রত্যেক আনাচে কানাচেও যে আমারই অস্তিত্ব এই অনুভূতিই ছিলো তাঁর কাছে মহা উপভোগ্য। এ জন্যে একদিনের জন্যও আমি কোথাও গিয়ে থাকতে পারতুম না। শুধু যে তিনিই দুঃখিত হতেন তা নয়—আমারই মন কেমন করতো।* বিয়ে হয়েছিলো আমাদের সাত বছর, কিন্তু আমাদের মনে হতো যেন সাত দিনও হয়নি। তখনও প্রতি রাত্রে পাশাপাশি শুয়ে খানিকক্ষণের জন্য আমরা বিহ্বল হয়ে থাকতুম, মনে মনে উপভোগ করতুম পরস্পরের সান্নিধ্যসুখ।

আমার স্বামী যে সব সুর রচনা করতেন তা একটু অদ্ভুত। রাগ-রাগিণীকে দিয়ে তিনি সজীব মানুষের মতো কথা বলাতেন সুরে। সুরের মধ্য থেকেই আমরা কল্পনা করতে পারতুম তাদের রাগ-অনুরাগ, হাস্য-পরিহাস কিম্বা প্রণয়গুঞ্জন। যেন কখনো গম্ভীর কথাবার্তা হচ্ছে, কখনও চপলতা, কখনো গভীর প্রেমালাপ। এ সব সুর যখন বাজতে থাকতো, আমার মনে তখন কথা তৈরি হতো। আস্তে আস্তে সেই সুরগুলোকে আমি কথা দিয়ে মূর্তি দিতে লাগলাম। হয়তো কথাগুলো তেমন ভালো হতো না, কিন্তু তাইতেই সুরগুলো যেন আনন্দে আত্মহারা হয়েছে মনে হতো। উনি যখন বাজাতেন, সঙ্গে সঙ্গে গুনগুন করে আমি সে কথাগুলো গাইতাম। না গেয়ে পারতাম না।

সন্ধ্যাবেলা নানা লোকের সমাগমে আমাদের ঘর মুখরিত হয়ে উঠতো। সবচেয়ে কম আসতেন তিনিই—যাঁকে নিয়ে আমার এই গল্প। সেদিন তিনি এসেছেন, আমার স্বামী আমাকে ডাকলেন। বিব্রত ছিলাম রান্নাঘরের কাজে—বললাম, তুমি বোসো গিয়ে, আমার দেরি হবে।

না, না, এসো—ইনি একজন অসাধারণ লোক—এঁর কাছ থেকে তুমি ঐ কথাগুলো ঠিক করে নিতে পারবে।

কেন, উনি কি কথার কারিগর নাকি?

সত্যি, ঠাট্টা নয়—উনি গান নিয়ে ঠিক এই ধরনের চর্চাই করছেন। ওঁর ধারণা খুব স্পষ্ট।

আলাপ ছিলো না এমন নয়, কিন্তু সামান্য। আমাকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন।

আমার স্বামী বললেন, ইনি আমার সুরে অনেক কথা বসিয়েছেন—আমার

খুব ইচ্ছে আপনি সেগুলো একটু দেখেন।

বিনীত গলায় বললেন, স্বয়ং আপনি যেখানে, সেখানে আমার যে কথা বলতেই ভয় করে।

আমি বললুম, আপনার দক্ষতার পরিচয় অনেক পেয়েছি—কাছাকাছি পাবার সুযোগ যখন হয়েছে তখন ও-সব বলে আর সময় নষ্ট করবো না—

ভদ্রলোক তীক্ষ্ণচোখে একবার আমার দিকে তাকালেন।

তাঁকে সুদর্শন বললে হাসাহাসি হবে, কিন্তু মানুষের সৌন্দর্য সম্বন্ধে আমার ধারণা অন্যরকম। আমি মনে মনে বললুম, 'গুণীজনোচিত বটে।' আমার পাগল স্বামী ততক্ষণে যন্ত্রর কান টানাটানি করছেন। হেসে বললুম, ওঁকে আগে চা করে দি।

আমি দেখেছি গাইয়ে বাজিয়ে লোকেরা ভারি চা খায়। আমার স্বামীকে যদি অবিরত কেবল কাপের পর কাপ চা দিয়ে যাই, উনি সানন্দে তা গ্রহণ করবেন, কিন্তু তা তিনি পান না—বরঞ্চ এ নিয়ে অনেক সময় অনেক বকুনি খান। কাজেই এই ভদ্রলোকটির উপরই ইনি প্রসন্ন হয়ে উঠলেন। হাসি-মুখে বললেন, এই এতক্ষণ পরে একটা ঠিক কথা বলেছো তুমি। মাঝে মাঝে তুমি এত ভালো হও কেমন করে?

ভদ্রলোক মৃদু হাসলেন।

দেখলুম, আমার স্বামীর চাইতেও চা-খোর মানুষ আছে। এঁরা দুজনে মিলে বড়ো রুপোর পটটি শেষ করে গানে বসলেন।

ভদ্রলোক আমাকে বললেন, আপনার কথাগুলো দেখালেন না?

আমি ভারি কুণ্ঠিত হলাম। ঘন ঘন তাকাতে লাগলাম স্বামীর দিকে—তিনি বললেন, বা রে, এতে আর একটা সংকোচের কী আছে? সবাই আমরা সমধর্মী। তুমিও তো একজন কম নও—

আপনারও এ সব নেশা আছে নাকি?

আছে নাকি মানে?—আমার স্বামী যন্ত্রের কান টেপা ছেড়ে সোজা হয়ে বসলেন—এঁর কান যা সূক্ষ্ম তা যদি আমার থাকতো আজ সমস্ত পৃথিবী আমি জয় করে ফেলতুম। তাছাড়া ইনি একটি অসাধারণ কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী।

সত্যি?—কথাটা ভদ্রলোক এমন ভঙ্গিতে উচ্চারণ করলেন যাতে একটু যেন ঠাট্টার গন্ধ পেলুম। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ওঁর ধারণা বোধহয় বেশি উঁচুতে ওঠে না—তাছাড়া স্ত্রীর প্রশংসারত মানুষটিকে বোধহয় তাঁর কাছে একটু স্ত্রৈণ বলেই বোধ হলো।

আমি বললুম, হয়তো ভাবছেন এই অতিশয়োক্তি আমি ওঁর স্ত্রী বলেই উনি করছেন। তা কিন্তু নয়। অতিশয়োক্তি করা ওঁর স্বভাব। তাছাড়া শিল্পীরা তো একটু উচ্ছ্বাসপ্রবণই হন—এতটুকু ভালো দেখলেও আনন্দে আকুল হয়ে ওঠেন!

তাহলে নিজের গুণ সম্বন্ধে আপনিও নিঃসংশয়—এক্ষুনি আপনার লেখাগুলো আমাকে দেখানো উচিত।

বিরক্ত হলাম। মুখে তবু হাসি রাখলাম সযত্নে। খুব সহজ হয়ে বললাম, সৎ সঙ্গে তো আছি—কিন্তু লেখাগুলো আমি আপনাকে দেখাবো না।

নিশ্চয়ই দেখাবে।—আমার স্বামী তক্ষুনি লেখাগুলো আনবার জন্য ঘরের মধ্যে ঢুকলেন।

আমি হেসে বললুম, উনি কি পাবেন, ভেবেছেন? উনি কি জানেন এ বাড়ির কোথায় কী আছে?

কেন?

ওঁর সংসার মহৎ—তাই আমি আর আমার ঐ ছোটো সংসারে ওঁকে টেনে আনি না।

তার মানে? ভদ্রলোক একটু মনোযোগ দিলেন আমার কথায়।

মানে তো আপনার জানবার কথা, এ সব মানুষকে দিয়ে কি আর কখনো চাল-ডালের হিসেব করানো যায়? এমনিতেই তো এই দরিদ্র দেশে শালগ্রাম শিলা দিয়ে সর্বদাই শিল-নোড়ার কাজ করানো হয়।— সংসারের চাপে ওঁকে যে উপার্জনের জন্যে সময় নষ্ট করতে হয় এটাই আমার কাছে একটা মর্মান্তিক পরিহাস মনে হয়, তার উপরে যদি গয়লার হিসেব আর মাছের বাজার, ধোপার কাপড় আর ছেলের বালির খোঁজও ওঁর ঘাড়েই চাপানো যায়, তাহলে আর ওঁর জীবনে থাকে কী? এ বাড়ির কোন জিনিস কীভাবে কোথায় আছে তা উনি কিছুই জানেন না। আর জানলেও ওঁর মনে থাকে না।

আশ্চর্য তো! ভদ্রলোক একটু অন্যমনস্ক হলেন।

আমার স্বামী পর্দার ফাঁকে মুখ বার করে বললেন, কী যে কোথায় রাখো—কিচ্ছু যদি পাই দরকারের সময়!

আমি হেসে উঠে গেলাম। দেখলুম, ঐ সময়টুকুর মধ্যেই ঘরে একটি দক্ষ-যজ্ঞের ব্যাপার হয়েছে। গোছানো বিছানা উলট-পালট—পরিচ্ছন্ন টেবিল একটি আস্তাকুঁড়।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই তীব্রচোখে তাকালাম ওঁর দিকে।

ছেলেমানুষের মতো মাথা ঝেকে বললেন, পাই না তা কী করবো।

তাই বলে এ রকম করবে ঘরদোর—গম্ভীর মুখে নির্দিষ্ট জায়গায় হাত দিয়ে বার করলুম লাল চামড়ার খাতাটি, তারপর বললুম, জানা কথাই তো পাবে না, কেবল অগোছালো করে আমার কাজ বাড়ানো!

তাড়াতাড়ি মুখের কাছে এগিয়ে এলেন উনি—আমি বললাম, অসভ্যতা করতে হবে না।

তবে বলো রাগ করোনি।

তা বলবো কেন—রাগ না করবার কী আছে বলতে পারো? এটা কিন্তু আমি দেখাবো না।

কেন দেখাবে না?

আমার ইচ্ছে।

সবই তোমার ইচ্ছে—আর আমার ইচ্ছে নেই। টেনে উনি খাতাটা নিয়ে নিলেন।

সংকোচ ছিলো সত্যি। প্রথম কথা, আজকেই প্রথম নয়—আরো দু একদিন ভদ্রলোকের সঙ্গে যা সামান্য আলাপ হয়েছিলো তা থেকেই বুঝেছিলাম স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ইনি মনের মধ্যে একটা অবহেলা পোষণ করেন—কেমন যেন সদয় ভাব। কিন্তু সংকোচ কেটে গেলো যখন উনি মুখ তুললেন। খাতাটা কোলের উপর রেখে অনেকক্ষণ বসে রইলেন চুপ করে, তারপর বললেন, চমৎকার। আমার স্বামী খুশি হয়ে বললেন, কিছুতেই কি দেখাবে জোর করে নিয়ে এলাম—আমি জানতাম এ আপনি তুচ্ছ করতে পারবেন না।

এ কথাগুলো আপনি গেয়ে যেতে পারেন?

লজ্জিত হয়ে বললুম, আমি কি গান করতে পারি, না শিখেছি।

গান তো ঐশ্বরিক—এ কি শিক্ষাসাপেক্ষ? এই যে কথা দিয়ে আপনি এমন বিরহ-মিলনের অদ্ভুত তত্ত্ব তৈরি করেছেন—এ কি কেউ শেখালে কোনো-দিনই পারতেন? আমি তো সমস্ত জীবনের সাধনাতেও এমন একটি সহজ সুন্দর আবেষ্টন কিছুতেই তৈরি করতে পারতাম না।

আমি এ কথায় আরক্ত হলাম। আমার স্বামী বাজাতে শুরু করলেন। বাঁশি বাজলে যেমন সাপ না-নেচে পারে না—উনি বাজাতে শুরু করলেও আমার গলা দিয়ে আপনিই স্বর বেরিয়ে আসে। খাতা দেখে গানগুলো আমি গাইলাম। ক্রমে বাজনা নিবিড় হয়ে হয়ে শেষে সূক্ষ্ম হলো—অবশেষে থামলো—আমিও থামলাম!

ঘরের মধ্যে তিনটি প্রাণী স্তব্ধ হয়ে বসে আছি—কারো মুখে কথা নেই। দেখলুম, ভদ্রলোকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মুগ্ধতার আবেশে গভীর—আমার উপরই সে দৃষ্টি নিবদ্ধ। তাঁর মুগ্ধতা অনুভব করে রোমাঞ্চিত হলুম—অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘন ঘন তাঁর মুখের উপরই আমার চোখ ঘোরাফেরা করতে লাগলো—কিন্তু তাঁর দৃষ্টি স্থির।

এক সময়ে নিশ্বাস ফেলে উঠে বললেন, আজ যাই।

সে কী, আর একটু বসুন। আমার স্বামী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম।

না—আজ আর অন্য কিছু নয়। ধীরে ধীরে উনি বেরিয়ে গেলেন।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে স্বামীকে বললুম—তুমি ভালো বলো, তাতে হৃদয় আপ্লুত হয়—তুমি যে কত ভালোবাসো তারই প্রমাণ পাই বারে বারে, কিন্তু মনের অবচেতনে বোধহয় যারা ভালোবাসে না, তারা কিছু বলুক, নিরপেক্ষ কোনো লোক সত্যি সত্যি আমার মধ্যে কিছু আছে কিনা তা বিচার করুক, এটাই চেয়েছিলাম।

আমার স্বামী বললেন, তুমি তো দেখাতে চাওনি। আমি জানতাম এমন দিন আসবেই যেদিন তোমাকে কেউ গুণীজনের স্ত্রী বলেই সম্মান করবে না—তোমার জন্যই তোমার সম্মান হবে।

আমি বললুম, সম্মানের জন্য নয়, তোমার যোগ্য হবার জন্যই আমার বড়ো হতে ইচ্ছে করে।

এ কথার পরে আমার স্বামী চুপ করে রইলেন। তাঁর স্পর্শে অনুভব

করলুম তিনি আনন্দে বিহ্বল হয়েছেন।

বাড়িটি আমাদের দুজনের পক্ষেও ছোটো—তারই মধ্যে একটি ঘরে একটি ঘরজোড়া নিচু তক্তাপোশের উপর নানারকম খাঁজ কেটে নানারকম যন্ত্র রাখা হতো। সকালবেলা ঘুম ভেঙেই তিনি ও ঘরে যেতেন—ওখানেই চা খেতেন—আর রেওয়াজ করতেন। তিনি যতক্ষণ রেওয়াজ করতেন ততক্ষণ আমি সংসারের কাজে ঘুরে বেড়াতুম। কতগুলো স্বভাব তাঁর একেবারেই ছেলেমানুষের মতো ছিলো। খাওয়াপরা সকল বিষয়েই তাঁর মনের মধ্যে কতকগুলো কল্পনা থাকতো--অথচ মুখে তা তিনি বলতেন না—কিন্তু তাঁর ইচ্ছা বা অভ্যেস আমার এতই মুখস্থ ছিলো যে আমি তাঁর সঙ্গে দুএকটা কথা বলেই তাঁর সকল ইচ্ছা বুঝতে পারতুম আর সেই অনুসারে ব্যবস্থা করতুম। কখনো কদাচিৎ সেই ব্যবস্থার ত্রুটি ঘটলে ভারি ছেলেমানুষি করতেন। তাছাড়া অসম্ভব অগোছালো ছিলেন বলেও তাঁকে নিয়ে আমার মুশকিল হতো। গানের ঘরেই সেই নিচু তক্তাপোশের পাশে পাশে ছোটো ছোটো শেলফে তাঁর গানের বই, খাতা, রেকর্ড, স্বরলিপি আলাদা আলাদা করে সাজানো থাকতো। প্রত্যেক শেলফে একটা করে ঢাকা ঝোলানো থাকতো—তার মধ্যে সুতোর অক্ষরে লেখা থাকতো কোনটার মধ্যে কী আছে। অথচ প্রত্যহ উনি বইয়েরটাতে খাতা, খাতার মধ্যে রেকর্ড, রেকর্ডের বাক্সে স্বরলিপি ঢুকিয়ে একটা অস্থির কাণ্ড করে রাখতেন। এ নিয়ে বকুনি খেতেন যথেষ্টই, কিন্তু শোধরাবার চেষ্টা ছিলো না—বেশি কিছু বললে এমন একটা ক্ষমাপ্রার্থীর ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকাতেন যে ঐ চোখের দিকে তাকিয়ে আর কিছু বলতে ইচ্ছে করতো না।

সেদিন সকালবেলা উঠেই আবার সেই সুরটি তৈরি করতে বসলেন (যেটি অন্তরায় এসে ভুল হচ্ছিলো)। আমি বললুম, অসম্ভব। এই সকালে আমি কাজকর্ম ফেলে বসতে পারবো না।

কিন্তু তা কি আর হয়। বসলুম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটলো—কিন্তু সেই একই ভুল! কেন ভুল—কিসে শোধরাবে—কিছুই বার করা গেলো না। ভারি হতাশ হলেন উনি—ভালো করে খেতে পারলেন না—কোনো কাজে মন দিলেন না, সারাদিন অন্যমনস্ক হয়ে কেবলই হাতে তুড়ি দিয়ে দিয়ে ঠোঁট নাড়তে লাগলেন।

আমি বললুম, ব্যাকুল হোয়ো না—নিশ্চয়ই একদিন এ সুর ধরা দেবে তোমার কাছে। উনি বললেন, উঁহু—এজন্য চাই ভাষা—ভাষার আবেদনে যদি সুর আসে—চলো, আমি আবার বাজাবো আর তুমি কথা তৈরি করবে।

সমস্ত দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেলো—ক্লান্তিতে অবসন্ন হলুম—সুর এলো না। আমি উঠে এলুম, উনি যন্ত্র হাতে বসে রইলেন ধ্যানস্থ হয়ে।

সন্ধ্যেবেলা আবার এলেন ভদ্রলোক। দরজা খুলে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালুম। আমার দিকে একবার তাকিয়ে মৃদুহাস্যে বললেন, ভালো আছেন? পণ্ডিত কই? আমার স্বামীকে তাঁর সমসাময়িকরা অনেকেই পণ্ডিত বলে সম্বোধন করতেন। পাখা খুলে দিয়ে বললুম, বসুন, ডাকছি।

গানের ঘরের ভেজানো দরজা খুলে আমি অবাক হয়ে গেলাম। ঘরটা যেন সুরে ভরে গেছে—দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তারের ঝংকার আর সেই একঘর সুরের মধ্যে বসে আছেন আমার স্বামী, হাতের আঙুল বেয়ে তাঁর নেমে আসছে সুরের বন্যা। দুই চোখ তাঁর বোজা, নিজের মধ্যেই নিজে তিনি মগ্ন। ডাকলুম, শোনো—দাউ দাউ আগুনের মধ্যে থেকে যেন উনি বেরিয়ে এলেন—ডাক কানে যেতেই চকিত হয়ে চোখ তুললেন, আমার দিকে তাকিয়ে পরমুহূর্তেই শিশুর মতো উচ্ছ্বসিত গলায় বলে উঠলেন, পেয়েছি, পেয়েছি—তুমি আশ্চর্য! তুমি মহৎ! তোমার কাছে আমি হার মানলাম আজ।

আমি লাফিয়ে উঠলুম, পেয়েছো? ঠিক সুর পেয়েছো?

তখন তুমি গাইছিলে—তোমার গলা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিলো সে সুর। চোখ বেঁধে দিলে অন্ধ যেমন কাছ ঘেঁষে যায় অথচ চোখ ধরতে পারে না—ঠিক সে রকম একটা আন্দাজ পাচ্ছিলাম তোমার গলায়—কিন্তু আমি ধরতে পারছিলাম না—এইবার পেয়েছি—এসো।

বললাম, ঐ ভদ্রলোক এসেছেন।

কে? কবি?—ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, দাঁড়াও, আমি একেবারে স্নান করে আসি! আমি এ ঘরে চলে এলুম। অন্ধকার হয়ে এসেছিলো—আলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে বললুম, আজ সমস্তটা দিন উনি পাগলের মতো খেটেছেন। স্নান করে আসছেন।

ভদ্রলোক বললেন, আপনিও কি ব্যস্ত?

না, ব্যস্ত আর কি।

তাহলে বসুন না।

বসলুম।

একটু পরে উনি বললেন, নতুন কিছু লিখলেন?

লজ্জিত হয়ে বললুম, কী আর।

আশ্চর্য আপনার সৃজনীশক্তি! আপনি যখন গান করেন তখন আপনি সৃষ্টি করেন—আমি তো ভাবতেই পারি না মেয়েদের মধ্যে কী করে আপনি সম্ভব হলেন!

বললুম, আমাকে অত অসামান্য করে দেখছেন, সে আপনারই মহত্ত্ব! কিন্তু এ কথা না বলে পারছিনে যে মেয়েদের সম্বন্ধে আপনার আশাটা বেশি উঁচু নয়, সম্মানটা তত গভীর নয়।

আমার? কখনোই না। আপনি ভুল বলছেন। আমি অনেক দেখেছি, অনেক ভেবেছি—কিন্তু পুরুষ এনে দেবে আর তাঁরা খাবেন আর সন্তানপালন করবেন, এ ছাড়া তো দ্বিতীয় অবস্থা আমি দেখিনি।

একটু আহত হয়ে বললাম, আজকাল অন্তত এ কথা খাটে না।

আজকাল? আজকালকার অবস্থা আরো শোচনীয়!

ভদ্রলোকের নিজের কথার উপরে এত দৃঢ় প্রত্যয় যে আমি আর কথা কাটলাম না।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললেন, রাগ করলেন ?

না তো।

তবে যে জবাব দিলেন না ?

কী বলবো বলুন।

পরদা ঠেলে আমার স্বামী ঘরে ঢুকে বললেন, একেবারে স্নান করে নিলাম ! আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, একটু চা দাও ওঁকে।

ভদ্রলোক বললেন, ওঁর সঙ্গে আমার তর্ক হচ্ছিলো মেয়েদের নিয়ে—

ওরে বাবা, ওদিকেই যাবেন না—ইনি কিন্তু ভীষণ ফেমিনিস্ট। তার চেয়ে চলুন ওঘরে যাই। ভদ্রলোককে নিয়ে আমার স্বামী গানের ঘরে এলেন—আমি চায়ের কথা বলে গা ধুতে গেলুম।

ফিরে এসে দেখলুম গানের টেকনিক নিয়ে কথা বলছেন ওঁরা। আরো অনেক আগন্তুকে ঘর একেবারে ভর্তি। বক্তা বলতে গেলে একমাত্র আমার স্বামীই। গান সম্বন্ধে তাঁর মনে কতগুলো অদ্ভুত ধারণা ছিলো—অন্যেরা তা হয়তো বুঝতেন না, কিম্বা বুঝলেও একেবারে নতুন কিছু করতে ভরসা পেতেন না। চায়ের ব্যবস্থা নিয়ে ঘরে ঢুকতেই সবাই কথা থামিয়ে আমাকে একবার অভিবাদন জানিয়ে আবার কথা আরম্ভ করলেন। আমি নিচু হয়ে চা ঢালতে ঢালতে শুনছিলুম ওঁদের আলোচনা—সহসা সেই ভদ্রলোক বললেন, আপনি কিছু বলুন—এর সহজ মীমাংসা বোধ হয় একমাত্র আপনিই করে দিতে পারবেন।

এ কথায় আমি চকিত হয়ে চোখ তুললুম—অনেক জোড়া চোখও আমার উপরে নিবদ্ধ হলো। এত সব সূক্ষ্ম আর জটিল তর্কের মধ্যে যে আমাকেও কথা বলবার জন্যে কেউ আহ্বান করছেন এটা আমার পক্ষে সম্মানের সন্দেহ নেই—অন্যদের দিকে পলকমাত্র দৃষ্টিপাত করে দেখলুম অন্য কোনো চোখেও এ কথাটার সায় আছে কিনা। হতাশ হয়ে আমার দৃষ্টি ফিরে এলো—বললুম, ঠাট্টা করছেন ?

ঠাট্টা ! আমার কথা শুনে কি আপনার ঠাট্টা মনে হলো ?

আমি যাই মনে করি না কেন—অন্য সবাই এ কথাকে তা ছাড়া আর কিছুই মনে করেন নি।

সকলের গলায়ই একটি মৃদু আপত্তির গুঞ্জন উঠলো, এ আপনার অন্যায় ধারণা। সত্যিই কিছু বলুন না এ বিষয়ে।

আলগা শোনালো তাঁদের প্রতিবাদটা। আমার স্বামী নিবিষ্ট হয়ে কী ভাবছিলেন, হঠাৎ বললেন, সত্যি তুমিই বলো না—আমাদের সঙ্গীত কি এখন একেবারেই নিষ্প্রাণ হয়ে যায়নি ? কী আছে এর মধ্যে ? একে আবার গড়তে হবে—প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে সুরের মধ্যে। আমি রাগ মানি না, রাগিণী মানি না—

বাধা দিয়ে একজন বললেন, তাই বলে তো আপনি এক ফুঁয়ে এসব রাগ-রাগিণীকে উড়িয়েও দিতে পারেন না—আবহমান কাল থেকে চলে আসছে এসব সুর—

আমি বললুম, আবহমান কাল থেকে চলে আসছে বলেই যে সেটাই চরম তা কেন বলছেন ? আর এ কথা কি কেউ জানে যে সত্যি সত্যি কোন রাগিণীর কখন কী রূপ ছিল ? একশো বছর আগে এই ভৈরবীই যে রাত্রে গাওয়া হতো না আর ইমনই যে ভোরে গাইবার প্রচলন ছিলো না তা কে জানে ?

তাই বলে কোনো একটা নিয়মকে ভেঙে দেবো, এরকম একটা পণ করে গান করতে বসাও কম বিড়ম্বনা নয়।

উহু, তা নয়—ভদ্রলোক ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে বললেন, উচ্ছৃঙ্খলতাটাই যে প্রগতি তা তো উনি বলছেন না। এখন সঙ্গীত এসে এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছে যেখানে নতুন সৃষ্টির প্রেরণায় যদি এর রীতি না বদলায় তাহলে আনন্দের উপলব্ধিটা অবশ্যই ক্ষুণ্ণ হবে।

আমার স্বামী খুশি হলেন এ কথায়। অত্যন্ত মধুর করে একটু হাসলেন, তারপর হাত বাড়িয়ে একটা যন্ত্র টেনে নিলেন। স্নেহভরে খোলটার উপর হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, এটা কী ? সেতার না এস্রাজ ? বেহালা না বীণা ? তানপুরা না তবলা ? কী এটা ? চেনো না তোমরা ? কিন্তু তাই বলে কি এটার মূল্য তোমরা কম বলতে চাও ? আর আমার রচিত যে সুরটি আমি এখন বাজাবো, (তাঁর আঙুল কথার সঙ্গে সঙ্গে তারের উপর লীলায়িত হলো), বলো দেখি তা পূর্বী না পূরিয়া, জয়জয়ন্তী না তিলক কামোদ, কানাড়া না বারোয়াঁ—বিশ্লেষণ করলে কি ঠকলে—আমাকে গাইবার জন্য ইশারা করলেন—তারগুলো সব ঝমঝম করে উঠলো তাঁর স্পর্শে।

আমি বললুম, আমি কি জানি এটা ?

ভদ্রলোক বললেন, নিশ্চয়ই জানেন—আপনি জানেন না এ আমি বিশ্বাসই করতে পারি না।

আমার স্বামী বললেন, এত সংকোচ থাকলে হয় কখনো ? আশ্চর্য ওঁর কান।—আচ্ছা দেখুন তো, যে সুরটা আমি বাজাচ্ছি এর কোনো জায়গায় আপনাদের খটকা লাগে কিনা। ঢেউয়ের মতো তারের উপর দিয়ে আমার স্বামীর আঙুল গড়িয়ে যেতে লাগলো—দু'একজন নিতান্ত সজাগ প্রহরী ছাড়া আপনা থেকেই সকলের চোখ বুজে এলো।

একজন তাকিক উশখুশ করছিলেন—বাজনাটা থামতেই বলে উঠলেন, ভুল কোথায়, তা ঠিক বুঝছিনে, তবে ভুল যে হচ্ছে এটা কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে।

ভদ্রলোকটি বললেন, তা বললে তো চলবে না, ভুলটা কোথায় তাই আপনাকে ধরতে হবে।

আপনি পেরেছেন ?

না।

তবে ?

তবে কী। আমি তো তর্কও করিনি।

আর সবাই চুপ করে ছিলেন—এর মধ্যে কোনো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এক চুল ভুল রয়েছে কারো কানেই সেটা ধরা পড়েনি।

আমার স্বামী বললেন, এ ভুল আমিও ধরতে পারিনি—পেরেছেন উনি—

আর ভুলের সংশোধনও আমি ওঁর গলা থেকেই পেয়েছি—এই শুনুন— তিনি আবার অন্তরাটা ধরলেন— আমি সুর তৈরি করি, কিন্তু তাই বলে তা তো অনিয়মে চালাইনি—একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে এর মধ্যে—একটা সুনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলায় আবদ্ধ আছে এসব সুরের পর্দা—সেই পর্দাচ্যুত হচ্ছিলাম—অথচ বুঝতে পারছিলাম না—এই দেখুন নিখাদ আর রেখাব থেকে কেমন করে সুরটা আমাকে টেনে রাখতে হবে। এখানে আঙুল হেলাবো না—কিন্তু মনে হবে হেলাচ্ছি—দুটো শ্রুতি বার করতে হয়েছে এখান থেকে। এই দেখুন।

প্রত্যেকেই কান পেতে গ্রহণ করলেন তফাৎটা—একটু অবাক হলেন সত্যি-সত্যি আমার এই সূক্ষ্ম শ্রুতিবোধ দেখে। চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে একজন বললেন, আশ্চর্য তো আপনার কান। ভদ্রলোক চুপ করে তাকিয়েছিলেন আমার দিকে—চোখে চোখ পড়তেই মাথা নিচু করে গানের কথাগুলো দেখতে লাগলেন। এক সময়ে মুখ তুলে বললেন, আপনারা কি শুধু ওঁর শ্রুতিবোধটাই দেখলেন—ওঁর অদ্ভুত রচনাশক্তিতে আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। এ ধরনের রচনা সত্যিই বিরল।

আমি অস্বস্তি বোধ করে উঠে দাঁড়ালুম। ভদ্রলোক বললেন, কী বলবো পণ্ডিত, আপনার স্ত্রীভাগ্যে ঈর্ষা না করে পারছি না।

পণ্ডিত মৃদু হাসলেন— আমি ঘরে চলে এলুম।

এর পরে সেই ভদ্রলোক যেদিন এলেন আমার স্বামী বাড়ি ছিলেন না। আমি দ্বিধাজড়িত গলায় বললুম, উনি এখুনি আসবেন—বসুন না একটু।

তা উনি নাই বা এলেন—নিতান্ত সহজ গলায় হাসিমুখে ভদ্রলোক বললেন, আপনি তো আছেন। আপনার সঙ্গও আমার কাছে পণ্ডিতের চাইতে কম লোভনীয় নয়।

বিনয় করে বললুম, কত ভাগ্যে আপনাদের মতো গুণীমানীর সাহচর্য লাভে ধন্য হচ্ছি, কত পুণ্য করেছিলাম তাই আমার বাড়ি আপনারা ধন্য করেন—কিন্তু তাই বলে আমি তো এটুকু বুঝি যে আমার মধ্যে এমন কিছুই নেই যা দিয়ে আপনাদের ধরে রাখতে পারি।

আপনার বিনয় অনুকরণীয়—, হাতের ছাতাটি দেয়ালে ঠেশ দিয়ে আরাম করে বসতে বসতে ভদ্রলোক বললেন—আমি কিন্তু অনেক পরিশ্রম করে এলাম। আমাকে এক্ষুনি একটু চা দিতে হবে।

নিশ্চয়ই—চায়ের জল চাপিয়ে এসে আবার বসলুম।

ভদ্রলোক বললেন, আপনার রচনা দেখে সত্যি আমি আশ্চর্য হয়েছি। সুরগুলোকে কথা দিয়ে মূর্তি দেওয়া তো সহজ নয়—কদিন লাগে আপনার?

আমি এ কথার অবতারণায় একটু কুণ্ঠিত হলুম। বললুম, ও আর কী। হয়তো ভালো করে কিছু করলে সময় লাগতো—আমি ওঁর সুর বাজানোর সঙ্গে সঙ্গেই কথা তৈরি করি—বাজনাটা থামলে আর পারি না। সুরে সুরে আমি কথোপকথন শুনতে পাই।

শুনতে পান! তাই তো—শুনতে না পেলে কি কেউ এমন সহজে এমন

আশ্চর্য কথা লিখতে পারে। মনেরও তো একটা কান আছে। আমি একটা বৃহৎ উপাখ্যান লিখছি—সকাল থেকে রাত বারোটা অবধি যত রাগরাগিণী আছে তাদের নিয়েই আমার এই উপাখ্যান। যখন যে রাগিণীই আমার নায়িকা হয় তখনই তার মধ্যে আমি যেন ঠিক আপনাকে দেখতে পাই। কেন এমন হয়, বলতে পারেন?

অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বললুম, কী যে বলেন।

দেখুন, আপনাকে দেখবার আগেই আমি উপাখ্যানের প্রথম অধ্যায় লিখতে শুরু করি—কিন্তু কিছুতেই আপন অন্তরের মধ্যে তাকে উপলব্ধি করতে পারছিলুম না—আর এখন আমি লিখতে লিখতে কোথায় চলে যাই—কী আনন্দে যে আমাব অন্তর ভরে ওঠে—একটু বিহ্বল হয়ে থেমে রইলেন ভদ্রলোক, তারপর কথার স্বর বদলে ফেলে বললেন, ভেবে দেখলুম মেয়েদের যে শক্তি বলে আখ্যা দিয়েছে কথাটা খাঁটি সত্যি—

জুতোর শব্দ করতে করতে পণ্ডিত এসে ঘরে ঢুকলেন। ঘোরাঘুরিতে বিস্রস্ত চুল—ঈষৎ লালচে ও ঘর্মাক্ত মুখ—আমি মুখেব দিকে তাকালুম। পরিশ্রমেও কি মানুষকে এমন মনোহর কবে? অন্য দিনের চেয়ে আজ একটু দেরি করেছেন ফিরতে—ভিতরে ভিতরে একটা উৎকণ্ঠা চলছিলো—যদিও খুব প্রত্যক্ষভাবে আমি তা টের পাচ্ছিলুম না—কিন্তু তাঁকে দেখে হৃদয়টা হঠাৎ যেন একটা নিশ্চিন্ততায় ভবে গেলো। আমার মুখ চোখ আপনা থেকেই উজ্জল হয়ে উঠলো। ভদ্রলোককে দেখে আমার স্বামী বললেন, এই যে কতক্ষণ?

মন্দ নয়--

আমার আজ একটু দেরি হযে গেলো।

তা আর কী হয়েছে, ইনি ছিলেন।

বসুন।--আমার স্বামী ভিতরে এলেন, এসেই আবার মাথা বার করে বললেন, চমৎকার একটা সুর ভেবেছি—আপনার সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলবো—

ভদ্রলোক হেসে বললেন, পণ্ডিত একেবারে খাঁটি শিল্পী। সম্পূর্ণ সায় দিয়ে বললুম, সত্যি—ভিতবে আসবার তাগিদে উঠে দাঁড়ালুম। ভদ্রলোক বললেন, এতক্ষণে আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে আপনার যেন প্রাণ এলো।

লজ্জিত মুখে বললুম, কই, না তো।

চায়ের ব্যবস্থা করে খুঁটিনাটি নানারকম কাজ সেরে ও ঘরে যেতে আমার দেরি হলো। গিয়ে দেখলুম ভদ্রলোক উঠি উঠি করছেন। আমি যেতেই আমার স্বামী বললেন, তুমি কী করছিলে? তুমি নিজের হাতে চা দাওনি বলে ইনি খেতে পারলেন না—তুমি ছিলে না বলে ওঁর আর বসতেও ভালো লাগছে না।

ভদ্রলোক হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, নিতান্ত মিথ্যা বলেননি পণ্ডিত—এ বাড়িতে আপনার অনুপস্থিতিটা আমার একেবারেই সহ্য হয় না। আজ উঠি—

এক্ষুনি? এই তো এলেন।

আছি তো নানান্ বিপাকে—এই বলে ভদ্রলোক উঠে পড়লেন।

তিনি চলে যেতেই আমার স্বামী হাই তুলে বললেন, যাই স্নান করে আসি। ট্রামে বাস-এ কি আর আজকাল চড়া যায়? নরক—একেবারে নরক। কী করে যে ঝুলে বাড়ি ফিরি।—চলে গেলেন তিনি স্নান করতে।

তাঁর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে গভীর ভালোবাসায় আমার হৃদয় উচ্ছল হয়ে উঠলো—একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

একটু পরেই উনি স্নান সেরে বেরিয়ে এলেন। একটা গেরুয়া রংয়ের পাজামার উপরি একটা সিল্কের চাঁপা-ফুল রংয়ের পাঞ্জাবী পরেছেন. মাথার চুল চুঁইয়ে জল পড়ছে টপটপ করে—জলের স্পর্শে চোখ দুটি রক্তবর্ণ। আকাশে বাতাসে আজ কী দেখেছেন উনি, অত্যন্ত উন্মনা—মাথা না আঁচড়েই জানলার ধারে দাঁড়িয়ে রইলেন চুপচাপ। বুঝলাম, ভিতরে ভিতরে ওঁর সৃষ্টির কাজ চলেছে। নিঃশব্দে খাতা আর কলম সাজিয়ে দিলাম টেবিলে—তারপর শুকনো তোয়ালে দিয়ে জলভরা চুল মুছে দিতে দিতে বললাম, তুমি হলে কী? চুলটাও মুছতে পারো না ভালো করে? সচেতন হয়ে ফিরে দাঁড়ালেন আমার দিকে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বললেন, তোমার নাম কি সরস্বতী? তুমি কি ভালোবাসো আমাকে, না আমার সৃষ্টিকে? আমার কী মনে হয়, জানো? তুমি সেই ধরনের মানুষ, যারা গুণীর মর্যাদা দেবার জন্যই উন্মুখ—তাঁদের সুখ সুবিধার অভাব হয়েছে শুনলেই হৃদয় হাহাকারে ভরে যায়—কিন্তু স্বামী বলে কোনো আলাদা ভালোবাসা কি আছে তাদের অন্তরের মধ্যে?

হাতের কাছে চিরুনিটা দিয়ে বললুম, এবার মাথাটা আঁচড়াও তো।

আচ্ছা, সত্যি করে একটা কথা বলবে? আমাকে যখন তুমি সমস্ত সংসারের বিরুদ্ধে লড়াই করে বিয়ে করেছিলে, তখন কি এই ব্যক্তিটাই ছিলো বড়ো, না কি তার যোগ্যতা?

এ কথার উত্তরে আমি বললুম, যোগ্যতাই মানুষের ব্যক্তিত্বের চরম প্রকাশ।—হতে পারে মানুষের ভালোবাসা অন্ধ—একটা লালাঝরা হাবাকেও হয়তো কত মেয়ে ব্যাকুল হয়ে ভালোবাসছে—আবার অতি কদর্য হীনস্বভাব একটি মেয়েকেও হয়তো একজন পুরুষ তার সকল হৃদয় সমর্পণ করে বসে আছে, কিন্তু তবুও একজন মানুষের সঙ্গে আরেকজন মানুষের যখন একটা সম্বন্ধ দাঁড়ায়, তখন তার যোগ্যতাটাই প্রথমে মুগ্ধ করে। তারপর তা ছাড়িয়ে ব্যক্তির উপর চলে যায়—

তাহলে কথাটা এই দাঁড়ালো যে প্রথমে গুণ দিয়েই মানুষ মানুষের হৃদয় জয় করে—তারপর সে নিজে—

তর্ক যদি করতে চাও, এ নিয়ে অনেক কথাই বলতে হয়, কিন্তু সন্ধ্যেবেলায় বসে বসে তা করবো না—অনেক কাজ আছে। আমি চলে আসছিলাম, আমার স্বামী আঁচল টেনে ধরলেন। না, তুমি যেয়ো না—সব সময় আমার কাছে থাকো তুমি। তুমি এত ভালো—এত আশ্চর্য যে আমার কেবলি ভয় হয় এই বুঝি হারিয়ে ফেললাম। আমি কি তোমার যোগ্য?

বুঝলাম, কোনো কারণে একটু বিচলিত হয়েছেন। মাথার চুলে আদর দিতে দিতে বললাম, পাগলামি না করে স্বরলিপির কতগুলো নতুন চিহ্ন বার করো তো। আর এক্ষুনি যদি না টুকে নাও, তাহলে ঐ নতুন সুরটাও হারিয়ে যাবে কিন্তু।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। আমার আঁচল ছেড়ে হাতের উপর হাত রেখে একটু চাপ দিলেন, তারপর নীল শেড্ দেওয়া টেবিল-ল্যাম্পের তলায় মাথা নিচু করলেন তিনি। খাতার পাতা নিমেষে অদ্ভুত সাংকেতিক চিহ্নে রহস্যময় হয়ে উঠলো। তাঁর মুখে এতক্ষণ যে একটা সুখ-দুঃখের ছায়াপাত চলছিলো, সেটা কেটে গিয়ে উজ্জ্বল আভাময় প্রতিভা ফুটে উঠলো। নিশ্চিন্ত হয়ে আমি কাজে গেলুম।

এর কয়েকদিন পরেই কোনো এক সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে একটি গানের আসর বসলো। বাইরে থেকে একজন বীণা-বাদক এসেছিলেন, তিনিই আসল অতিথি—তাঁরই বাজনা। একটা বাজনা শেষ হলো এইমাত্র! সবাই স্তব্ধ। এমন সময় দরজা ঠেলে ঐ ভদ্রলোক ঢুকলেন। অকৃত্রিমভাবে খুশি হয়ে উঠলাম আমি। মনে মনে আমি তাঁর কথাই ভাবছিলাম। কেবলি মনে হচ্ছিলো এলে বেশ হয়।

ঘরে ঢুকেই একবার চারদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে বললেন, এ যে গান বাজনার ব্যাপার। আমাকে যে খবর দেননি?

তাঁর ছেলেমানুষি-ভরা অভিমানের ভঙ্গিতে আমি ঈষৎ হেসে জবাব দিলাম, প্রত্যক্ষভাবে দিইনি, কিন্তু পরোক্ষে দিয়েছি।

কী রকম?

মনে মনে তো আপনাকেই প্রার্থনা করছিলুম এতক্ষণ। বসুন।

আমার এ কথায় ভারি খুশি হলেন তিনি। হাসিমুখে আমার স্বামীকে সম্বোধন করে বললেন, পণ্ডিত, আমি তো অযাচিত অতিথি, কিন্তু ইনি বলছেন, তা নয়—মনে মনে আমাকেই ইনি প্রার্থনা করছিলেন।

আমার স্বামী হেসে বললেন, খুব আনন্দের কথা। আপনার সঙ্গে এঁদের পরিচয় করিয়ে দি।

পরিচয়ের পালা সমাপ্ত হতেই ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, চা বুঝি শেষ?

শেষ হলেও আপনাকে এক কাপ দিতে পারবো।

সত্যি! তাই জন্যেই তো কখনো কোনো ক্লান্তি এলেই আমার এখানে আসতে ইচ্ছে করে। শুধু কি চা-ই? আপনি যে দিচ্ছেন—তাতে যে আপনার স্নেহও পরিবেশিত হচ্ছে, এ কথা ভেবেই আমার সবচেয়ে বেশি আনন্দ হয়। আপনাকে কী বলে যে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবো!

সত্যি সত্যিই হৃদয়ের মধ্যে একটা স্নেহ অনুভব করলুম ভদ্রলোকের জন্যে। আমরা মেয়েরা যাদের হৃদয়বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল আর কোমল আমাদের কাছে ঠিক এই ধরনের মানুষদের ভারি অসহায় বোধ হয়। তাদের আপন বলে ভাবতে আমরা দ্বিধা করি না।

হঠাৎ আমার স্বামী বললেন, কবি, আপনার এবার বিয়ে করা উচিত।

বিয়ে? বিয়ে করবো কেমন করে? এমন তো কোনো মেয়ে দেখলুম না, যাকে দেখেই স্ত্রী বলে পেতে ইচ্ছে করে।

একজন আমাকে উদ্দেশ্য করে হেসে বললেন. দেখলেন তো, আপনার উপস্থিতিতেই উনি মেয়েদের ওরকম করে কথা বলছেন।

ভদ্রলোক বলে উঠলেন, উনি? ওঁর সঙ্গে তো কারো তুলনা হতে পারে না—ওঁর মতো মেয়ে কি আর একাধিক জন্মায়? পণ্ডিত সত্যিই পণ্ডিত! উনি শুধু সঙ্গীতের আসল রসই আবিষ্কার করেননি, জীবনের সুখ-শান্তির আসল মূলটিও উনি খুঁজে বার করেছেন। ওঁর মতো স্ত্রী কি আর সকলের ভাগ্যে জোটে!

এ কথায় আমি লজ্জিত হলুম। একটু উসখুস করে উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, যাই, আপনার চা নিয়ে আসি।

রাত বারোটা পর্যন্ত চললো গান বাজনা—অনেক তর্ক, অনেক কচকচি কিছু বুঝলাম, কিছু বুঝলাম না—বিদায় নেবার সময় ভদ্রলোক বললেন, এত ভালো লাগে আপনাদের এখানে এলে, মনে হয় রোজ আসি!

স্বামী তখনো গুনগুন করছিলেন, আমি বললুম, বেশ তো, সে তো আমাদের সৌভাগ্য। আর ভালো লাগাটা তো পারস্পরিকই।

পারস্পরিক? আশ্চর্য! আমার তো ধারণা কেউ আমাকে পছন্দ করে না। সংসারে আমি একটা উৎপাত। এই দেখুন বাড়িতে কেউ আমাকে দুচক্ষে দেখতে পারে না—রাগ করে তিন দিন খাইনি খাইনি তো খাইনি! কার বয়ে গেছে আমাকে সেধে সেধে খাওয়াতে। আসলে কী জানেন, মানুষটা আমি নিতান্ত সৃষ্টিছাড়া—কী বলা উচিত, কী করলে কী হয়, কিছু ভেবে-টেবে চলি না—তাই কারো প্রিয়ও হতে পারি না।

গুনগুনানি থামিয়ে আমার স্বামী বললেন, একটা গানের কাগজ বার করবো ভাবছি—আপনার উপাখ্যানটি কদ্দূর?

হয়ে এলো—লেখাটা যে আমার কী ভালো হচ্ছে ভাবতে পারবেন না। কাব্যলক্ষ্মী আমাকে ধরা দিয়েছেন—তাঁকে যেন চোখে দেখতে পাই আমি।

আমি বললুম, আপনারা যে ধরনের সঙ্গীত রচনা করছেন তা দেশের লোক গ্রহণ করবে কিনা তার একটা মহড়া হয়ে গেলে মন্দ হতো না। এতে তো একেবারে সঙ্গীত আর সাহিত্য ওতপ্রোতভাবে জড়ানো হচ্ছে—সুরসৃষ্টিরও যতখানি মূল্য, সুরপ্রকাশের এই ভাষাসৃষ্টিটাও তো ততখানি মূল্যবান?

নিশ্চয়ই। আমি যা লিখেছি তা বাংলাভাষায় একটা আশ্চর্য প্রেমের কাহিনী হিসেবেও স্মরণীয় হবে।

আমার স্বামী বললেন, উৎসুক রইলাম—প্রথম মহড়াটা এখানেই হবে।

ভদ্রলোক বললেন, সে তো নিশ্চয়ই—পরশুই খানিকটা নিয়ে আসবো।

পরশু? আমার স্বামী চোখ বুজে ভাববার চেষ্টা করলেন কী আছে—তারপর ব্যাকুল চোখে তাকালেন আমার দিকে।

আমি তাঁর ভঙ্গি দেখে হেসে বললুম, কিছু যদি মনে থাকে। পরশু না

তোমার একটা সভা আছে ? সঙ্গীত সম্বন্ধে উনি বলছেন সেদিন—

আপনি ? আপনিও যাবেন ?

না, আমার সেখানে নিমন্ত্রণ নেই।

তাহলে আর কী, পণ্ডিত নিশ্চয়ই দেরি করবেন না। আমাদের কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে তিনি দুমদাম করে নেমে গেলেন।

রাত্রে শুয়ে খানিকক্ষণ ঘুম এলো না আমার। ওঁর গায়ে হাত রেখে বললুম, ঘুমিয়েছো ?

না।

চুপ করে আছো যে ?

একটা কথা ভাবছিলাম।

কী কথা ?

থাক, বলবো না।

বলো না, আমি আবদারের সুরে কথাটা বলেই ওঁর আরো কাছে এগিয়ে এলুম। হাত বাড়িয়ে টেনে নিলেন তিনি—ভেজা ভেজা গলায় বললেন, ধরো যদি এমন হতো যে তোমার সঙ্গে যখন আমার দেখা হলো তখন তোমার বিয়ে হয়ে গেছে—কী হতো ?

ঈশ, কী একটা ভাবনার কথা !

আমার ঠাট্টায় উনি মন না দিয়ে বললেন, সত্যি—তুমি বুঝছো না—এটা একটা ভাবনারই কথা।

আমি একটু চুপ করে থেকে বললুম, তোমার যেন কী হয়েছে, কী যেন ভাবছো দু'দিন থেকে।

নিশ্বাস নিলেন তিনি, তারপর একটু শব্দ করে হেসে উঠে বললেন, মাথায় আমার একটু সত্যিই দোষ আছে। তুমি ঠিকই বলো।

যাক, এতদিনে বুঝেছো তবে ?

একটু একটু !

তাহলে এবার নিরুদ্বেগে ঘুমোও।

ঘুম কেন আসছে না ?

আমি কপালে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললুম, এবার নিশ্চয়ই আসবে।

আমার হাত নিজের মুখের উপর চেপে ধরলেন তিনি। কিছুক্ষণ পরে অনুভব করলুম উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমার মনটা কেমন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমের চেষ্টা করলুম—রাত চারটা বেজে গেলো, ঘুম এলো না।

একদিন বাদ দিয়ে নির্দিষ্ট দিনে আবার এলেন সেই ভদ্রলোক। ঘরে ঢুকেই একটা আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি করলেন তিনি। দড়াম করে ছাতাটা ফেলে দিয়ে আরাম করে বসলেন কৌচের উপর। বললেন, উঃ, কী ঘোরাটাই ঘুরেছি, এক গ্লাশ জল দিন শিগগির।

তাকিয়ে দেখলুম চেহারার আর হাল রাখেননি। একমাথা রুক্ষ চুল,

অতি মলিন জামা-কাপড়—মুখটা যেন পুড়ে গেছে। জল দিয়ে বললুম, এত কী ঘোরেন আপনি বলুন তো? সময় নেই, অসময় নেই? চেহারা আপনার ভয়ানক খারাপ হয়েছে।

এই দেখুন, এ কথা আপনি বললেন—কে বলতো আর? তবে আর কারো মুখে শুনলে অবিশ্যি আমার এত ভালোও লাগতো না।

চোখ নামিয়ে বললুম, বসুন। চা করে আনি।

পণ্ডিত কখন আসবেন?

খুব বেশি দেরি হবে না হয়তো—

তা হলে তো চা-টা একসঙ্গে খাওয়াই ভালো।

মৃদু হেসে যেতে যেতে বললুম, তা আর কী হয়েছে। ওঁর সঙ্গে আবার খাবেন।

ফিরে আসতেই বললেন, দেখুন, পৃথিবীতে আমি এখন যত মানুষের কথা ভাবি, আপনার কথাই ভাবি সব চাইতে বেশি। যখনই কোনো অপ্রিয় কাজ করতে হয়, তখনই মনে হয় আপনি হলে ঐ ছোটো সংসার থেকে আমাকে মুক্তি দিতেন, বৃহৎ সংসারের জন্য সময় পেতাম কিছু।

এ কথায় আমি অস্বস্তি বোধ করে বললুম, কবি, আপনি আমাকে অকারণে বাড়িয়ে তুলছেন। আমার পরিমাণ আমি তো জানি।

জানেন না। কিছুই জানেন না আপনি। কতখানি বললে আপনাকে ঠিক বলা যায় তার কোনো পরিমাণ আপনি জানতেই পারেন না—

চায়ের পেয়ালা হাতে দিয়ে বাধা দিলুম। অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু এখন চা খান।

হাসিমুখে চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, পণ্ডিত ভালোবাসেন বলে বোধহয় চা তৈরির সমস্ত তথ্যই আপনি আবিষ্কার করে ফেলেছেন? এত ভালো চা কি আর কেউ করতে পারে?

এ কথায় আমি মুখ তুলে কিছু বলতে যাচ্ছিলুম—চোখে চোখ পড়লো—কথা ভুলে গেলুম, সহসা আমার বুকের ভিতরটা যেন কেমন করে উঠলো। সহজ হতে একটু সময় লাগলো আমার। উনিও নিঃশব্দে চা পান শেষ করলেন। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এবার আমি যাই।

আপনার উপাখ্যান—

আরে, আমি তো ভুলেই গিয়েছিলুম সে কথা।

পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটু থমকে গিয়ে বললেন, আজ থাক বরং, আমার কেমন যেন ভালো লাগছে না।

ভালো না লাগার আর অপরাধ কী? সারাদিন অনিয়ম করলে কোনো মানুষেরই ভালো লাগে না।

নিয়ম? নিয়ম কী? উনি আবার বসে পড়ে বললেন, নিয়ম আমি মানি না। নিয়ম করলেই আমার শরীর খারাপ হয়। তাই জন্যেই তো আমি এখানে নিয়মিত আসি না—আমি ঠিক জানি নিয়মমতো এলে একটা বিভ্রাট আমার ঘটবেই।

আমি বললুম, বিভ্রাটটা নিতান্তই দৈব, বিভ্রাট যদি মানুষের জীবনে ঘটেই তার বিরুদ্ধে আর লড়াই চলে না।

চলে না? আপনি ঠিক বলছেন, চলে না? হঠাৎ তিনি আমার কাছাকাছি এসে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখে মুখে যেন আগুন জ্বলে উঠলো—আমার চোখে চোখ রেখে বললেন, এই যে আমি আপনাকে ভালোবাসি, এও ভালোবাসি তার বিরুদ্ধেও কি—

কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম। আমার গলা থেকে একটি শব্দ নিঃসৃত হলো—কবি!

না, না, আমাকে থামিয়ে দেবেন না, আমাকে বলতে দিন—আমাকে দয়া করুন—আমি আপনার অসম্মান করবো না—শুধু আমাকে এ কথাটি বলতে দিন—কেবল বলতে দিন যে আমি আপনাকে ভালোবাসি—নিচু হয়ে তিনি আমার পদস্পর্শ করলেন।

আমি তড়িৎস্পৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়িয়ে আহত কণ্ঠে বললুম, এতো বড়ো গুণীর যোগ্যই কি এই ব্যবহার?

গলার স্বর তাঁর যন্ত্রের মতো কেঁপে উঠলো।

রাধা, এই একটা মুহূর্ত আমাকে দাও—তোমার সুখে ভরা জীবন থেকে মাত্র একটা মুহূর্ত, মাত্র একটা মুহূর্ত তুমি আমাকে দাও—আমি দু'হাত বাড়িয়ে বাধা দেবার একটা ভঙ্গি করলুম তিনি থামলেন না—এই একটা মুহূর্ত আমাকে দিলে তোমার কিছুই ক্ষতি হবে না। কিন্তু আমি কতখানি লাঘব হবো তা তুমি জানো না, তুমি বুঝবে না, কিছুতেই বুঝবে না এ যে কত বড়ো কষ্ট -কতখানি দুঃখ।

ভদ্রলোক হাঁপাতে লাগলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ বেয়ে জলধারা নামলো।

আমি বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। পাথরের মতো ভারি হয়ে উঠলো আমার পা দুটি। মৃদু গলায় বললুম, আপনি যান।

নতমুখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। একটু সামলে নিয়ে বললেন, জানি, এই দুর্বল মুহূর্তটির জন্য মনের সংযত অবস্থায় আর আমি তোমার কাছে এসে দাঁড়াতে পারবো না—জানি, তোমার কাছে আমার আর মুখ দেখানো কত অসম্ভব হবে—কিন্তু একটা প্রার্থনা তুমি আজ পূরণ করো—আমাকে নিয়ে তুমি উপহাস কোরো না—আমার সমুদ্রের মতো গভীর প্রেমকে তুমি আর পাঁচটা সাধারণ জিনিসের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে উপেক্ষা কোরো না—

আপনি বাড়ি যান—আমার কণ্ঠস্বর এবার তীক্ষ্ণ হলো।

ভদ্রলোক যেন চাবুক খেয়ে মুখ তুললেন—একটু স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে, তারপর আস্তে আস্তে মুমূর্ষুর শেষ নিশ্বাসের মতো বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

আমি স্তব্ধ বিস্ময়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম সেখানে; সহসা চোখ ঝাপসা হয়ে এলো।

শোবার ঘরে এসে দেখলুম, ইজিচেয়ারে চোখের উপর হাত রেখে আমার স্বামী শুয়ে আছেন। তাঁর ভঙ্গিটি অত্যন্ত ক্লান্ত। বড়ো বড়ো চুল বিস্রস্ত

—পায়ের জুতো ছাড়েননি—গায়ের উড়নিটি পর্যন্ত তেমনি গায়ের উপর জড়ানো। কাছে এসে বললুম, কখন এলে?

শব্দ নেই।

মুখের থেকে চাপা হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললুম, আমি তো ঢুকতে দেখলাম না।

সোজা মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখবার চোখ ছিলো না।

নিশ্বাস ফেলে বললুম, ওঠো, জামা জুতো ছেড়ে নাও। তিনি উঠলেন না। আমি বললুম, শোনো—

ঐ যে তোমার মালা—অত্যন্ত শ্রান্ত সুরে তিনি কথাটা উচ্চারণ করলেন।

তাকিয়ে দেখলুম, বিছানার উপর বেলফুলের কুঁড়ির একটি মস্ত মালা পড়ে আছে—হাত বাড়িয়েছিলুম, হঠাৎ লাফ দিয়ে আমার স্বামী উঠে দাঁড়ালেন, এক ধাক্কায় আমাকে সরিয়ে দিয়ে মালাটি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে আমার ভয় করতে লাগলো। ব্যাপারটা বুঝতে আমার সময় লাগেনি—কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে কান্না ভাঙা গলায় বললুম, তুমি কি—

যাও! যাও তুমি। কী রকম বুক ফাটা গলায় যে তিনি 'যাও' শব্দটা উচ্চারণ করলেন তা আমি ভাষা দিয়ে আমি কেমন করে বোঝাবো? দুহাত বাড়িয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠে বললুম, তুমি কি আমার কথা শুনবে না?

না, না, চাই না. চাই না—আমার হাতের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে সবলে মুক্ত করে তিনি আবার ইজিচেয়ারের উপর নিজেকে ছেড়ে দিলেন। আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

সময় যেন ভারি হয়ে চেপে বসলো আমাদের উপর। থমথমে হয়ে উঠলো আমাদের আনন্দিত কক্ষ, সঙ্গীতের পরিবর্তে চারপাশে যেন শোকের প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

আমি নিজেকে সামলে নিলুম। আস্তে গিয়ে কাছে দাঁড়িয়ে বললুম, তুমি কি পাগল হলে?

উনি জবাব দিলেন না। আমি হাতের উপর হাত রেখে বললুম, ওঠো, লক্ষ্মীটি—

এক ঝটকায় আমার হাত ঠেলে দিলেন। অভিমানে আমার গলা বন্ধ হয়ে এলো, রুদ্ধ গলায় জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি—তুমি হলে কী করতে?

আমি? আমি কী করতাম? রেগে উনি উঠে বসলেন—অনেকক্ষণ বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়ে দেখলেন আমাকে, হঠাৎ গলার স্বর নামিয়ে বললেন, জানি না কী করতাম।

আমি বললুম, এ কি আমার দোষ?

জানি না, জানি না, উত্তেজিতভাবে মাথার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে তিনি বললেন, জানতাম, আমি আগেই জানতাম যে এটা হবেই। তুমিও জানতে, কিন্তু তুমি—কথা শেষ করতে পারলেন না তিনি—গলা বুজে গেলো।

আমি শান্ত গলায় বললুম, যে হতভাগ্য ভালোবেসে ব্যর্থ হয় তাকে আঘাত দেবার মতো নিষ্ঠুরতা আমার নেই।

ও, তাহলে সার্থক করবার ইচ্ছেও আছে তোমার?

একটু চুপ করে থেকে ব্যথিত গলায় বললুম, এ কি আমার অপরাধ?

জানি না।

তুমি বুঝতে পারছো না—

চুপ করো, চুপ করো—

কিন্তু—

চুপ! চুপ! অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন তিনি।

আমি নিঃশব্দ হলুম। মনে মনে বুঝলুম, কথা বলা ব্যর্থ। হঠাৎ তিনি উঠে আমার হাত ধরে ঝাঁকানি দিলেন, আর্তস্বরে বললেন, বলো, বলো, লোকটাকে তুমি ঘৃণা করো কিনা--

তিনি তো ঘৃণার পাত্র নন।

নিশ্চয়ই।

হঠাৎ মনের মধ্যে একটা জেদ চেপে গেলো, বললাম, কাউকে ভালোবাসাটা কি ঘৃণ্য? সেটা কি ছোটো কাজ?

সেটার প্রকাশটা ছোটো হতে পারে।

প্রকাশটা তো ভঙ্গির উপরই নির্ভর করে। তিনি আমার সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করেননি।

এও অসৎ নয়? হা ঈশ্বর। কপালে কর হেনে তিনি ধপ করে বিছানায় বসে পড়লেন। তাঁর উজ্জ্বল শ্যাম কপাল ঘেমে উঠলো—তাঁর দেবদুর্লভ হাতদুটি থরথর করে কাঁপতে লাগলো— তাঁর প্রতিভাদীপ্ত সমস্ত মুখ নীল হয়ে গেলো।

আমি জানি তিনি আমাকে বিশ্বাস করেন—সেই মুহূর্তে যদি আমি বলি, হ্যাঁ, আমি তাঁকে ঘৃণা করি—তাহলে আমার স্বামী প্রাণ ফিরে পান—তাঁর দগ্ধ হৃদয়ে শান্তির ধারা নামে, কিন্তু আমি তো মিথ্যে বলতে পারিনে। আমাকে যিনি ভালোবাসেন তাঁকে আমি ঘৃণা করবো—এত বড়ো দম্ভ তো আমার নেই। কিন্তু আমার স্বামীর বেদনাবিদ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে ইচ্ছে করলো মিথ্যে করেই বলি—অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করলুম। যাঁকে ভালোবাসি তাঁকে ভোলাতে পারিনে—মিথ্যা বলে তাঁর কাছে ছোটো হতে পারিনে। তিনি যে আমার কতখানি, তাঁর আসন যে আমার হৃদয়ের কোন গভীর প্রদেশে পেতে রেখেছি তা কি তিনি এত দিনেও বুঝলেন না? দুঃখ হলো। এই কি আমাদের সাত বছরের সম্পর্ক? চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম মাথার কাছে, কেবল বড়ো বড়ো ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো দুচোখ বেয়ে।

ধীরে ধীরে সময় গড়িয়ে চললো। কত যে মর্মন্তুদ সে সময়ের দীর্ঘতা তা কাকে বলবো? রাত্রে পাশাপাশি শুয়ে দুজনেই নির্ঘুম চোখে ছটফট করতে লাগলুম। এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, স্বামীর করস্পর্শে জেগে

উঠলুম। চোখ বুজেই অনুভব করলুম, আমার স্বামী ঝুঁকে পড়েছেন আমার মুখের উপর, শুনতে পেলুম অত্যন্ত মৃদু গলায় গানের মতো গুনগুন করছেন, আমার রাধা, আমার সোনা, তুমি আমার, তুমি আমার—আমি দুহাত বাড়িয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলুম। তিনি আমার জেগে ওঠা টের পেয়ে চমকে উঠেছিলেন—সামলে নিয়ে বললেন, কাঁদো কেন? তুমি ঠিক বলেছো। তোমার মতো মেয়ের যোগ্য কথাই বলেছো তুমি। আমিও বুঝেছিলুম কবি তোমাকে ভালোবাসেন—কিন্তু বুঝতে পারিনি তোমার অবচেতন মন কবির সেই ভালোবাসাকে সাগ্রহেই গ্রহণ করেছে—

উঠে বসে বললুম, পণ্ডিত, ভালোবাসার কি কেবল একটাই ক্ষেত্র? কবিকে যে আমি ভালোবাসি আর তোমাকে যে আমি ভালোবাসি, দুটোর কি একই রূপ?

না, এক হবে কেন? কিন্তু কালক্রমে আমরা দু'জনে তোমার মনের এক জায়গায় এসেই পাশাপাশি দাঁড়াবো।

ছি!

ছি কেন, রাধা, তা কি হতে পারে না? তোমার হৃদয়ের গভীরতা সাধারণের অতীত, সেখানে অনায়াসেই তুমি দু'জনকে জায়গা দিতে পারো। আজ ভাবছো অসম্ভব, কিন্তু তুমি নিজেও জানো না কবে কখন একদিন দু'জনকেই তুমি একই ভাবে ভালোবাসতে শুরু করবে।

না, না,—আমি ব্যাকুল হয়ে উঠে তাঁর মুখে হাত চাপা দিলুম, এই কি আমার এতদিনের পরিচয় তোমার কাছে? আমার এতো ভালোবাসার মূল্যে কি তুমি এ ভাবেই শোধ দিলে?

শোধ দেবো? তোমার ভালোবাসার? বাবা—আমার স্বামীর গলা বুজে এলো, ভাঙা গলায় বললেন, তোমার শোধ কি কোনোদিন কোনো পুরুষ দিতে পারে? তুমি আমায় ভরে রেখেছো—তোমার স্নেহ, দয়া, প্রেম, সহচর্য—সর্বোপরি তোমার সহযোগিতা—সে কি শোধ দেবার জিনিস? কিন্তু ভেবে দেখলাম, এত ভালোবাসা এক আধারে আবদ্ধ থাকতে পারে না।

চুপ করো, চুপ করো—কান্নায় আমার গলা ভেঙে এলো শান্ত হও। তুমি কি পাগল হলে? আমার পাগলা শিব—আমি স্নেহভরে তাঁকে কাছে টেনে নিলুম। আমার বুকের মধ্যে মাথা রেখে তিনি যেন খানিকটা শান্তি লাভ করলেন।

এর পরে দু'তিন দিন কেমন একটা অশান্তিতে সময় কাটতে লাগলো। দু'জনেই দু'জনের কাছে যেন অপরাধী হয়ে আছি। তারপর আস্তে আস্তে সে ভাব কাটিয়ে উঠলাম আমরা, আবার আমার স্বামী সহজ হলেন, আবার আমাদের সেই অপরিসর গানের ঘর আনন্দগুঞ্জনে ভরে উঠলো। সবাই আসেন, আসেন না কেবল কবি। আমার মনের মধ্যে কেমন একটা অভাববোধ হলো। আমার স্বামী সেই অভাববোধের কেমন ব্যাখ্যা করবেন, তা আমি জানতুম, তবু তাঁর কাছে লুকোতে পারলুম না সে কথা।

আমার ইচ্ছে শুনে স্বামী সহজভাবেই বললেন, আচ্ছা, ওঁকে আসতে

বলবো একদিন। শুনছি ওঁর উপাখ্যানটা নাকি খুব ভালো হয়েছে।

পরের দিনই তিনি তাঁকে ধরে নিয়ে এলেন। একেবারে উপাখ্যান সমেত। আমাকে বললেন, এসো এসো, বেশিক্ষণ ভদ্রলোককে আর বিরহ পাথারে ফেলে রেখো না।

আমি হেসে বললুম, ভারি যে ফাজিল হয়েছো।

হবো না? যা একখানা উপন্যাস করেছো তুমি!

আমি হাতে চিমটি কাটলুম—উনি মুখ বাড়িয়ে নিতান্ত যুবকের মতো একটি কর্ম করে পালিয়ে গেলেন।

আমি যখন ওঘরে গেলুম আমার স্বামী সেই উপাখ্যানের সংকেত দেখে দেখে সুর বাজাচ্ছেন আর কবি সঙ্গে সঙ্গে মৃদুগুঞ্জনে গেয়ে যাচ্ছেন সেই সুর। অলক্ষ্য হাওয়ার মতো ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে সেই সুরের স্পর্শ। আমি নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম—এক সময় চোখ তুলে আমার স্বামী আমাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। কবি নতদৃষ্টিতে ছিলেন—আমার অস্তিত্ব অনুভব করে তিনি আরো নত হলেন।

একটি বিশেষ রাগিণীকে ঘিরেই দেখলুম এই কাব্যের সৃষ্টি। প্রথম সর্গে আছে রাগিণীর বন্দনা, তারপর অনুরাগ, তারপর হতাশা, তারপরে অনন্তকাল প্রতীক্ষার সংকল্প।

গানের মৃদু গুঞ্জন ক্রমেই দরাজ হতে লাগলো। আমার স্বামী অচেতনের মতো বাজিয়ে চললেন, সুরেব ঢেউয়ে তাঁর আঙুলের লীলা অপরূপ হলো—কবি দুই চোখ বুজে বিশ্বসংসার হারিয়ে ফেললেন, আকাশে বাতাসে তাঁর সুবের দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে গেলো। কেবল আমি সচেতন হয়ে বসে বসে তাঁর অনুরাগে হতাশায় আর ব্যর্থতায় কেবল আমাবই ছবি দেখতে লাগলাম। আস্তে আস্তে গানের রেশ একেবারে উঁচু পর্দায় উঠলো—সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হলো যন্ত্র আর কণ্ঠ যেন একসঙ্গেই কেঁদে উঠলো—আর তাদের সেই মর্মভেদী কান্নায় সমস্ত পৃথিবী যেন একটা দীর্ঘ হাহাকারে ভরে উঠলো। হঠাৎ আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, থামাও, থামাও। মুহূর্তে দুটি মানুষ নিস্তব্ধ হয়ে থেমে গেলো।

জানি না গানের আত্মা আছে কিনা—কিন্তু সমস্ত শরীর আমার কেমন ছমছম করতে লাগলো সেই স্তব্ধ ঘবে—মনে হলো অসম্পূর্ণ সুরের অতৃপ্ত আত্মারা যেন অশরীরী হয়ে ঘরময় ঘুরে ঘুরে আমাকে শাপ দিচ্ছে, তাদের দীর্ঘশ্বাসে আমার প্রতি রোমকূপে বিদ্যুতের স্পর্শ অনুভব কবলুম—আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে ক্ষণিকের জন্য আত্মবিস্মৃত হলুম আমি, আমার পতনোন্মুখ দেহটিকে ধরে ফেললেন কবি, কম্পিত গলায় বললেন, পণ্ডিত, এ কী হলো?

আমার স্বামী তখনো অভিভূত ছিলেন, চমকে উঠে আমাকে এসে জড়িয়ে ধবে কবির কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন, তাই তো, কী হলো?

আমি ফিসফিসিয়ে বলে উঠলুম, আমার ভয় করছে. আমাকে নিয়ে যাও, নিয়ে যাও এখান থেকে।

ওঁরা আমাকে ঘরে এনে শুইয়ে দিলেন—মাথায় জল ঢাললেন—এক সময় হঠাৎ আমার চেতনা ফিরে এলো। সচেতন হয়ে আমি উঠে বসলুম—লজ্জিত হয়ে বললুম, হঠাৎ যে কী হলো।

আমার স্বামী আমার কাছেই বসে ছিলেন, নিঃশব্দে আমাকে স্পর্শ করলেন, আর সেই স্পর্শে সহসা আমার শরীরে যেন একটি সুগভীর শান্তি ব্যাপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়লো। মৃদুকণ্ঠে কবি বললেন, আমি এবার যাই।

কাল সকালেই একবার আসবেন, একান্ত অনুরোধের ভঙ্গিতে আমার স্বামী কবির হাত চেপে ধরলেন। সম্মতি জানিয়ে মুখ ফিরিয়ে তিনি একবার আমার দিকে তাকালেন, তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন।

শরীর দুর্বল ছিলো, তাড়াতাড়িই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম সে রাত্রে—কাজেই পরের দিন অতি প্রত্যুষেই আমার ঘুম ভাঙলো, তখনো আলো ফোটেনি ভালো করে। আবছা আবছা অন্ধকারে আমি আমার পাশে শায়িত স্বামীর দিকে বাহু বাড়ালুম—অনুভব করলুম সে স্থানটি শূন্য। বুকটা ধড়াস করে উঠলো। উঠে বসে ভালো করে চারদিক তাকিয়ে দেখলুম। তারপর আস্তে আস্তে নামলুম বিছানা থেকে। প্রথমেই উঁকি দিলুম গানের ঘরে, সেখানে নেই। বাথরুমের দরজাটি হাঁ করে খোলা। তবে? তবে তিনি কোথায় গেলেন? গলা বুক যেন বন্ধ হয়ে এলো আমার। তুমি কই? তুমি কই? সমস্ত ঘরময় ঘুরে ঘুরে তাঁকে ডাকতে লাগলুম—কোথাও তিনি নেই। চারদিক ভোরের আলোয় ভরে উঠলো। সূর্যের আভা ছড়িয়ে পড়লো ঘরের মধ্যে। আস্তে আস্তে সে আভা সাদা হলো, তীব্র হলো—আর আমি সেই আলোয় হঠাৎ আমার বালিসের পাশে একটি ভাঁজকরা কাগজ লক্ষ্য করে হাতে তুলে নিলুম।

এ হাতের লেখা আমার ভুল করবার কথা নয়। আমাদের বিবাহিত জীবনে কখনো আমরা বিচ্ছিন্ন হইনি, তাই আমাকে আমার স্বামীর এই প্রথম পত্র—এবং এই শেষ।

রাধা,

তোমাকে আমি মুক্তি দিলুম। আমার ভালোবাসার এর চেয়ে চরম প্রমাণ আর কী থাকতে পারে? প্রার্থনা করি, তুমি বড়ো হও।

হতভাগ্য পণ্ডিত।

চিঠিখানা পড়া শেষ হয়ে গেলো, আস্তে আস্তে অক্ষরগুলো মুছে এলো আমার চোখ থেকে। আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছু কি ভেবেছিলাম, না কি মনটা শূন্যে পরিভ্রমণ করছিলো? জানি না। আমাদের ছোটো বাড়ির তিনটি মাত্র ঘরে আমি সহস্রবার প্রদক্ষিণ করতে শুরু করলাম। আমার চেতনা ছিলো না, কী চাই, কী খুঁজে বেড়াই, তাও আমি ভালো করে বুঝে উঠতে পারছিলাম না। পরিশ্রমে আমার কপালে ঘাম দেখা দিলো—বুকের ওঠা পড়া দ্রুত হয়ে উঠলো, কাঁধ থেকে আঁচল স্খলিত হলো—তবু আমি কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে উন্মাদের মতো ছুটে বেড়াতে লাগলাম। এক সময়ে বসবার ঘরে এসে আমার পা থামলো। হঠাৎ যেন লুপ্ত চৈতন্য ফিরে

এলো আমার। তাকিয়ে দেখলাম, নতমুখে কবি দাঁড়িয়ে আছেন চুপ করে। আমাকে দেখে সভয়ে দুপা সবে গেলেন, আর আমি স্থির হয়ে দাঁড়ালাম। এবার আস্তে আস্তে আমার বুক ঠেলে যেন একটা কান্নার ঢেউ গলা পর্যন্ত উঠে এলো—কিন্তু বন্যা নামলো না চোখে। একটা অসহ্য দুঃখের গুরু ভারে আচ্ছন্ন হয়ে আমি মুখ তুললুম—কম্পিত হাতে চিঠিটি এগিয়ে দিলুম কবির হাতে। নিমেষে চিঠি পড়া শেষ করলেন তিনি। ব্যথায় বিস্ময়ে মুহূর্তে তাঁর মুখের চেহারা বদলে গেলো। অনেকক্ষণ আমার দিকে নিষ্পলকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর একটা ভারি নিশ্বাস নিয়ে উচ্চারণ করলেন, এত বড়ো দুঃখ দিলাম! তাঁর মাথা নিচু হলো। উদ্গত অশ্রুকে কোনোরকমে বাধা মানিয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় আবার বললেন, এ দুঃখ আমারই রচনা। কিন্তু তোমাকে তো আমি কোনো দুঃখই দিতে পারি না। আমি যাবো, আমি ফিরিয়ে নিয়ে আসবো তাকে শুধু তুমি তুমি এখানে অপেক্ষা কোরো।

আমি নিঃস্পন্দ হয়ে রইলাম। এক সময়ে অনুভব করলাম, কবি চলে গেছেন। তারপর থেকে এই দীর্ঘ পঁচিশ বছর আমি প্রতীক্ষা করে আছি। একদিন এক পলকের জন্যও এ বাড়ি ছেড়ে আমি কোথাও যাইনি। সমাজ সংসার থেকে নিজেকে আমি সম্পূর্ণ নির্বাসিত করেছিলাম। আমার কেউ ছিলো না, সমস্ত সঙ্গীরা আমাকে আস্তে আস্তে ভুলে গিয়েছিলো। তারপর আমার ক্ষুধিত তৃষিত আত্মা একদিন পরিত্যাগ করলো আমার এই অবহেলিত জীর্ণ দেহ। অতি মলিন একটি শয্যার উপর ঠিক ঐখানটিতে আমার আত্মহীন অসার দেহটি অনেকদিন পড়ে রইলো—কেউ দেখলো না, কেউ জানলো না—মৃত্যুর যন্ত্রণায় যখন উদ্বেল হয়ে ছটফট করলুম—কেউ এক ফোঁটা জল দিলো না মুখে। কিন্তু তবু আমি আছি, আমার এই বঞ্চিত ব্যথিত আত্মা নিয়ে তবু আমি পড়ে আছি এই গৃহে। ওগো পৃথিবীর সুখী মানুষ, আমার এই প্রতীক্ষা—আমার মিলনের আকাঙ্ক্ষা কেড়ে নিয়ো না, কেড়ে নিয়ো না এই নিরালা নির্জন অবকাশটুকু। আমাকে থাকতে দাও, থাকতে দাও,—দয়া করো, দয়া করো আমাকে—

বলতে বলতে মেয়েটি সবেগে উঠে এলো কাছে, এক মাথা চুল নিয়ে নিচু হয়ে ব্যাকুল হাতে জড়িয়ে ধরলো আমার পা—তার সেই হিম শীতল স্পর্শে আমি চমকে উঠে বসলুম। তাকিয়ে দেখলুম, পায়ের কাছে টিপয়ের উপর রাখা জলের গ্লাসটি উল্টে পড়ে আমার পা জলে ভিজে গেছে। এ কি তার চোখের জল? জানলায় তাকিয়ে দেখলুম, আকাশ রঙিন হয়ে আসছে সূর্যোদয়ের আভাসে। তবে? তবে এতক্ষণ ধরে আমি এ কী শুনলুম? এ কী দেখলুম? আমি কি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলুম তবে? আমি মাটিতে পা ছোঁয়ালাম, আবছা আবছা ভোরের আলোয় কোথাও তাকে দেখতে পেলুম না। কোথায় গেলো? কোথায় সে? হঠাৎ বুকের মধ্যে একটা বিচ্ছেদের কষ্ট অনুভব করলুম। মনে হলো, আমার কতকালের প্রিয়তম সঙ্গীটি

কোথায় হারিয়ে গেলো। আমি অস্থির হয়ে ঘরে ঘরে তাকে খুঁজে বেড়াতে লাগলাম।

ভোর হয়ে গেলো, লিচু গাছের মাথায় সূর্য চিকচিক করতে লাগলো। পৃথিবী ভরে গেলো সাদা আলোয়। চুপ করে সেই ঘরে সেইখানটিতে বসলাম, খানিক আগেও যে সে এখানেই ছিলো বারে বারে সে কথা মনে করে অস্থির হয়ে উঠলাম, তারপর এক সময় আমার সেই অতি আকাঙ্ক্ষিত সংসারকে পিছনে ফেলে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। প্রথমেই পোস্টাপিসে এসে মাকে আসতে বারণ করে তার করলুম, তারপর খুঁজে খুঁজে একটি মেসে এসে আস্তানা ঠিক করলুম। মনের মধ্যে কেবল একটি প্রার্থনাই ভরে রইলো—সে সুখী হোক—তার এই নির্জন প্রতীক্ষা সফল হোক—তার ব্যথিত বিরহী আত্মা যেন একদিন শান্তি পায়, আর সেই শান্তিতে আমি যেন কখনো ব্যাঘাত না হই।

উৎস

সুখেন একদিন রাত আটটায় বাড়ি ফিরে মাকে জানালো সে বিয়ে করবে। তবে সেটা মায়ের পছন্দমতো নয় নিজের ইচ্ছেমতো।

বিধবা মা নিভাননী দেখলে ভালো। চোখ দুটো বড়ো বড়ো, রং উজ্জ্বল শ্যাম, নাক একটু ভোঁতা। কিন্তু ভোঁতা বলেই লাবণ্য বেশী। ছেলের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, নিজের পছন্দমতো? কাকে?

সে আমি পরে বলবো। বলে সুখেন হুড়মুর করে খেতে বসলো।

সুখেনের বয়স চৌত্রিশ। বলতে গেলে সারাদিন পাড়ায় মোড়লি করে বেড়ানোই তার প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য। গায়ে প্রচণ্ড শক্তি, মেজাজ কড়া, চুল কর্কশ। যখন অল্প বয়েস ছিলো নিভাননী অনেক যত্নে নিজের হাজার অভাব অভিযোগের মধ্যেও ছেলেকে ভালো স্কুলে পড়িয়েছেন, ভাল জামা-কাপড় কিনে দিয়েছেন, ভাল শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেছেন।

অকালে স্বামী মারা গিয়ে স্বভাবতই তিনি অক্ষম এবং অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। ভেবেছিলেন ছেলে মানুষ হলে, বড়ো হয়ে উঠলে সব আবার তাঁর ফিরে আসবে। কিন্তু তা হলো না। হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা পর্যন্ত সুখেন সুবোধ বালকই ছিলো। কলেজের মাটিতে পা দিয়েই পড়াশুনো ছেড়ে মস্তান হয়ে উঠলো। প্রথমে পড়েছিলো দাদাদের পাল্লায়, পরে পড়লো বদেদের পাল্লায়। অবশ্য বদেদের সঙ্গে যে দাদাদের বেশি তফাৎ আছে তা নয়। তবুও মন্দের ভাল এই হলো যে মদই খাক আর হল্লাই করুক, রাজনীতির খুন-খারাবির দিক থেকে ফিরে এলো সে। তারপর থেকে এ পর্যন্ত একভাবেই কাটছে। একটা চাকরি পেয়েছে, সরকারী বাসের আপিসে দুশো টাকা মতো মাইনে পায়, কায়ক্লেশে প্রায় অর্দ্ধাশনে কেটে যায় দিন। থাকে একটা টিনের ঘরে, মা রাঁধেন বাড়েন আর ভাবেন কোনো একদিন যে ভদ্রলোক ছিলাম সে কথা আমাকে চিরতরে ভুলিয়ে দিলো ছেলে। চোখের জল তাঁর শুকোয় না।

তবে একদিক থেকে ছেলেকে তিনি ভালোই দেখেন, চাকরিতে কোনো গাফিলতি নেই। চরিত্রও খারাপ নয়। মেয়েদের বিষয়ে কুনজর আছে বলে মনে হয় না। কুনজর কে দিচ্ছে না দিচ্ছে তাই নিয়েই তার মাথা ব্যথা। তক্ষুনি সত্যি মিথ্যা না জেনে তাকে ঠ্যাঙাবে। শরীরের শক্তিতে, চেলাচামুণ্ডার উস্কানিতে সব সময় কেবল মাস্‌ল ফুলোচ্ছে। আবার হঠাৎ কাকে পছন্দ হলো কে জানে?

নিভাননী যখন এইসব ভেবে আকাশ পাতাল করছিলেন তখন সুখেন খেয়ে দেয়ে উঠে তার সাড়ে ন'টায় রাস্তার মোড়ে গিয়ে টিমটিমে এক লাইট পোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে থাকলো। সে জানে ডিউটি সেরে এই পথেই এখন সাধন সরকারের মেয়ে পারুল ঘরে ফিরবে। বছর খানেক হলো ওরা এ পাড়ায় এসেছে। সেই থেকে সুখেন দেখছে মেয়েটিকে। রং শ্যামলা, মুখে দুঃখ এবং সারা চেহারায় সন্ত্রস্তভাব। শুনেছে বাপ এক লম্পটের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলো, ছ'মাসের মধ্যে পেটে একটি বাচ্চা নিয়ে বিতাড়িত হয়েছে সেখান থেকে। তারপর নার্সিং-এ ট্রেনিং নিয়ে এই কাজ করছে। বাচ্চাটি এখন পাঁচ বছরের। নিজেদের খরচ পারুল এখন নিজেই দিতে পারে। অন্য পাড়া ছেড়ে এ পাড়ায় আসার কারণ হিসাবে সুখেন শুনেছিলো বেয়াদব ছোঁড়ারা অসম্ভব জ্বালাতো। এটা সে স্বীকার করে পারুলের মুখে একটা ভীষণ আকর্ষণ আছে। চোখ তুলে তাকালে, সে মনে মনে বলে, শালা বুকটা যেন কেমন কেমন করে, একেবারে চেপে ধরে চুমু খেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তাই বলে মেয়েটাকে জ্বালাবে? হঠাৎ রেগে অধীর হয়ে একদিন গিয়েছিলো কিছু শিক্ষা দিয়ে আসতে। কিন্তু শিক্ষা নিজেই পেয়ে ফিরে এসেছে। তারা তাদের মতো হিতকারী রবিন হুডের দল নয়, রীতিমতো রাজনীতির পোষা গুণ্ডা, তাদের বড়দাদার আদেশে তারা রাতদিন খুন করে বেড়াচ্ছে। হাতে আগ্নেয়াস্ত্রের অভাব নেই। পাইপগান নিয়ে এমন তাড়া করেছিল যে পালাতে পথ পায়নি।

একবছর ধরেই পারুলকে লক্ষ্য করছে সে। চমৎকার মেয়ে কোনোদিকে তাকায় না, কারো সঙ্গে কথা বলে না। আপন মনে ডিউটিতে যায় আর ফিরে আসে। মনটা সে বেশ কিছুদিন যাবৎই প্রস্তুত করেছে। আজ মোকাবিলা করতে উদ্যত হলো।

পারুল তার হাফ নার্সের সাদা পোশাক পরে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছিলো। সুখেন পথ জুড়ে দাঁড়ালো।—শুনুন—

এ্যাঁ—পারুল থমকে থেমে প্রায় কেঁপে উঠলো।

হাসি বিস্তার করে সুখেন বললো, ভয় পাচ্ছেন কেন? আমি বাঘও নই ভাল্লুকও নই, যদি কিছু হই তো সিংহ বলে ধরে নিতে পারেন। বুঝলেন?

পারুল কথা বললো না।

সুখেন বেশ ভদ্র পোশাকেই এসেছিলো। বলা যায় সেজেগুজে। মায়ের চেহারার আদল পেয়েছে, ভালো দেখাচ্ছিলো। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নরম গলা করলো, আমি শুনেছি কোনো এক নার্সিং হোমে আপনি চাকরি করেন। ঠিক?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আপনার স্বামী একটি আস্ত বাঁদর ছিলো।

পারুল চুপ।

সে বাঁদরটা কোথায়?

জানি না।

বলুন না ঠিকানাটা, একবার দেখে আসি তাকে।

দরকার আছে কিছু ?

আছে না ? নিশ্চয়ই আছে।

অনুগ্রহ করে পথ ছাড়ুন, আমি বাড়ি যাই।

আমার কথা আছে।

আমার মা বাবা দেবি দেখলে ভাববেন। তাছাড়া বাড়িতে একটি ছোটো মেয়ে আছে আমার।

আমি জানি, সব জানি—স্নেহে নিজেকে বিগলিত করলো সুখেন—সব জেনে শুনেই আজ এখানে একটা কথা বলতে দাঁড়িয়েছি।

যা বলার তা তো বললেন।

কি বললাম ?

ঐ ঠিকানা আমি জানি না।

সেটা আমার কথা নয়।

তবে ?

আমার কথাটা হচ্ছে গিয়ে মানে, অর্থাৎ—

তাড়াতাড়ি বলুন।

শোনো পারুল, পারুলের চোখে চোখে তাকাবার চেষ্টা করলো সুখেন, আমি তোমাকে খুব পছন্দ করি।

কথা শুনে পারুল ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো, রাত দুপুরে ঐ কথা জানাতে আপনি পথে এসে দাঁড়িয়েছেন ? এই একবছরে আর তো আপনি আমার সঙ্গে এমন অশোভন আচরণ করেননি। আমি মনে মনে আপনাকে ধন্যবাদ দিয়েছি। আমি শুনেছি এ পথে যে আমি এতো নিরাপদে চলাফেরা করতে পারি তার কারণই আপনার দয়া। আজ আপনি—পারুলের চোখ ভয়ে হরিণ শাবকের মতো হয়ে গেলো।

সুখেন চুপ করে থেকে আস্তে বললো, আচ্ছা, তুমি বাড়ি যাও।

এরপরে একদিন সুখেন আপিসের পরে হঠাৎ সাধন সরকারের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলো। সাধন সরকার তখনো ফেরেননি কাজ থেকে সাধন সরকারের স্ত্রী এসে আধো ঘোমটা দিয়ে দরজা খুলে দাঁড়ালেন। সুখেনকে দেখে চমকে গেলেন একটু। তারপরেই মুখে মিষ্টি হাসি টেনে বললেন, কী বাবা ? উনি তো বাড়ি নেই। দরকার আছে কিছু ?

চমকানিটা সুখেনের চোখ এড়ালো না। ভিতরে কোথায় একটা কষ্ট মোচড় দিয়ে উঠলো। বললো, আপনি তো আমাকে চেনেন মাসীমা ?

কেন চিনবো না ? দরজা আগলে ভদ্রমহিলা তোয়াজ করলেন, আমরা তো বাবা তোমার কথা কত বলি। সেদিন তোমার মার সঙ্গেও আলাপ হলো।

ও। একটু থেমে সুখেন ইতস্তত করে বললো, আপনার নাতনী কোথায় ?

আমার নাতনী ? কার কথা বলছো ?

আপনার বুঝি অনেক নাতি নাতনী ?

তা মন্দ নয়। তবে সব তো কাছে নেই—

পারুলের মেয়ের কথা বলছি আমি।

পারুল! ও। পারুলকে চেনো তুমি?

চিনবো না কেন? পাড়ার মেয়ে—নিজের লোক বৈকি।

তা তো বটেই। কেন বাবা মনটুলির খোঁজ করছো? কোনো দুষ্টুমি করে এসেছে কি কোথাও?

না না, দুষ্টুমি কেন করবে? অমন সুন্দর মেয়ে। রাস্তায় কতো খেলা করতে দেখি। ওর জন্য কিছু টফি আর বিস্কুট এনেছি। হাতে দিয়ে যাই।

আবার এসব কী জন্য?

মার সঙ্গে সেদিন আপনার আলাপ হলো না? মাই পাঠিয়ে দিলেন।

একথা সত্য নয়। কিন্তু বলতে বাধ্য হলো সুখেন। সে বুঝতে পারছিলো বাড়ি বয়ে এসে এই ঘনিষ্ঠতা পছন্দ করছেন না মহিলা।

ও, মা পাঠিয়ে দিয়েছেন? এবার ভদ্রমহিলা আশ্বস্ত, দ্যাখ কী কাণ্ড। মেয়েটাও তো তেমনি, তোমার মায়ের সঙ্গে দিদা দিদা কী ভাব সেদিন। ও মনটুলি, মনটুলি—

কোথা থেকে ছুটে এলো মনটুলি। মেয়েটা মিষ্টি। হাত বাড়িয়ে সুখেন ধরে ফেললো তাকে। ওর মায়ের মত মুখে চুমু খেয়ে বললো, এই নাও।

দিতে দেরি আছে তো নিতে দেরি নেই। দেখা গেলো মনটুলি এসব বিষয়ে লজ্জার ধার ধারে না।

আবার আসবো, কেমন?

মনটুলি খুশি ভরা চোখে বললো, আবার আমার জন্য এনো, এ্যাঁ—

দিদিমা ধমক দিলেন, এক খাওয়া খাচ্ছে আবার অন্য খাবার লোভ। ভারি ইয়ে—

না না তাতে কী। আমি আবার নিশ্চয়ই আনবো। আচ্ছা চলি সুখেন বিদায় নিলো।

দিন কয়েক বাদে আবার কিন্তু সুখেন দাঁড়ালো সেই লাইট পোস্টের তলায়। এবং অবধারিতভাবে দেখা গেলো পারুল তেমনি এগিয়ে আসছে সেই পথে। আবার সে পথ আগলালো, ঠিক আগের দিনের মত সুরেই বললো, শুনুন।

আজ কিন্তু পারুল থমকে দাঁড়ালো না, ঘুরে দাঁড়ালো। এবং বেশ উগ্রভাবেই বললো, আপনার কী মতলব বলুন তো?

সুখেনের সঙ্গে একটা মেয়ে এইভাবে কথা বলবে আর সুখেন তা সহ্য করবে এমন পাত্রই সে নয়। গায়ের রক্ত প্রায় ঝলসে উঠেছিলো। কিন্তু সামলে নিয়ে বললো, মতলবের কথা উঠছে কিসে?

কেন রোজ পথ আগলে দাঁড়ানো? কেন বাড়ি গিয়ে আমার মেয়েকে আজে-বাজে খাবার কিনে দিয়ে আসেন? আমরা গরীব হতে পারি, ছোটোলোক নই। পারুল হাঁপাচ্ছিলো।

সুখেন ঝাঁঝালো গলায় বললো, আমিও ছোটোলোক নই। হলে নিশ্চয়ই

আমার মুখের উপর এত কথা বলবার সাহস হতো না তোমার।

আমাকে নাম ধরে বলেন কেন? তুমি বলেন কেন? আপনার একটা ভদ্রতাবোধ নেই? আমি কি ছেলেমানুষ?

ছেলেমানুষ না হতে পারো, আমার চেয়ে অবশ্যই অনেক ছোটো। তাছাড়া মনে মনে যাকে সারাদিন নাম ধরে ডাকি, তুমি বলি, তাকে হঠাৎ ওরকম আপনি আজ্ঞে বলতেই বা যাবো কেন? কিন্তু যাক গে সে কথা, আসল কথা হচ্ছে আমার একটা প্রস্তাব আছে তোমায় কাছে।

প্রস্তাব! ভয়ে পারুল সিঁটিয়ে গিয়ে দুপা হটলো। এই জাতীয় লোকেদের প্রস্তাব যে কী তা কি পারুল জানে না? তার সব সাহস মুহূর্তে উবে গেলো। সে প্রায় দৌড়ের মতো করে পা চালালো বাড়ির দিকে।

না। সুখেনের জলদগম্ভীর গলা পিঠের উপর চাবুক মারলো। তারপরেই সে টের পেলো সুখেন সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে হাত ধরেছে। ধরেছে অবশ্য নরম করে। সে হাত উষ্ণ। বললো, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

দাঁতে দাঁত আটকে গেলো পারুলের। সে বুঝলো সাহস দেখাতে গিয়ে আজ সে সত্যি গুণ্ডা লোকটার ফাঁদে পড়ে গেছে। তার মতো ভীতু নিপীড়িত মেয়ের মধ্যে কেমন করে যে এই লোকটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এত কথা শুনিয়ে দেবার শক্তি সঞ্চিত হয়েছিলো কে জানে। হাতটা ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে কেঁদে ফেলে বললো, দয়া করুন, দয়া করুন। আমাকে ক্ষমা করুন। আমি পায়ে পড়ছি আপনার।

আমি তোমাকে পায়ে চাই না পারুল, আমি তোমাকে আমার জীবনের—

সুখেনের গলা ভিজে উঠছিলো, আর পারুল কুৎসিত কথা শোনার ভয়ে কানে হাত দিয়ে আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠে বললো, নিজেকে ছোটো করবেন না, আমি আপনাকে বিশ্বাস করি, শ্রদ্ধা করি। আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি। আমার এই নার্সের জীবনকে সকলেই ঘৃণা করে। সব পুরুষই আমাকে সহজলভ্য মনে করে। আমি—আমি—

আলোর তলায় তাকে প্রথম দিনের মতো বাঘের ভয়ে ভীত হরিণের চেহারাতেই দেখা যাচ্ছিলো। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চকিত হয়ে সুখেন বললো, কী বললে?

সত্যি বলছি, আপনাকে আমি বিশ্বাস করি, শ্রদ্ধা করি, আমি মনে করি—

আমাকে তুমি শ্রদ্ধা করো?

আমি জানি আমি আপনার জন্যই এখানে এমন নিরাপদে সসম্মানে চলাফেরা করে শান্তিতে আছি। আমার মতো একজন দুঃখী আর অসহায় মেয়ের পক্ষে এর চেয়ে বেশী আর কী হতে পারে? পায়ে পড়ি আপনি আমাকে ছেড়ে দিন। আমাকে দুর্নামের ভাগী করবেন না।

তুমি আমাকে শ্রদ্ধা করো? সুখেনের মুখ থেকে কথাটা যেন স্খলিত হলো। অন্যমনস্কভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর কোনো কথা না বলে পিছন ফিরে ধীরে ধীরে পা চালালো উল্টো দিকে। আর পারুল দিক্‌বিদিক্‌ হারা হয়ে ছুটতে লাগলো।

সেদিন বাড়ি এসে সুখেন আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো তাড়াতাড়ি। তার একক শয্যা যেন কিছুদিন যাবৎ কল্পনায় যুগল শয্যা হয়ে উঠেছিলো। সে তার স্ত্রীকে, তার পারুলকে পার্শ্বচারিণী করে অনেক বিনিদ্র সুখের রজনী যাপন করছিলো কদিন থেকে। শুধু তাই নয়, পারুলকে ভালবেসে সে মনটুলিকেও ভালবাসছিলো। মনটুলির বাবা হয়ে যেতে তার একবিন্দু দ্বিধা হয়নি। মনটুলি যে আর কারো ঔরসজাত সন্তান এ নিয়ে তার মনে একটুও অসন্তোষ ছিলো না। ও যে পারুলের মেয়ে এর চেয়ে আর বড়ো কথা কী আছে। সুতরাং সেই বিছানায় মিষ্টি চেহারার মনটুলিকেও সে নিয়ে আসতো মাঝে মাঝে। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েকেও কম আদর করতো না।

সেই শয্যা আজ তার শূন্য বোধ হোলো। তার স্বেচ্ছাচারী জীবনটা হঠাৎ একটা ফুটো বেলুনের মতো চুপসে যেতে যেতে একেবারে অস্তিত্বহীনতায় পেঁছে গেলো। আর তারই মধ্যে এক পবিত্র শোক ঘিরে ধরলো তাকে। তার অভিধানে শ্রদ্ধা শব্দের কোন অর্থই ছিলো না। সেও যেমন কারোকে শ্রদ্ধা করতো না, জানতো তাকেও কেউ শ্রদ্ধা করে না! কারো শ্রদ্ধা পাবার জন্য যে তার জন্ম হয়নি এটা চন্দ্র, সূর্য, আগুন, জলের মতোই একটা জ্বলন্ত সত্য ছিলো তার কাছে। আজ হঠাৎ একজন মানুষের মুখে তার স্বীকৃতিতে এই শব্দটি এমন নতুন সুরে বেজে উঠলো হৃদয়ে যে এতোদিনের সঞ্চিত সমস্ত হতাশা দারিদ্র এবং মন্দ কাজের উন্মাদনাকেও ছাপিয়ে গেলো সেই তীব্র অনুভূতি।

আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি।

আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি।

আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি।

রেলের চাকার ইচ্ছাসুখ বানানো শব্দের মতো এই চারটি উচ্চারণ—তাকে অন্য এক জগতে নিয়ে পেঁছে দিলো। সে বুঝতে পারলো, পারুলকে ছাড়ার দুঃখও তার সইবে কিন্তু পারুলের শ্রদ্ধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার বেদনা সে কোনোকিছুর বিনিময়েই হস্তান্তরিত করতে পারবে না। জ্ঞানত এতোবড়ো সম্পদ আর কে তার হাতে এনে দিয়েছে এমন করে? পুরুষোচিত ধরনে নিঃশব্দে কান্না চাপতে চাপতে শেষে কখন যেন সে ঘুমিয়ে পড়লো।

এর ঠিক পাঁচদিন বাদে পারুল বাড়ি ফিরে এসে খবর পেলো সুখেনরা এখানে নেই। খেতে বসে বাবাই সংবাদটা দিলেন, গুণ্ডাটা পাড়া ছেড়েছে।

কে? চকিতে ফিরে তাকালো পারুল।

ঐ সুখেন দত্ত। দেখলাম ঠ্যালায় করে জিনিস যাচ্ছে—সব। ওর মায়ের মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিলাম, ভদ্রতা করে কথা বলতেই হলো। জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপারটা কী? যাচ্ছেন কোথায়? হাত উল্টে মহিলা রেগে বললেন, ছেলের খেয়াল, তিনি কলকাতা ছাড়ছেন।

কলকাতা ছাড়ছেন? ভাত থেকে হাত থামলো পারুলের।

কোথায় যেন কাছে পিঠে নিজেদের পৈতৃক বাড়ি আছে, সেখানেই নাকি

থাকবে এখন। ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করবে। যাক বাবা, শহর থেকে একটা উৎপাত কমলো। সাধন সরকার ঢেঁকুর তুললেন।

আচমকা খাওয়া ছেড়ে অশোভনভাবে উঠে পড়লো পারুল। বারান্দায় গিয়ে বালতিতে রাখা জলে আঁচিয়ে চলে গেলো নিজের ঘরে।

ছোট্ট ঘর। ট্রাঙ্ক বাক্সে ঠাসা, তারই মধ্যে তক্তপোষে মলিন বিছানায়, ঘুমিয়ে আছে মনটুলি। পারুল আলো নিভিয়ে দিলো। এই পাঁচটা দিন বড় অশান্তিতে কেটেছে তার। প্রতিদিনই সেই লাইট পোস্টের কাছাকাছি এসে তার বুকের ভিতর যেন ইঞ্জিন চলেছে। কেমন এক অজানা ভয়ে ত্রাসে আশায় আকাঙ্ক্ষায় তার পা থেমে গেছে।

আজ নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো। আজ লোকটা নেই। চলে গেছে পাড়া ছেড়ে। কোথায় গেছে পারুল জানে না। আর কোনোদিন দেখা হবে কি না তাও জানে না। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো মেয়ের পাশে।

ঘুম আসছিলো না। ভীষণ গরম। কতোদিনের কতো কথা যে ভিড় করে এলো মনের মধ্যে। তারপর হঠাৎ মনে হলো লোকটা গেলো কেন? এবং এই কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেই অপরাধী বলে মনে হলো তার। অথচ কারণ কিছু খুঁজে পেলো না। তার দুঃখী অন্তর আরো দুঃখে ভরে গেলো।

সেই দুঃখ নিয়েই পরের দিন ডিউটিতে গেলো সে, এবং গিয়েই স্তম্ভিত হয়ে দেখতে পেলো নার্সিং হোমে ঢুকবার ফটকের একটু দূরে বাদাম গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে সুখেন। তাকে দেখেই একগাল হেসে এগিয়ে এলো। আপাদমস্তক জ্বলে গেলো পারুলের। মাথায় যেন খুন চেপে গেলো। কাল যে মনটা সত্যি তার একটু নরম হয়ে পড়েছিলো সেই মন সেই মুহূর্তে চতুর্গুণ রাগে বিষিয়ে উঠলো।

উত্তপ্ত হয়ে বলে উঠলো, আবার আপনি এখানে?

ঠাণ্ডা গলায় সুখেন বললো, হ্যাঁ।

কেন? কী চান? কী চান আপনি? আপনি জানেন এটা আপনার এলাকা নয়, এখানে আমারও কিছু ক্ষমতা আছে, আপনি যদি বাড়াবাড়ি করেন আমি দারোয়ান ডেকে আপনাকে—

কিন্তু তার আগে একটা কথা বলে নি—সুখেনের মুখ তেমনি শান্তভাব।

আমি আপনার কোনো কথা শুনতে চাই না। আপনার মতো লোকেরা মেয়েদের ডেকে যে কী কথা বলতে পারে তা আমার জানা আছে।

নিজেকে অতো সবজান্তা ভেবো না।

আপনি যাবেন কিনা বলুন। পারুলের চোখমুখ ক্রোধে উদ্দীপ্ত। ইচ্ছে করছিলো চেঁচিয়ে লোক জড়ো করে গুণ্ডাটাকে আচ্ছা করে কিছু শিক্ষা দিয়ে দেয়। কিন্তু কেলেঙ্কারীর ভয়ে সেটা পারছিলো না। চাপা চাপা গলায় কথা বলে নিরুপদ্রবে তাড়িয়ে দিতে চাইছিলো।

কিন্তু সুখেনের ভয় নেই, লজ্জা নেই। বিকারহীনভাবে বললো, আমি

তোমার স্বামীকে খুঁজে বার করেছি।

কী!

তুমি কি ওর কাছে ফিরে যেতে চাও?

চাই বা না চাই সেটা আমি আপনার সঙ্গে আলোচনা করবো না।

তা না করলে ঘটনাটা অন্তত শোনো। মনটুলির কথাটা তো ভাববে? বাবা না থাকলে ছেলেমেয়েদের কতো অসুবিধে হয়—

তাতে আপনার কী? আপনি যাবেন কিনা বলুন?

যাবো। নিশ্চয়ই যাবো। কিন্তু এমনভাবে যাবো না যেখানে এক-ফোঁটাও বিপদ আছে তোমার। ঐ লোকটাকে আমি বলেছি, হয় তুই বৌকে নিয়ে গিয়ে ভালোভাবে রাখো না হয় ডিভোর্স দে। মেয়ের খোরপোষ দে - আর তাছাড়া, আমাদের পাড়াটাও তোমার পক্ষে—

ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে এবার পারুল সত্যি গলা উঁচু করে বলে, আপনার কোনো কথা আমি শুনতে চাই না, আপনি যান, এক্ষুনি চলে যান

এমনিতেই অদূরে বসে থাকা গুটি গুটি একটি দুটি রকের ছেলে কান পেতে পেতে এগিয়ে আসছিলো। এবার সমবেতভাবে ছুটে এলো, কী, কী হয়েছে নার্স দিদি? লোকটা কী বলছে আপনাকে? ওদের দেখে পারুল থতমতো খেয়ে গেলো। সুখেন বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে বললো, ক'জন আছো? একজন একজন করে আসবে না একসঙ্গে আসবে?

সেটা এক্ষুনি দেখতে পাবে। একটা লিকলিকে ছেলে ঘুণিত চোখে এগিয়ে এলো, এটা আমাদের পাড়া, আমাদের মাল, এখানে বেশি বেশি পয়মালি করলে কুপিয়ে শেষ করে দেবো।

সুখেনের চোখ লাল হয়ে উঠলো। পারুলের দিকে তাকিয়ে বললো, এদের তুমি চেনো?

নার্সিং হোমের সামনে - কি কাণ্ড! ভাগ্যিস রাস্তার ধারের দেয়ালের পাশে ভিতরের রোগী লক্ষ্য করছে না। একটুকু হয়ে গিয়ে পারুল কাঁপতে লাগলো। আর কেউ না জানুক সে তো জানে, রকে বসে থাকা এই ছেলেগুলো কী ভয়ংকর জীব। ঢোক গিলতে গিলতে বললো, আপনারা যান, ইনি আমার আত্মীয় —আমার -

শালা, আত্মীয়ের নিকুচি করেছে, আমরা আর শুনিনি -এতোক্ষণ ধরে মরকুনির বাচ্চা মেয়ে ফুসলাচ্ছিলো।

আর একজন বলে উঠলো, আর এই নার্স মাগীগুলোও হয়েছে তেমনি

কী বললি? সুখেন একটা দুরন্ত বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো দলের মধ্যে। সব মিলিয়ে ছ'টা কি সাতটা ছেলে এগিয়ে এসেছিলো। প্রত্যেকটাকে যেন ভীষণ বিক্রমে মুরগীর মতো ছিঁড়ে ফেলতে চাইছিলো সে।

দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেলো, একটা ছেলে দৌড়ে চলে গেলো দলের আরো ছেলেদের খবর দিতে। আর সেই সুযোগে ভয়ার্ত পারুল ঢুকে গেলো কম্পাউণ্ডের মধ্যে। অনুপস্থিত দারোয়ানকে চিৎকার করে ডেকে

বলতে লাগলো, গেট বন্ধ করো গেট বন্ধ করো। তারপরেই দেখতে পেলো টাঙি নিয়ে, সড়কি নিয়ে ছুটে আসছে আরো অনেকগুলো ছেলে। বুঝতে পারলো এবার আর রক্ষে নেই, এবার সুখেনের রক্তে ভেসে যাবে মাটি। কোথা থেকে দারোয়ান দৌড়ে এলো। এসেই গেট প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলো। পারুল হাত বাড়িয়ে সেই ফাঁক দিয়েই আবার ছুটে বেরিয়ে এলো বাইরে। সে জানতো না এতো শক্তি আছে তার শরীরে। ছেঁকে ধরা দলের ভিতর থেকে সুখেনকে সে এক হ্যাঁচকা টানে নিয়ে এলো ভিতরে। হিস হিস করে বললো, থাকুন, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকুন এখানে। আমার যা সর্বনাশ করেছেন তা তো করেছেন, দয়া করে আর বীরত্ব দেখিয়ে একটা খুনের মামলার সাক্ষী করবেন না।

ন-ন্-না। জবরদস্তি করলো সুখেন, এমন ভীতুর মতো আমি লুকিয়ে পালিয়ে কারো আশ্রয়ে বাঁচতে পারবো না, ঐ শালাকে আমি পুঁতে ফেলবো মাটিতে। ও তোমাকে অপমান করেছে। আমার স্ত্রীকে অপমান করেছে।

স্ত্রী? কে আপনার স্ত্রী?

তুমি যাকে খুশি স্বামী ভাবো আমার কিছু যায় আসে না, আমি জানি তুমিই আমার স্ত্রী। আমি নপুংসক নই। ওর মুখ আমি থেঁতলে দেবো।

সুখেন পারুলকে ঠেলে আবার ছুটলো গেটের দিকে, ততক্ষণে লোহার কোলাপসিব্‌ল ফটক বন্ধ করে তালা মেরে দিয়েছে দারোয়ান। বাইরে থেকে ধাক্কাচ্ছে গুণ্ডার দল। নার্সিং হোমের ভিতর থেকে দলে দলে কর্মীরা বেরিয়ে এসেছে গোলমাল শুনে। দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে পারুল।

কী হয়েছে? কী হয়েছে? ডাক্তাররা এগিয়ে এলেন, মেট্রন এগিয়ে এলেন, নার্সরা এলো। বাইরে থেকে চিৎকার এলো, গেট খুলে দিন নইলে ভেঙে ফেলবো। কর্তৃপক্ষের ঠাণ্ডা মাথার একজন একবার মারমূর্তি ক্ষিপ্ত বাঘের মতো সুখেনকে দেখলো একবার ফটকের বাইরে জনতার দিকে তাকালো। তারপর হাত তুলে এগিয়ে গিয়ে বললো, আপনারা একটু থামুন। আমাদের জানতে দিন ব্যাপারটা কী হয়েছে। এই লোকটিই বা কে, আর আপনারাই বা কারা?

একসঙ্গে সকলেই কলকল করে উঠলো, কারো কথাই বোঝা গেলো না, শুধু অকথ্য কুকথ্য কতকগুলো গালাগালি কানকে বিদ্ধ করলো। বিপন্ন ভাবে ভদ্রলোক পারুলের দিকে তাকালেন। পারুল লজ্জায় মুখ তুলতে পারছিলো না। তার কথা বলার মতো শক্তি ছিলো না। সে বুঝতে পারছিলো এই মুহূর্তেই সে এই চাকরি থেকে বিতাড়িত হয়ে এই কুকুরগুলোর ভক্ষ্য হবে। আর এই লোকটা, এই গুণ্ডাটা—

কথা বলছো না কেন? বলো, বলো কী হয়েছে? ধমক দিলেন ভদ্রলোক।

সুখেন এগিয়ে এলো রাগ থামিয়ে। তার নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছিলো। ভদ্রভাবে বললো, আমি পারুলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম, এই অপরাধে আপনাদের পাড়ার অভিভাবকরা আমাকে শাসন করতে এসেছে।

শুধু এই ব্যাপার?

শুধু এই ব্যাপার। এরা বলছে আমি মেয়েছেলে ফুঁসলাচ্ছি।

পারুলের সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক?

পারুল আমার স্ত্রী।

কী—

পারুল যদি স্বীকার না করে আমার বলবার কিছু নেই, কিন্তু যা সত্য তাই আপনাকে বললাম। ওরা ওকে নার্সমাগী বলেছে, এ অপমান আমি সহ্য করবো না। আপনার দারোয়ানকে গেট খুলতে হুকুম দিন—মরি মরবো, কিন্তু ঐ লোকটার জিভ আমি টেনে ছিঁড়ে ফেলবো আগে :

কথা শুনে শুধু ভদ্রলোকই নয় সমস্ত স্টাফ হতবাক হয়ে থাকলো। পারুল বিবাহিত একথা সবাই জানতো। পারুলের একটি মেয়ে আছে তাও সবাই জানে। এবং এই শান্ত, ভদ্র, কর্মঠ মেয়েটি যে স্বামী পরিত্যক্তা তাও কারো অজানা ছিলো না। এতোদিন বাদে সেই স্বামী ফিরে এসে স্ত্রীর অপমানের প্রতিশোধের জন্য এমন মরিয়া হয়ে উঠেছে দেখে সকলের মনেই একটা সম্ভ্রমের উদ্রেক করছিলো। তাছাড়া এ সব ব্যাপার মানুষের একান্তভাবেই ব্যক্তিগত। কী থেকে কী হয়েছিলো, কেন বিচ্ছেদ হয়েছিলো তা তো আর কেউ জানে না। কার দোষ কার গুণ কে বলতে পারে। স্বামী শুনেই সবাই চুপ করে রইলো।

বয়স্ক মেট্রন ফটকের কাছে গিয়ে যুক্তকরে তাদের বক্তব্য নিবেদন করে উত্তেজনা প্রশমিত করার চেষ্টা করলেন। পারুল সেই যে মাথা নিচু করে মুখ ঢেকে রইলো আর একটা শব্দও তার মুখ দিয়ে বেরুলো না।

হাসপাতালের অধিকারী ডাক্তার বোস বেরিয়ে এলেন এবার। বললেন, আমি গাড়ি দিচ্ছি, পারুলকে আজ ডিউটি করতে হবে না, বাড়ি চলে যাক স্বামীর সঙ্গে।

এর উত্তরে পারুলের ভেজা গা আরো ভিজে গেলো, কিন্তু তবুও সে বলতে পারলো না, সুখেনের সব কথাই মিথ্যে। শুধু বুঝলো চাকরিটা তার গেলো। এবং সবচেয়ে যেটা ভয়াবহ, ডাক্তার বোসের হুকুম মতো গাড়িতে একা একা সুখেনের সঙ্গে বসতে হলো। এর চেয়ে দুঃখ লজ্জা পরাজয় আর কি থাকতে পারে পারুলের পক্ষে? কিন্তু এখন এই মুহূর্তে এই মিথ্যাকে স্বীকার করা ছাড়া তার লজ্জা নিবারণের আর উপায় কী। শুধু কি লজ্জা? একটা জীবনেরও তো মূল্য আছে? অস্বীকার করলে সুখেনকে কী ওরা আস্ত রাখবে? এই নার্সিং হোমের লোকেরাই কি আর এক মুহূর্ত দাঁড়াতে দেবে এই কম্পাউণ্ডে। আর পারুলের মাথায় যে কলঙ্কের বোঝা চাপবে, পারুল ভাবতেও শিহরিত হয়ে নিঃশব্দে গাড়িতে গিয়ে উঠলো। আর গাড়ি হুস করে পাড়া ছাড়িয়ে বড়ো রাস্তায় চলে এলো।

গাড়ির ঐ কোণে সুখেন আর এই কোণে ক্রন্দনরত পারুল। অনেক পরে অপরাধীর ভঙ্গিতে সুখেন এদিকে তাকালো। আস্তে বললো, পারুল, তুমি আমার উপর রাগ কোরো না, আমি তোমার ভাল করতেই চেয়েছিলাম।

পারুল জবাব দিলো না, মুখ ফেরালো না।

একটু অপেক্ষা করে সুখেন আবার বললো, আমাকে ক্ষমা করো।

এবারও পারুল তেমনই নিষ্পন্দ।

সুখেন আবার বললো, আমি তোমাকে অপমান করতে চাইনি, বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বুঝতে পারছি আমার সে যোগ্যতা নেই, তা নিয়ে আমি জোর করতেও যাইনি। গিয়েছিলাম সাবধান করে দিতে। আমি তো পাড়া ছেড়ে গিয়েছি, বদলোকগুলো নাকি একটা খারাপ ফন্দি এঁটেছে তোমার বিষয়ে। দলের ছেলেরা কাল রাত্রে গিয়েই বলেছে আমাকে, তাই আপিস ফেলে ছুটে এসেছি। ভাবছিলাম এর চেয়ে যদি স্বামীর কাছেও যেতে পারো, অন্তত নিরাপদে তো থাকবে? তোমার জন্য আমার যে কতো চিন্তা তা তো জানো না, কেবল আমাকে সন্দেহই করো।

এবার পারুল রুক্ষ গলায় বললো, পাড়া ছাড়তে আপনাকে কে বলেছিলো?

তুমি।

আমি!

পাড়া না ছাড়লে আমি কেমন করে তোমার বিশ্বাস রাখতাম? আমার রোজ তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করতো, রোজই হয়তো দাঁড়াতাম গিয়ে পথে। আর তুমি রাগ করতে।

আমার সব আপনি নষ্ট করে দিলেন। আমাকে কতো লোকের কাছে হেয় করলেন, মিথ্যুক বানালেন, পারুল রুদ্ধস্বর হলো।

নিশ্বাস ফেলে সুখেন বললো, আমি সেজন্য খুব দুঃখিত পারুল। আমাকে তুমি যা খুশি সাজা দাও। কিন্তু ক্ষমা করো। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আর কোনো দিন তোমার সঙ্গে দেখা করবো না। শুধু আজ বাদে। আজ একবার আমাকে তোমাদের পাড়ায় যেতে দাও, তোমাদের ঐ সব ভদ্রলোকদের বলে দিয়ে আসি—"ডে যদি মুণ্ডু রাখতে চায় তাহলে ভুলেও যেন তোমাব দিকে কুনজর না দেয়।

আপনি কোথায় গেছেন?

বহুদূরে। আমাদের দেশ লিলুয়াতে।

এখন কোথায় যাবেন?

তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আপিসে যাবো।

আমি এই অসময়ে বাড়ি গিয়ে কী কৈফিয়ৎ দেবো?

তুমি যা ভাল বুঝবে।

যদি বাবা তাঁর মেয়ের শ্লীলতাহানির অপরাধে পুলিশে খবর দেন?

আমি তো তোমার শ্লীলতাহানি করিনি।

করেননি?

বিয়ে করতে চাওয়া কি শ্লীলতাহানি?

নিশ্চয়ই। আপনি জানেন না, আমি আর একজনের স্ত্রী? একজনের সন্তানের মা?

তাতে কী? সে তো আর তোমার জীবনে নেই? সে তোমাকে সব রকমে কষ্ট দিয়েছে, পাঁচ বছর হলো তোমরা আলাদা আছো। লোকটা বলেছে

তোমার বাবা আইনসঙ্গত ভাবে তোমাকে তার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছেন। বলো, সত্যি কিনা ?

সত্যি মিথ্যার আপনি কী বোঝেন ? আপনার কাছে সত্যের কতোটুকু মূল্য ?

অনেকখানি। আমি কখনো মিথ্যা কথা বলি না পারুল।

বলেন না ?

না।

এই 'না' বলাটাও আপনার মিথ্যার প্রমাণ। আপনি আমাদের নার্সিং হোমে কী বলে এলেন ? যা বলে এলেন তা কী সত্যি ?

নিশ্চয়ই। আমার কাছে তা একবিন্দু মিথ্যা নয়। আমি তোমাকে যা ভাবি তাই বলেছি। তুমি আমাকে কী ভাবো সেটা তোমার কথা। কিন্তু যাকগে, আজকের মতো আমাকে সহ্য করো, আমি এই তোমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি—গা ছুঁতে গিয়েছিলো সুখেন, কিন্তু সংযত হলো, বললো, না, গা ছুঁয়ে নয়, আমি আমার মার নামে প্রতিজ্ঞা করছি, তোমার সঙ্গে আমি জীবনে আর কোনোদিন দেখা করবো না। শুধু আজকের মতো তুমি আমাকে দয়া করো আমাকে ক্ষমা করো।

আমাকে এখানেই নামিয়ে দিন। আমি কক্ষনো আপনার সঙ্গে এক গাড়িতে চড়ে নিজেদের পাড়ায় ঢুকবো না।

বেশ, তাই হোক।

মাণিকতলা ব্রীজের একটু দূরে এসে থামলো গাড়ি। দুজনেই নেমে পড়লো। ডক্টর বোসের ড্রাইভার ফিরে গেলো তক্ষুনি।

ব্রীজ পেরিয়ে একটু নেমে নিচে যে ভাঙা ভাঙা সব টিনের চাল বাড়িগুলোর সারি দেখা যায়, তারই একটাতে এতকাল সুখেন বাস করে গেছে। আরো বেশ খানিকটা হেঁটে একটা গলির মধ্যে সাধন সরকারের বাড়ি।

সুখেন ব্রিজে উঠলো। বিরক্ত হয়ে পারুল বললো, আপনি আসছেন কেন ? আপনি তো অন্যদিকে—আপিসে যাবেন।

তার আগে ঘরে ঢুকবো একবার।

ঘর মানে ?

আমাদের ঘর। এতকাল যেখানে ছিলাম। এখনো আমরাই ভাড়া দিচ্ছি। বাড়িওয়ালাটা এমন চশমখোর, পুরো মাসের ভাড়া নিয়ে তবে ছাড়লো। অথচ গেছি আমরা সতেরো তারিখে। কাজেই বাড়িটার অধিকার তো আছেই। জিনিসপত্রও আছে কিছু। স্নান করা দরকার, মুখ চোখ ধোয়া দরকার। কতো রক্ত লেগে আছে, চেপে চেপে চলছি, হয়তো পুলিশে ধরে বসবে।

কী! এতক্ষণে এক ঝটকায় মুখ ফিরিয়ে পারুল সুখেনকে দেখলো। আঁৎকে উঠে বললো, এ কি!

হাজার হোক, সাত আটটা ছেলে তো, কোনো তো নিয়ম কানুন মানেনি, যে যেভাবে পেরেছে মেরেছে, নাক চোখ ছিঁড়ে দিয়ে রক্ত বার করেছে সেটা

কিছু নয়, বুকে যে একটা কী দিয়ে মারলো—

মিথ্যুকদের অমনই হয়, গুণ্ডাদের অমনই হয়, ছোটোলোকরাই ওরকম রাস্তায় রাস্তায় মারামারি করে—আপনি রিক্সা ডাকুন, আমি আপনাকে নিয়ে হেটে যাবো না।

তুমি আগে আগে চলে যাও, কে জানবে যে এতটা পথ আমি তোমার সঙ্গী হয়ে এসেছিলাম। আমি বরং অপেক্ষা করি একটু দাঁড়িয়ে, তুমি অনেকটা দূরে গেলে তারপর রওনা হবো।

পারুল সে কথার জবাব না দিয়ে রিক্সা ধরলো, ভুরু কুঁচকে বললো, উঠুন। আগে ডাক্তারখানার চলুন। পাঁচবছর আমি নার্সের কাজ করছি, আমার কতকগুলো কর্তব্যবোধ আছে।

সুখেন হাসলো। বললো, পাগল হয়েছো। হাঁটা পথে তোমার বাড়ি এখান থেকে বেশ দূর, তুমি চলে যাও। আমি ঠিক আছি।

বেশ। বিনা বাক্যব্যয়ে রিক্সায় উঠে চলে গেলো পারুল।

সুখেন দ্রুত হেঁটে ব্রীজ পার হলো। পারুলের জন্য তার কষ্ট হচ্ছিলো, ব্যথা পাওয়া বুকের ভিতরে আরো যন্ত্রণা হচ্ছিলো। মনে মনে না বলে পারছিলো না, পারুল বড় নিষ্ঠুর। এই তো ওর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। অন্তত এর চেয়ে একটু নরম হলে ক্ষতি ছিলো কী? যাবার সময় একটু বিদায় পর্যন্ত নিলো না।

ভগ্নহৃদয়ে সুখেন দরজায় পেঁছিয়ে তালা খুললো। শূন্যঘর খাঁ খাঁ করছে। আসবাবপত্র কী বা ছিলো। শুধু তো দুটো তক্তপোষ আর কতকগুলো মরচে-পড়া কবেকার ট্রাঙ্ক বাক্স। আর ছিলো ছেলেবেলাকার পড়াশুনো করবার একটা টেবিল আর চেয়ার। তার সঙ্গে সম্পর্ক তো কবেই চুকে গেছে। চেয়ারটায় অবশ্য বসতো মাঝে মাঝে তাও আবার হাতলটা ভেঙে গিয়েছিলো। এখন দেখা গেলো জিনিসপত্র মা সবই নিয়ে গেছেন।

সাধারণত বাড়িতে তিষ্ঠনোই তার স্বভাব নয়। ঊষায় বেরোয় আর নিশায় ফেরে। ফিরেই তো খাওয়া আর ঘুম। বাড়ির প্রয়োজন ঐটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। বাদবাকী সময় আপিস করেই দলের সঙ্গে কেবল শলা-পরামর্শ আর অকারণে একে ওকে শাসিয়ে বেড়ানো। ন্যাপার চায়ের দোকান, সরলদের বারান্দা জুড়ে বসে থাকা, রাস্তার মোড়ে জটলা, দল বেঁধে অসভ্যতা করতে করতে পথে হাঁটা—

সুখেন নোংরা মেঝেটার উপরেই শুয়ে পড়লো কপালে হাত দিয়ে। তার নাকের রক্ত আস্তে আস্তে শুকিয়ে আসছিলো, মোটা রেখায় গড়িয়ে থাকলো কান পর্যন্ত। ঠোঁটটা রুমাল দিয়ে অনেক আগেই মুছে ফেলেছিলো। হাত দিয়ে অনুভব করলো কপালটা ফুলে উঠেছে, সুপুরির মতো। আপিসে যাওয়া দরকার। যদিও ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে জ্বর হয়েছে। নাও যেতে পারে, তবু কামাই করতে ভালবাসে না। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে শ্রান্তিতে ক্লান্তিতে পারুলকে হারাবার বেদনায়, তার দেহমন যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত রুগীর মতো অসাড় হয়ে পড়ে থাকতে চাইলো। বালকের মতো কান্না

আসছিলো তার। সে ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা করছিলো, তার মারামারির জীবন যেন এখানেই শেষ। সে যেন লিলুয়াতে গিয়ে ভদ্রলোক বলে পরিচিত হতে পারে। গুণ্ডা আখ্যা আর শুনতে না পায়। তাছাড়া এই গুণ্ডা বলেই তো পারুল তাকে নাকচ করলো। পারুল ভাল মেয়ে, গুণ্ডাকে সে কেনই বা পছন্দ করবে। না করুক, তবু পারুল একদিন একবারের জন্য হলেও বলেছিলো; সে তাকে শ্রদ্ধা করে। ভগবান, এই আমার মূলমন্ত্র হোক। পারুল দেখুক না দেখুক, আমি যেন সত্যিই কোন অশ্রদ্ধার কাজ না করি।

আস্তে আস্তে ঐ ময়লা ফাটল ধরা সিমেণ্ট চটা মেঝের উপরই কাৎ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলো সুখেন। কখন যেন তারই মধ্যে অনুভব করলো কেউ যেন ঘরে ঢুকছে খোলা দরজা দিয়ে। তারপরেই একটা রুক্ষ গলা বলে উঠলো, ও কি, ওখানে শুয়েছেন কেন? উঠে বসুন। আপনাদের জল কল কোথায়? আমি ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ ব্যাণ্ডেজ নিয়ে এসেছি। চটপট এগুলো সেরে আমাকে ফিরতে হবে।

সুখেন তন্দ্রা ছেড়ে লাল চোখে তাকালো তাকিয়েই আবার চোখ বুজে ফেললো, ঝিমিয়ে পড়া গলায় বললো, ও সবে দরকার নেই। আমার ও সবে অভ্যেস নেই—

পারুল নিস্পৃহভাবে বললো, আপনার অভ্যেস নিয়ে কথা হচ্ছে না, কথাটা আমার অভ্যেস নিয়ে। আমি আজ চার বছর ধরে একটা নার্সিং হোমে নার্সের কাজ করছি, চোর জোচ্চোর গুণ্ডা বদমায়েশ আমাদের কাছে সব সমান। অসুস্থ হলে তাকে সেবা করাই আমাদের ধর্ম। আপনিও তা থেকে আলাদা নন। এ অবস্থায় আপনাকে আমি ফেলে যেতে পারি না।

আমি কারো কৃপা চাই না।

এটা কৃপা নয়, কর্তব্য।

তুমি যাও পারুল। সুখেন তেমনি মুদ্রিত চোখে বললো, এখানে এভাবে একা আমার ঘরে কেউ তোমাকে দেখলে তোমার ক্ষতি হবে। আর আমারও এ সব বরদাস্ত হচ্ছে না। জানোই তো, আমি গুণ্ডা বদমায়েশ লোক, এ সব মারধোর আমার কাছে জলভাত। তুমি যাও।

যাবো। পারুল এদিক ওদিক তাকালো, তারপর কোণের দিকে একটা পরিত্যক্ত মাটির ভাঁড় দেখতে পেয়ে সেটা হাতে নিয়ে চলে গেল বাইরে! রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে জল ভরে নিয়ে এলো টিউবওয়েল চেপে।

ততোক্ষণে আবার তন্দ্রা এসে গিয়েছিলো সুখেনের। পারুল নিঃশব্দে মাথার কাছে বসে তুলো ভিজিয়ে শুকনো রক্তের দাগগুলো মুছিয়ে দিতে চেষ্টা করতেই সুখেন চেঁচিয়ে উঠলো, বলছি না, ওসব করতে যেয়ো না।

চার বছরের অভ্যস্ত নার্স পারুল তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ধমক দিলো, যা বলছি তা শুনুন, নইলে লোক ডেকে আনবো, জোর করে তারা হাসপাতালে নিয়ে যাবে আপনাকে। সেটা বোধ হয় খুব সুখের হবে, না?

এরপর সুখেন আর কিছু না বলে চুপ করে থাকলো। হয়তো শক্তিও ছিলো না। পারুল তার পটু হাতে ধুয়ে মুছে ব্যাণ্ডেজ করে ঠিকঠাক করে

দিয়ে হাত পা ধুয়ে এলো। তারপর বললো, আমি যাই।

সুখেন বললো, আচ্ছা।

মেঝেতে শুয়ে থাকবেন না, জ্বর হতে পারে।

হোক।

আপিসে যাবেন না, মারামারি করে নাক ফাটিয়ে আপিসে গেলে চাকরি যাবে।

সে আমি বুঝবো।

লিলুয়া এখান থেকে অনেক দূর, এখন না যাওয়াই ভালো।

আমি যাবো!

আমার মতে সেটা উচিত হবে না।

তোমার মতামতের উপর আমার কিছুই নির্ভর করছে না।

আপনি বলেছিলেন আপনি মিথ্যে কথা বলেন না, এটা কি সত্যি কথা হলো?

অবশ্যই সত্য।

এ পাড়ায় আপনি আজ আমার জন্যই ঝগড়া করতে এসেছেন, এবং আমি যেখানে বলছি যে আমার জন্যে কারো মাথাব্যথার দরকার নেই, আমার পথে চিরকাল আমি একাই ঠিক মতো চলে এসেছি, আজো পারবো, তারপরে কী করে আপনি বলেন যে আমার মতামতের উপর আপনার কিছু নির্ভর করছে না?

শোয়া থেকে হঠাৎ সোজা উঠে দাঁড়িয়ে গেলো সুখেন, ঠিক আছে, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। লাফিয়ে ঘরের বাইরে এসে ভিতরে দাঁড়িয়ে থাকা পারুলকে ডাকলো, চলে এসো, তালাটা বন্ধ করে দেবো।

পারুল বললো, আপনি যান না, আমি যাবার আগে বন্ধ করে দিয়ে যাবো।

আমার বাড়ি তুমি বন্ধ করবে কেন? তারপর চাবি আমি কোথায় পাবো?

কেন, আমার কাছেই পাবেন।

তোমার সঙ্গে আমার আজই শেষ। আমি আর কোনোদিন কোনো কারণেই তোমার সঙ্গে দেখা করবো না।

অন্তত কাল তো করতেই হবে।

কারণ?

কারণ, আমি আপনার সঙ্গেই কাল নার্সিং হোমে যেতে চাই।

কেন, আমি কী করবো সেখানে গিয়ে? নাকি খুন করাবার পরামর্শ করে এসেছো পাড়ার বান্ধবদের দিয়ে?

না, তা করিনি। একটু হাসলো পারুল, চাকরিটা তো রাখতে হবে?

তোমার চাকরি তোমার, তার সঙ্গে আমার যাওয়া না যাওয়ার কী সম্পর্ক?

ডক্টর বোস কড়া লোক, সৎ এবং আদর্শবাদী, তাঁর কাছে আমি মিথ্যুক হয়ে থাকতে পারি না। কাল তাঁকে দেখানোর জন্যে হলেও কিছু একটা করতে হবে তো। তিনি আমাকে মেয়ের মতো ভালোবাসেন।

পারুলের প্রস্তাব শুনে সুখেন চমৎকৃত হলো। যে মেয়েকে সে এতো

ভালোবাসে তার এই মিথ্যা সুবিধাবাদী স্বভাব এবং স্বার্থপরতা হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করলো। বোকার মতো কতোক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললো, তার জন্যে আমার মেকী স্ত্রী সাজতেও তোমার আপত্তি নেই, না ?

পারুল জবাব দিলো না।

আর কী কী করলে তোমার সুবিধা হয় ?

বাড়িটা যদি ছাড়েন—

এবং তোমার দারোয়ানিটা যদি করে যাই। সুখেন পাদপূরণ করলো।

পারুল থেমে থেমে বললো, বাড়িটা আমি রাখতে চাই।

রাখতে চাও রাখো। সে তোমার খুশি। বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করো গিয়ে—আমার কি তাতে ?

আপনার সাহায্য ছাড়া হবে না।

কেন ?

ওটা আপনার নামেই থাকবে।

আমার নামে ? ও বুঝেছি, আমার নাম ভাঁড়িয়ে পনেরো বছর আগের ভাড়াতেই কিস্তিমাত করতে চাও, তাই তো ?

ঠিক।

তোমার জন্যে মার খেয়ে এসেছি সেটা যেমন সত্য, তোমাকে যে ভালবাসি যেটা যেমন সত্য, তোমার ন্যায় অন্যায় বোধের অভাব যে আমাকে অত্যন্ত কষ্ট দিচ্ছে সেটাও তেমনি সত্য। পারুল, তোমার সেবার জন্য আমি কৃতজ্ঞ, দয়া করে এখন তুমি বাড়ি যাও। আমাকে একা থাকতে দাও।

তাহলে বাড়িটার বিষয়ে—

না, তোমার জন্যে আমি নিজের নামে বাড়ি রাখবো না।

কিন্তু লিলুয়া থেকে রোজ ডেলিপ্যাসেঞ্জারী করা কি সম্ভব ?

সম্ভব কি সম্ভব নয় আমি আমারটা বুঝবো। কারো আদেশ নির্দেশ আমার অসহ্য বোধ হয়।

আপনারটা না হয় আপনি বুঝলেন, কিন্তু আমারটাও তো বুঝতে হবে।

তোমারটা মানে ?

আমি তো আর কাজটা ছেড়ে দেবো না।

ছাড়ো বা রাখো তার সঙ্গে এসব কথা ওঠে কিসে ?

ওঠে এই জন্যে যে তাহলে আমাকেও লিলুয়া থেকে আসা যাওয়া করতে হয়।

কী বললে ? বিহ্বল ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকলো সুখেন।

এর চেয়ে আর কী বেশি বলা যায় আমি জানি না। হঠাৎ দ্রুতপায়ে দরজার কাছে চলে এলো পারুল, ঠেলে বেরিয়ে এলো সিঁড়িতে।

সুখেন চেঁচিয়ে বললো, ব্যাগটা নিয়ে যাও, তারপর তো আবার চোর ঠ্যাঙাতে লোক নিয়ে আসবে, বলবে গুণ্ডাটা ছিনিয়ে নিয়েছে।

ব্যাগের জন্যে ফিরতে হলো তাকে, কিন্তু ব্যাগ নিয়ে তাকিয়ে দেখলো দরজা বন্ধ। সুখেন পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ভুরু কুঁচকে পারুল বললো, ও কি ?

আমার অসুখ, এখন তোমার যাওয়া হবে না।

কী করতে হবে ?

স্ত্রীরা স্বামীকে কী করে ?

পারুল ঠোঁট কামড়ালো, লাল হলো, তারপর বললো, সংশোধন করে, অসভ্যতা করলে শাসন করে, তারপর নিজের বাড়িতে চলে যায়।

তাদের দুজনের বুঝি দুটো বাড়ি থাকে ?

থাকে। অন্তত এই মুহূর্তে তো আছে।

না নেই, এ বাড়ি তোমার, তোমার, তোমার। এ বাড়ি আমার আর তোমার। পারুল, চলো আমরা এক্ষুনি কালিঘাটে যাই, যা আমি বিশ্বাস করি না, সেই ছাপটা মেরে নিয়ে আসি কয়েকটা সাক্ষী আর টাকার বিনিময়ে।

কালিঘাটে ?

বিয়ে করতে হবে না ? বুক ঠুকে সবাইকে বলতে হবে না—আমি রাজ-সিংহাসনে বসতে পেরেছি এতোদিনে। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে সুখেন তার শালপ্রাংশুর মতো সোজা শক্ত বলিষ্ঠ বুকে পারুলকে চেপে ধরলো।

এষার ঘুম ভেঙে গেলো এবং সে আর এক প্রস্থ মাথা ধরার শিকার হলো। আজ তিন দিন সমানে মাথা ধরে আছে, একটু কমে একটু বাড়ে, কিন্তু সারে না। অ্যানাসিন, সারিডন, কোডোপাইরিন, অ্যাস্পিরিন যা পাচ্ছে তাই খাচ্ছে তবু এই অবস্থা। আজই প্রথম যে দুপুরে ভাতটাত খেয়ে ওঠার পরে দেখলো মাথা ধরাটা নেই। শরীরের আরাম তো বটেই, মনের আরামেও ঘুম এসে গেলো। তিন দিন অতগুলো বিভিন্ন নামের পিল খেয়েছে, ঘুম-ঘুম তো এমনিই ছিলো সব সময়, মাথার যন্ত্রণাই তাকে জাগিয়ে রেখেছে, আজ একেবারে যাকে বলে সুখনিদ্রা, তাইতেই ঢলে পড়েছিলো এষা।

এষার বয়েস সাঁইতিরিশ, ছিপছিপে গড়ন, গায়ের ফর্সা রং, স্বাস্থ্য টলটলে, মুখশ্রী অতি সুন্দর, সন্তানাদি না হবার দরুন একটুও ভাঙেনি চেহারা, প্রায় চল্লিশ মহিলাকে চব্বিশ বছরের যুবতীর মতো দেখায়। স্বামী শুভেন্দু বড় চাকুরে, প্রেম করে বিয়ে করেছিলো, এখনও প্রেম ছুটে যায়নি তবে ভীষণ ঝগড়া হয়। ঝগড়া হয় এই নিয়ে, শুভেন্দু তার কাজে বড় বেশি সময় কাটায় আজকাল। অবশ্য এষা এটা বোঝে কাজ না করে উপায় নেই বেচারার, দায়িত্ব তো কম নয়, এখানে শুভেন্দু ডিরেক্টার হয়ে এসেছে। শুভেন্দু কম্পিউটার বিষয়ে বিশারদ। বিলেত থেকে শিক্ষা নিয়ে এসে প্রথম চাকরি বম্বেতে, এখন কলকাতায়। আছে দক্ষিণতম প্রান্ত নাকতলায় একটি নাতিপ্রশস্ত একতলা বাংলো বাড়ি ভাড়া নিয়ে। বাড়িটির সামনে ছোট সবুজ ঘাসের জমি, জমি ঘিরে ফুলগাছ। এষা মাটি ভালবাসে গাছ ভালবাসে ফুল ভালবাসে। শহরের ভিড় ভালবাসে না, কবুতরের খোপের মতো দুশো লোকের এক সঙ্গে বাস ফ্ল্যাট ভালবাসে না, বম্বেতেও এই কারণে তাকে উপকণ্ঠে বাড়ি নিতে হয়েছিলো।

এষাও বম্বেতে খুব ভালো একটা চাকরি করছিলো, যোগ্যতায় সেও কিছু কম যায় না। কলকাতা আসবে বলে চাকরিটা ছাড়তে হলো। শুভেন্দু অবশ্য বলেছিলো, ইচ্ছে করলে থাকতে পারো এখানে, ওখানে গিয়ে বেকার হলে খুব খারাপ লাগবে। বরং আমি গিয়ে খোঁজটোজ করি, তুমিও বিজ্ঞাপন-টিজ্ঞাপন দেখো—

তখন কিছু বলেনি এষা, কিন্তু সময়মতো ঠিক রেজিগনেশন দিয়ে এসেছে। বলেছে, দূর, এখানে একা একা পড়ে থাকবো নাকি চাকরির জন্যে? আমার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই।

কাজ যে সত্যিই নেই খুব ভালো হাতেই টের পাচ্ছে এখন। শুভেন্দু যে এতটা বাড়ি না থাকা পার্টি এটা বম্বেতে একদিনের তরেও জানতো না। কী করে জানবে? সেও তো বাড়ি থাকতো না। কিন্তু কলকাতা এসে ছ'মাসের মধ্যেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সারাদিন শুয়ে বসে বই পড়ে হাই তুলে শেষ পর্যন্ত যতো রাগ গিয়ে পড়ে শুভেন্দুর উপর। বম্বে থাকতে যেটা মান-অভিমান ছিলো এখন সেটা ঝগড়া এবং একতরফা। হবেই। ওরকম স্বামীকেন্দ্রিক হয়ে বসে থাকলে যতো উদ্ভট ভাবনা দখল করবেই তার মস্তিষ্ক। নিজের তো আর কিছু নেই। না বন্ধু না বান্ধব না বাপের বাড়ি না সন্তান।

শুভেন্দু বলে, তুমি একটা মহিলা সমিতি-টমিতি করো না হয়।

এষা রেগে যায়, হ্যাঁ, তা হলে আপনি আর একটু বাইরের আমোদটা উপভোগ করতে পারেন, এই তো?

শুভেন্দু হাসে, বলে, আমোদটা একবার দেখে এসো গিয়ে।

দেখে এসে তোমাকে আমি কি আর আস্ত রাখবো? অতো শান্ত সুশীলা মেয়ে পাওনি আমাকে! আমি জানি তোমার ঘরে একটা খুব সুন্দর ছুকরি বসে কাজ করে, কাজ শেখে।

সে তো আমি বলেছি বলেই জানো।

ও, না বলারও ইচ্ছে ছিলো বুঝি?

ইচ্ছে না থাকলে তো বলতামই না।

হ্যাঁ, তখন বলেছো, কারণ তখনও মনে কোনো পাপ ঢোকেনি।

এখন ঢুকেছে, না?

নিশ্চয়ই ঢুকেছে, নইলে এখন আর কিছু বলো না কেন?

বলবার না থাকলেও বলতে হবে?

চুপেচুপে মানুষ যে কাজ করে, তা কেউ কারোকে বলেছে কোনোদিন?

কী করি চুপেচুপে?

ঐ আর কি। আমি জানি তোমার চাকরি করার মেয়াদ আর সকলের মতোই দশটা-পাঁচটা—

তারপর?

তারপর আমি কী করে বলবো? আমি দেখতে যাই, না স্পাই লাগাই?

মাত্র ছ'মাসের বেকারত্বই এষাকে এরকম বেয়াড়া করে তুলেছে। শুভেন্দু প্রমাদ গুনছে। তার উপরে আর এক রোগ মাথা ধরা। ডাক্তার বলে সন্তানাদি হয়নি তো, মুখে না বলুন, মনে মনে হয়তো ব্রুড করেন, মেয়েরা মাতৃত্ব চায়, সে যেমন মেয়েই হোক।

শুভেন্দু ভেবে দেখে কথাটা ঠিক। এষা মুখে বলে বটে, বাচ্চাকাচ্চা ভাবতেই আমার বিশ্রী লাগে। দেখেছি তো বন্ধুবান্ধবদের—ঈস্ কী নোংরা! যখন তখন যা-তা করে ফেলে। ভগবান বাঁচিয়েছেন আমাকে।

এর নাম হচ্ছে ঠাকুরঘরে কে, আমি কলা খাই না।

শুভেন্দুরও খুব একটা সন্তানের সখ। খুব ইচ্ছে করে, কাজ থেকে ফিরেই সেই গোপ্তাগাপ্তাটাকে নিয়ে লোফে, একটু বড় হলে লেখায় পড়ায়

ধমকায় সহবৎ শেখায়—পথের বাচ্চাকেও সে আদর করে, পাড়ার বাচ্চাকেও আদর করে, বন্ধুবান্ধবদের বাচ্চাকে তো বটেই।

এ নিয়েও রাগ করে এষা, কী মেয়েলিপনা করো শুভেন্দু, আমার ভাল্লাগে না।

কী করলাম ?

ওরকম যখন তখন এর ওর তার ছেলেপুলেদের নিয়ে আদিখ্যেতা করো না তো, আমার খুব খারাপ লাগে।

সত্যিই, এষা কোনোদিন কোনো শিশুর দিকে ফিরে তাকায় না, কোনো বালক বালিকাকে জীবনে ডেকে একটা মিঠে কথা বলে না, অদ্ভুত। এটা যে ওর কী মনস্তত্ত্ব কে জানে। অনেক সময় কেমন যেন নিষ্ঠুর মনে হয়। মনে হয় ঐজন্যই ওর বচ্চো হলো না। চায় না বলেই হয় না। নইলে ডাক্তার বলেছেন ওরা দুজনেই সন্তান উৎপাদনে সক্ষম।

বিয়ে আজকে হয়নি। এষা তখন এম. এ. পরীক্ষা দিয়েছে, সে বিলেত যাবার তোড়জোড় করছে! হয়ে গেলো বিয়ে। এক সঙ্গেই বিলেত গেলো। এষার খরচ দিলেন এষার বাবা, শুভেন্দুর খরচ দিলেন শুভেন্দুর বাবা। এক বছরের মধ্যেই তারা তাদের পিতামাতার সেই ঋণ শোধ করে দুজনেই যথেষ্ট যোগ্য হয়ে উঠলো। ছাত্রবৃত্তি করে ও নানান কাজে উপার্জন করে নিজেদের খরচটা নিজেরা চালাতে লাগলো। আর ছাত্রবৃত্তি ফুরিয়ে গেলে তো কথাই নেই।

একাদিক্রমে দশ বছর তাদের সেখানেই কেটেছিলো। ফিরে এসেছে বছর পাঁচেক আগে। কলকাতা এসেছে ছ'মাস। এষার মা-বাবা দিল্লীতে থাকেন, শুভেন্দুর মা-বাবা বহরমপুর,—এই মা-বাবারা যদি কলকাতা থাকতেন তাহলেও এষার বেকারত্ব এষাকে এতটা বিড়ম্বিত করতো না। কিন্তু কপালগুণে সবই উল্টো উল্টো। একটা কাজও জুটছে না বেচারার। মাঝখান থেকে এক বিষম অশান্তি হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। আরো এক উৎপাত পাশের বাড়ির এক শিশু বাচ্চা। এ যে কার বাচ্চা কী বৃত্তান্ত শুভেন্দু জানে না। পাশের বাড়িটা এক দেয়ালের ব্যবধানে হলেও যেতে হয় অনেক ঘুরে। আসলে পাশাপাশি দুটো ছোটো ছোটো ব্লাইণ্ড লেনে দুটো গলি। বড় রাস্তা এক মিনিটের পথ ঐ পথ, দিয়ে ঘুরে অন্য লেনে ঢুকে তবে ঐ বাড়ি। আলাপ নেই, চেনাজানা নেই, কোনো বাড়ি থেকে কোনো বাড়ি দেখাও যায় না কিন্তু শোনা যায়।

আসলে ঠিক পাশের বাড়ির বাচ্চাও নয়, কান্নাটা আসে বাড়ির গেটের ধারে গ্যারেজের ভিতর থেকে। মাকে নিশ্চয়ই সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হয় সংসারের কাজে, ফলে বাচ্চাটার অনাদর হয় আর তাই খুব কাঁদে। ঐ কান্নাই এষার মেজাজকে সমস্তদিন আরো ক্ষেপিয়ে রাখে।

এইমাত্র সেই কান্নাতেই ঘুম ভেঙেছে এষার। এমন হাহা করে কেঁদে উঠছে যে মনে হয়, যেন খুন হয়ে গেলো।

উঃ, মানুষের যে কেন ছেলেপুলে হয়—কপাল টিপে উঠে বসলো সে। হৃদয়হীনের মতো স্বগতোক্তিতে বললো, ইচ্ছে করছে গলা টিপে মেরে আসি। আর বাপ-মাও তেমনি। অশিক্ষিতের হাঁড়ি। কেন বাবা, মানুষ যদি না না করতে পারিস ভালোভাবে তবে হওয়ানো কেন? অসভ্য।

পুরনো আয়া পদ্মা দৌড়ে এলো, হামাকে কিছু বলছো দিদি।

এষা খিঁচিয়ে বললো, ঐ ছেলেটা কাদের? সারাদিন কাঁদছে আর কাঁদছে, জ্বালিয়ে খেলো। একটু ঘুমোবার উপায় নেই। জঘন্য।

পদ্মা বললো, গ্যারেজের খোকা।

ছোটোলোক। দিলে সব মাটি করে। একটু ঘুমোচ্ছিলুম, একটু কমেছিলো মাথার যন্ত্রণাটা, আবার শুরু হবে এখন। যা-তা। শোনো একসময়ে গিয়ে বলে আসবে তো, এরকম যখন তখন ছেলেকে যেন কাঁদায় না। ছেলে ওদের, দায়িত্ব ওদের, ওরকম পাড়াপ্রতিবেশীকে জ্বালানো বেআইনি। এ তো লাউডস্পীকারকে হার মানিয়েছে। লাউডস্পীকার হলে তো পুলিসে খবর দেওয়া যেতো, এ যে তাও নয়।

রাগে গড়গড় করতে করতে এষা আবার শুয়ে পড়লো।

কিন্তু এসব কথার সবটাই সত্য নয়। বাচ্চাটা একটু বেশি কাঁদে বটে, হাসেও খুব। একেবারে খিলখিল করে হাসে। মনে হয় কারও সঙ্গে টুকি টুকি খেলে। পদ্মা বললো, ওর মায়ের সঙ্গেই খেলে। সে মনিবানীর নির্দেশ পেয়ে খুব খুশি মনেই গ্যারেজের বৌটির সঙ্গে আলাপ করে এসেছে। ছোট্ট মা, সতেরো আঠেরো বছরের বেশি নয়, বাচ্চাটাও মাত্রই বারো চোদ্দ মাসের, টলে টলে চলে, দারুণ মোটা, দারুণ সুন্দর।

এসব শুনে আর এষার কী লাভ, ভুরু কুঁচকে বলে, বলে এসেছো তো, চ্যাঁচামেচি কান্নাকাটিতে আমাদের কতো অসুবিধে হয়?

বলেছি বইকি। বৌঠো খুব লোজ্জা পেইছে, ভোয় পেইছে। বলেছে, এর পোরে সে সাবধান হোবে। ছেলেমানুষ মেয়ে তো, ঠিক সুবিধে করতে পারে না দুষ্টু ছেলেকে। বাবা তো সারাদিন থাকে না কি না? একা হাতে—

খবর সে আরো এনেছে। কোলে এইটুকু ছেলে, তার মধ্যেই আবার শরীর খারাপ, সারাদিন মাথা ঘোরে, শুয়ে শুয়ে থাকে, খেতে পারে না বমি করে। কাজও তো আছে সংসারের, রান্না করা বাসন মাজা ঘর ঝাড়পোঁচ, বাচ্চার ঝামেলা—

শুনে এষার মাথা আরও গরম, রাস্টিক, বর্বর, এ দেশের উন্নতি হবে কি, এতো যে পরিবার পরিকল্পনাব বোলবোলাও তাতে এদের কোনো উপকার হচ্ছে? বড়ো বড়ো লোকেরা মাত্র একখানা বাচ্চা বানিয়ে আরো বড়োলোক হচ্ছে। মাইনে বাড়ছে, খরচ বাড়ছে না, আর এদিকে পিলপিল করে বেড়ে যাচ্ছে এরা, গরীবরা।

শুভেন্দু সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মৃদু মৃদু হাসে, বলে, এ কাজটাই করো না, র‍্যুরেল ওয়ার্ক, ঘরে ঘরে গিয়ে এদের বোঝাও না এ কথাগুলো। ইন্দিরা গান্ধী তোমাকে পুরস্কার দেবেন।

এষার গরম মাথা আরো গরম হয়।

তবে আয়া গিয়ে বলে আসার পরে কিন্তু সত্যি বাচ্চাটার কান্না অনেক কমে গেছে। আগে অনেকবার কাঁদতো, এখন গুনে গুনে চারবার কাঁদে। এষা হিসেব করে দেখেছে, সকালে সাতটার সময়ে একবার, দুপুরে বারোটার সময় একবার, বিকেলে চারটের সময়ে একবার আর রাত্তিরে বারোটার সময়ে আর একবার।

আয়াটি পুরনো, বয়স্ক, বম্বে থেকেই নিয়ে এসেছে। জাতিতে মহারাস্ট্রীয়ান হলেও এখন এদের সঙ্গে থেকে থেকে বাঙালীই হয়ে গেছে। দেখতে সুন্দর, স্নেহশীল, এষাকে শুভেন্দুকে খুব ভালোবাসে। স্বামী বহুকাল যাবৎ আর একটা বিয়ে করে পৃথক। একটি মেয়ে আছে. অনেকদিন বিয়ে হয়ে গেছে। বলা যায় এখন সে একান্তভাবেই একা মানুষ। এদের প্রতি টান পড়ে গেছে। তাই যখন চলে আসবার সময় এষা বললো, আয়া, তুমি আমার সঙ্গে চলো, আমি তোমাকে বছরে একবার বম্বে আসার খরচ দেবো, মেয়েকে দেখে যাবে, আবার টাকা পাঠাবো ফিরে আসবার জন্য।

সে গাঁইগুঁই করেছিলো বটে, বলেছিলো, তা কি হোয় দিদি, কোতোদূর—

কিন্তু এষা যখন বললো, দূর তো কী? তোমাকে ছাড়তে আমাদের ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, তোমাকে আমি নেবোই। আমার মা-বাবাও তো কত দূরে, ছেড়ে আছি না? আর এখানে তুমি থাকবে কোথায়? বাড়ি নেই, ঘর নেই, স্বামী নেই। না আয়া, তুমি আমার সঙ্গে চলো। ভেবো না কাজের জন্য বলছি, তোমার জন্যই আমি তোমাকে চাই।

অমনি সে দ্বিরুক্তি না করে রাজী হয়ে গেলো।

এর মধ্যে একদিন আবার এষা ভুরু কুঁচকে বললো, আচ্ছা আয়া, ছেলেটা আজকাল ওরকম গুনে গুনে চারবার কাঁদে কেন বলো তো?

গুনে গুনে চারবার কাঁদে? কই হামি তো জানে না।

জেনে এসো। এ কি অদ্ভুত, বাচ্চারা আবার হিসেব করে কাঁদে নাকি? এদের কাণ্ডই আলাদা। কে জানে কী করে!

ঠিক আছে, আজ হামি আবার সোব খোবর লিয়ে আসবো।

তা আনলো। বৌটি নাকি এ কান্নার শব্দও যায় শুনে লজ্জায় অস্থির। বলেছে, আমি তো সব সময়েই ওকে এখন ঘরে বন্ধ করে রাখি। এই একটাই তো ঘর? খুলতেই হয় মাঝে মাঝে দু-চারবার। চান করে বাইরে গামলায় বসে ওঠাতে গেলেই এমন হাহাকার করে কেঁদে উঠবে যেন মেরে ফেলছে কেউ। তখন ইচ্ছে করে সত্যিই পিঠে গুমগাম্ কয়েকটা লাগিয়ে দিই—

এইটুকু শুনেই এষা রাগে লাল, এদের কথাবার্তাই আলাদা, কেন গুমগাম্ লাগাবে কেন? ঠিকমতো করতে জানে না, সব অশিক্ষিত মা—আর দরজা বন্ধ করে রাখে ঐটুকু একটা বাচ্চাকে! দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে তো গরমে। ঘরে নিশ্চয়ই পাখা নেই—

ওই জন্যই দুধ খাওয়ার সোমোয় দোরজা খুলতেই হয়, ভারি ঘেমে যায়। আর দুধ খাওয়াতে যেতো কাঁদে—ওর মা বলে—

ওর মার কথা আমি শুনতে চাই না, ঐটুকু মেয়ে, নিজেই বাচ্চা, তার আবার বাচ্চা, সত্যি—

তুমি যে বোলছো গুনে গুনে বি চারবার কাঁদে, সেটা ঐ সোকালে দুধ খাওয়া, দুপুরে চান, বিকেলে দুধ খাওয়া আবার রাত্তিরে দুধ খাওয়া। ঐ চারবার হোলো না?

ঐ তিনবার দুধ খেয়েই থাকে নাকি? সব্বনাশ, আর কিছু খেতে দেয় না?

দেয়। যোখোন ভাত খায় তোখোন খুশি, আর ঝিনুকবাটিতে দুধ খায় তো? তোখোন কান্না।

কেন বোতল খায় না? সব বাচ্চা তো বোতলে খায়।

তা তো জানি নে।

জেনে আসবে অন্যদিন গেলে। যতো ঝঞ্ঝাট। শোনো, আর এও বলে আসবে, বাচ্চাকে যেন ওরকম দরজা বন্ধ করে রাখে না। ছি ছি—

তা না হোলে তো আবার বি ওরকম জ্বালাবে। সত্যি তো মাত্র চারবার কাঁদে না, দোরজা জানলা খোলে না বলেই শুনতে পাও না।

আবার তো হাসেও খিলখিল করে শুনি।

তা বোটে, দারুণ হাসে। আমি যেই যাবো উমনি ঝাঁপ মেরে কোলে আসবে। লিয়ে আসবো য়েকদিন।

খবরদার, ও কর্মটি করবে না, আমার কিন্তু ভীষণ খারাপ লাগে। বাচ্চাকাচ্চা আমি একদম পছন্দ করি না।

ওই তো তোমার দোষ দিদি, ওই জন্যেই তো কোল ভরে না—

ঠিক আছে, যাও। কোল ভরে দরকার নেই।

আসলে এযার শোবার ঘরটা যদি এদিকে না হতো এই যন্ত্রণা সহ্য করতে হতো না। কিন্তু বাড়ির মধ্যে এটাই দক্ষিণখোলা বড়ো ঘর, মাঝখানে খাবার ঘর বসার ঘর বাদ দিয়ে ঐদিকে উত্তর ঘেঁষে আর একখানা বড়ো ঘর। উত্তর দিয়ে কী হবে? উত্তরটা তো কোনো কাজের দিক নয়, লোকে দক্ষিণের ঘরই চায়। এষাও সেভাবেই গুছিয়ে নিয়েছে, ওটা রেখেছে গেস্ট রুম। এই বারো চোদ্দ মাসের পরের ছেলের যন্ত্রণায় যে এমন অবস্থা হবে কে জানতো। ছেলেটার সবটাই লাউড। যখন খেলবে হাসবে তার জোরও কান্নার জোরের চেয়ে একটু কম নয়। বুলি ফুটেছে, তার জোরও মারাত্মক। গোদা গোদা গলায় মাম্মা বাব্বা নেন্নে যখন করে সেও কানে আসে। সকালে বোধ হয় বাবার কোলে উঠে আদর খায়, কচি এবং পাকা গলার ফুর্তির আওয়াজে

কর্ণপটাহ বিদীর্ণ হবার দশা। তারপরেই হঠাৎ ঠাস ঠাস চিৎকার। নিশ্চয়ই বাবা কোল থেকে নামিয়েছে, নিশ্চয়ই তার কাজে যাবার সময় হয়েছে, দূর থেকে মোটা গলার টা টা শোনা যায়, নরম নরম মেয়ে গলায় লজ্জা লজ্জা কাঁচা আওয়াজও পাওয়া যায়, তাড়াতাড়ি এসো কিন্তু।

লোক দেখা যায় না অথচ সংসারের খুঁটিনাটি সব বোঝা যায় শব্দের ঝঙ্কারে, এ বড়ো অদ্ভুত। একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা। তবে সবই একটু একটু সয়ে এসেছে এষার, কিছু কিছু মেনেও নিয়েছে। ঐ বাচ্চার দিনযাপন বিষয়ে এখন মোটামুটি সব জেনে ফেলেছে, তার মা বাবা বিষয়েও অনেক কিছু বুঝে ফেলেছে। এই রকম ঃ ছেলেটা হেসে কেঁদে খেলে নেচে আধো আধো বাক্যের বোল তুলে সারাদিন ভরে রাখে বাড়িটা। মা আহ্লাদও করে, বকুনিও দেয়, বিরক্তও হয়, স্বর্গসুখও পায়। বাবা সারাদিন বাড়ি থাকে না, যতটুকু থাকে ছেলের সঙ্গে খেলে আর বৌকে ক্ষেপায়। বৌ সতেরো আঠারো বছরের মেয়ে, স্বামী তেইশ চব্বিশ বছরের ছেলে। কী চাকরি করে বা কোথায় তা জানে না। গ্যারেজের ঘরটি তাদের সাজানো গুছানো পরিপাটি। পদ্মা বলে, গেলেই ভালো লাগে, দেখেও সুখ হয়। আর বৌটি খুব খুশি হয়ে বসতে বলে, ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, এখন তো বাচ্চু একটু বড়ো হয়েছে, কাঁদে কম, খেলে বেশি, এখনো কি খুব অসুবিধে হয় ওনার? ওর বাবার বড্ড গলা, ছেলেও তেমনি—আমার যে কী লজ্জা করে—

শুনে নিয়ে এষা বলে, যাক মেয়েটার তবু একটু বুদ্ধিসুদ্ধি আছে।

এর মধ্যেই শোনা গেলো, বৌটি হাসপাতালে গেছে। এষা আকাশ থেকে পড়ে বললো, সে কী, এর মধ্যেই সময় হয়ে গেলো?

পদ্মা বলে, তা তো হোবেই, দেখতে দেখতে কোতো মাস বি কেটে গেলো।

ছেলেটাকে কে দেখবে?

তা তো জানি না। বাপই দেখবে।

ছেলেটাও আর ততো ছোটো নেই, বারো চোদ্দ মাসের ছেলে এই ছ'সাত মাসে বোধ হয় দু বছরের হয়ে এলো। পাকাও হয়েছে খুব। এখন তুরবুরিয়ে যে কত কথা বলে! সব শুনতে পায় এষা। আজকাল কাঁদেই না প্রায়। ওর মা ডাকে, বাচ্চু ঘুমুবে এসো। বাচ্চু বলে, নান্না, গুম্ না—

ওর মা ডাকে, বাচ্চু খাবে এসো। বাচ্চু বলে, নান্না, দুদ্ কাই না বাত—

ওর মা ডাকে, এসো মুখ ধুয়ে দিই। বাচ্চু বলে, নান্না, মুক দুই না—কেয়া কয়ি—

বোঝা যায় বাচ্চু অবাধ্য, সবটাতেই তার নান্না।

এষা বলে, বাপরে বাপ কী পাজী ছেলে, সবেতেই মাকে জ্বালিয়ে খায় দেখছি।

আবার যখন ওর বাবা বলে, বাচ্চু আপিস যাচ্ছি। বাচ্চু বলবে, নান্না উপিস দায় না।

ওর বাবা বলে, দুষ্টুমি করবে না, মার কথা শুনবে। বাচ্চু বলবে,

নান্‌না, দুতত্তু কই না, মা কতা সুনি না।

সব শোনা যায় কথাবার্তা। আজকাল সত্যি খুব কম কাঁদে। তবে বকর বকর সারাদিন। স্নান করার সময় খুব আনন্দ, জলে ছপর ছপর করে, অন্য-গ্রহের ভাষায় খুব উঁচু গলায় গান করে, আর মা যেই বলবে এবার ওঠো অমনি তারস্বরে চিৎকার—নান্‌না উঁতি না উঁতি না—

মা হাসপাতালে যাবার পরে সেই রাত্রে কী কান্নাই কাঁদলো। শুভেন্দু দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। এষার বিরক্তির শেষ নেই। উঠছে বসছে জল খাচ্ছে আলো জ্বালছে আর একেকবার শুভেন্দুকে ঠেলে তুলে বলছে, শোনো, কালই তুমি অন্য বাড়ি দেখবে—

ঘুম চোখে শুভেন্দু বলে, অন্য বাড়ি! কেন?

অসম্ভব। অসম্ভব। এ বাড়িতে থাকা অসম্ভব। সাধে কি আমি বাচ্চা-কাচ্চা চাই না! উঃ, কী কান্নাই কাঁদতে পারে ছেলেটা! এরকম পাড়া ফাটিয়ে কাঁদলে ঘুমুতে পারে কেউ তোমার মতো কুম্ভকর্ণ না হলে?

ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে সমানে বলতে থাকে, নান্‌না, মা কাতে দাই, আমি মা কাতে দাবো, আমি মা কাতে দাবো—

সারাদিন বাইরে থাকা বাবা, একটু খ্যালেট্যালে আদর করে লোফে সম্পর্ক এই পর্যন্ত, বাচ্চা রাখা কি তার কাজ? তার উপরে স্ত্রীকে নিয়ে সেদিন নিশ্চয়ই ধকল গেছে দিনের বেলা, চিন্তা গেছে, রাত্তিরে এখন এই ছেলের কাঁদুনি কত সহ্য করবে? চুপ! বলে প্রচণ্ড এক ধমকের শব্দ এষার কানে বোমা ফাটালো, তার সঙ্গে একটি চড়ের শব্দও ভেসে এলো। কাঁদুনিও থামলো। শুধু হেঁচকি টানাব আওয়াজ।

ওরে বাবারে আমি মরে যাবো। কানে আঙুল দিল এষা, কী ডাকাত বাপ, ওরে বাপরে, ছেলেটাকে মেরেই ফেলবে যা দেখছি। না, আমি বাড়ি বদলাবোই বদলাবো। ও যে কিছুই করবে না তা জানি। আমিই বেরুবো সকালে, যে করে হোক খুঁজে বার করবো একটা অন্য আস্তানা। এখানে সত্যি থাকা যায় না।

পরের দিন শুভেন্দু কাজে চলে গেলে এষা বললো, দেখে এসো তো আয়া, বাচ্চাটার সাড়াশব্দ পাচ্ছি না কেন?

পদ্‌মা গেলো। খবর হলো এই, ওর বাবা আপিসে যাবার সময় কার বাড়িতে কোথায় যেন রেখে গেছে।

এষা বললো, যাক বাঁচা গেছে, একটু শান্তিতে থাকা যাবে।

শান্তি কিন্তু ক্ষণস্থায়ী, বিকেলেই আবার কাকলি শোনা গেলো, বাবা আমি বাও!

বাবার জবাব, তুমি ভালো? বাববা তুমি ভালো হলে দুষ্টু কাকে বলে?

খটখট হাসি। কেন যে হাসে কেন যে কাঁদে কে জানে। বাচ্চাগুলো কী রে!

থামল হাসি, বাবা।

কী?

আমি দুততু। আমি কুব কুব কুব দুততু।

ঠিক। তুমি খুব খুব খুব দুষ্টু। আজ রাত্রে যদি কাঁদো তবে আরও দুষ্টু বলবো।

আমি কানি না।

একটুও না?

মা আচছে না কেন?

তুমি এত কাঁদো কেন?

আমি কানি না।

যদি আজ লক্ষ্মী হয়ে খাও ঘুমোও তবে মা খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে।

আমি কানি না, আমি কেয়ি, আমার বন্ কোতায়?

বল আমি দিচ্ছি, তুমি খেলো, আমি রান্না করি তোমার জন্যে।

এটা বিকেলের। রাত্তিরে আবার অন্য মূর্তি। একই রকম কান্না আর ঐ একই কথা—সে মাকে চায়, মায়ের কাছে যাবে শোবে। বাবার কাছে থাকবে না। বাবার কণ্ঠস্বরে একই রকম কর্কশ ধমক, চুপ। তারপর চড়।

এষা না ভেবে পারলো না, ঐটুকু একটা সতেরো আঠারো বছরের মেয়ে, যে নিজেই একটা বাচ্চা মাত্র, সেও মা হয়ে কী আশ্চর্য এক সমর্পিত প্রাণের অধীশ্বরী! কী সম্মান! কী সম্মোহন!

পরের দিন সকালেই যাবার ছিলো এক জায়গায়, পিসতুতো বোনের বিয়ে, থাকতে হবে সারাদিন। শুভেন্দু কাজের পরে গেলে একেবারে খেয়েদেয়ে একসঙ্গে ফিরবে। যাবার আগে নানা কথা বুঝিয়ে গেলো আয়াকে, এই যেমন দরজা বন্ধ করে রাখবে, কেউ বললেই খুলবে না, এক ফাঁকে রেশনটাও তুলে এনো, মালি ফাঁকি না দেয়, রজনীগন্ধার বাল্‌ব পোতা হয়েছে, জল দেয় যেন ইত্যাদি। তারপরেই একটু থেমে বললো, আর তোমার তো কোন কাজ থাকবে না সারাদিন, ইচ্ছে করলে ঐ বাচ্চাটাকে একটু দেখেও আসতে পাবো। আর ওর বাবা যদি রাজী থাকে বাড়িতেও নিয়ে আসতে পারো, বাগানে খেলবে। নিজের মা তো নেই কাছে, একজন মা পেলেই খুশি হবে। আর তোমাকে তো চেনেই, কোলে তো আসেই। থাকবে সারাদিন।

খুব খুশি পদ্‌মা, যাক, দিদির আমার দোয়া হয়েছে। তোমার হুকুম পেলাম, আর কী কোথা? হামি ঠিক লিয়ে আসবো বাচ্চাটাকে। ওর বাবাও বাঁচবে। কোথাও আর দিয়ে আসতে হোবে না। ওব মায়ের নাকি রেক্তো নেই, মেয়ে হয়েছে একটা, মায়েরই অবস্থা কাহিল, হাসপাতালে থাকতে হোবে য়েখনো আরো কোতোদিন তার মি ঠিক নেই।

বাব্বা, সব খবরই রাখো দেখছি।

বাচ্চুর বাবার সোঙ্গে যে রোজ দেখা হয় দুধের দোকানে।

তাহলে আর কি, তোমাকে তো চেনেই।

শুভেন্দুর সঙ্গেই বেরিয়ে গেলো এষা। কাটলো সেখানে সারাদিন।

খুব হুল্লোড় হলো। কতদিন বাদে দলবলের সঙ্গে একত্র হয়ে আড্ডা মেরে চমৎকার বয়ে গেলো সময়। ফিরতে দিতে কি চায়? বলছে, কাল মল্লিকা চলে যাবে, তুমি ওকে তুলে দিয়ে চলে যেয়ো। নতুন জামাইটি খুব সপ্রতিভ, তারও সেই আবদার। খুব ভাব হয়েছে। সেও বলছে, হ্যাঁ এষাদি, আমরাও কাল যাবো, আপনিও কাল যাবেন।

শুভেন্দুও বললো, তা থাকো না, কী হয়েছে?

কী হয়েছে তা কে জানে। এষা থাকবে না। মন তার বিকেল থেকেই উচ্চকিত হয়েছে বাড়ির জন্যে। কেবলই মনে হয়েছে তার যাওয়া দরকার। একান্ত দরকার। না গেলে একটা কিছু যেন হয়ে যাবে। কী যেন একটা দায়িত্ব রেখে গেছে বাড়িতে।

পথে আসতে আসতে শুভেন্দু বললো, তুমি বড়ো জেদি হয়ে গেছো। তোমার পিসিমা এমন করে বলছিলেন, আমার বেশ খারাপ লাগছিলো।

এষা জবাব দিলো না। কিন্তু বাড়ি এসেই চিৎকার, আরে, আমার ড্রেসিং টেবিল ঘেঁটেছে কে?

আয়া বললো, ঐ তো, বাচ্চাটাকে লিয়ে এলুম না, ধদ্ধর করতে করতে ছুটে এলো এখেনে, সে যদি দেখতে, আয়না দেখে হাসি তো হাসি টেনে নিতে নিতে চলে গেলো তোমার ঘরে, বিছানায় উঠে গড়াগড়ি, চেনা নেই অচেনা নেই, কী দুষ্টু মাগো মা, খুব মিঠাও দিদি, বকা মারা যায় না।

না না, বকবে মারবে কেন? পরের ছেলে, একটু দেখে রাখবে তো?

হাত দিয়ে টেবিলটা ঠিক করলো একটু, বিছানাটা, ঝাড়লো একটু, শুয়ে পড়লো তাড়াতাড়ি।

পরের দিন ব্রেকফাস্ট করে প্রত্যেক দিনের মতো শুভেন্দু কাজে চলে গেলে আয়া বললো, দিদি, আনবো নাকি বাচ্চুকে?

বিরক্ত ভাব দিয়ে এষা বললো, তুমি জানো। রাখতে পারলে আনবে। আমার কী?

খুব খেলে তো, রাখতে বি কোনো কোষ্টো নেই, লিয়ে আসি? ওর বাবা জিজ্ঞেস করছিলো, বিরক্ত কোরেনি তো? হামি বোললাম, বিলকুল না। ঐ যা একবারই তোমার টেবিলে এসে কোন্ ফাঁকে পাউডার ফেলেছে, বিছানা ধামসেছে—

যাক গে আজ যেন আবার আমার বিছানায় না আসে, শেষে কী নোংরা-টোংরা করে দেবে।

দৌড়ে আনতে গেলো আয়া, মনোযোগ দিয়ে বই পড়তে লাগলো এষা। ছেলেটা এলে কী হুল্লোজাতি করবে কে জানে। যা দুরন্ত। তাকে দেখে ভয় পাবে, না কাছে আসবে তাই বা কে জানে। ঐ সব বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে আধুক-আধুক করতে পারবে না সে। ওসব তার ধাতে নেই।

আজকে এলে গেস্ট রুমে আর ঢাকা বারান্দাতেই আটকে রাখতে বলবো। পদ্মা পারেও! এতো বাচ্চা ভালোবাসে! ওর হওয়া উচিত ছিলো সাতটা

বাচ্চা, অথচ মাত্র একটা। বম্বেতেও শুনেছে, সে আর শুভেন্দু কাজে বেরিয়ে গেলেই নাকি যতো পাড়ার বাচ্চা এনে হাজির করতো।

এষা আগাথা ক্রিস্টির গোয়েন্দা গল্প পড়ছে। গোয়েন্দা গল্পের পোকা সে। সেই গল্পে একবার চোখ দিলে আর ভবসংসারে কিছু জ্ঞান থাকে না। কিন্তু হঠাৎ সচকিত হয়ে খেয়াল করলো, একটা পৃষ্ঠাও পড়ে উঠতে পারেনি এতোখানি সময়ের মধ্যে। কী আশ্চর্য, ছেলেটা তো কম বিচ্ছু নয়, রীতিমতো কর্মনাশা। কে খুনী তা না বার করে ঐ পুঁচকেটার কথা ভাবছি।

কিন্তু পদ্মা এখনও আসছে না কেন? এতো গপ্পোবাগীশ, নিশ্চয়ই ওর বাবার সঙ্গে গপ্পে বসেছে। বাবাও মজা পেয়েছে ছেলে গছাতে পেরে। না পাঠালেই হতো। সেই যন্ত্রণা। ভুরু কুঁচকে আবার মন দিলো বইতে। যার এতো কান্না এতো হাসি এতো বুলি শুনেছে সেই শিশুকে দেখতে একটু একটু কৌতূহলও হচ্ছিল বৈকি। পদ্মা বলেছে এক বছর দশ মাস বয়েস। এষার কোনো আন্দাজ নেই এক বছর দশ মাসের ছেলেরা ঠিক কতো বড়ো হয়। এসে আবার ভুলে তাকেই মা-মা না ডেকে বসে। তা হলে লাগাবে এক থাপ্পড়। বাচ্চাদের কথা কিছু বলা যায় না। আর এই ছেলে যা গায়ে-পড়া। আপন নেই পর নেই সবার কাছে যাবে, শোবার ঘরে ঢুকবে বিছানা বালিস এলোমেলো করবে, কালকে পদ্মা যতোই টান করুক বেডকভার, বালিস চাদর ভারি ইথে হয়েছিলো, শুতে বেশ অস্বস্তি হয়েছে। কে জানে কতক্ষণ ছিলো, হয়তো ঘুম পাড়িয়ে এখানেই শুইয়ে রেখেছিলো, পদ্মার কথা কিছুই বলা যায় না। এখন ভয়ে অস্বীকার করছে। এষাকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন, এষা শুভেন্দুর মতো নয় যে শুলো আর ঘুমোলো, অনেকক্ষণ জেগে থেকে টেবিল-ল্যাম্প জ্বালিয়ে বই পড়ে, তারপর ঘুমোয়। বালিসে রীতিমতো বাচ্চা-বাচ্চা গন্ধ পেয়েছে! শিশুর গায়ের গন্ধ সে জানে না সেটা ঠিক তবু এখন অনেক কিছু আছে জগতে যা না জানলেও মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে ঘা দেয়। সে অনুভূতি জন্মজন্মান্তর ধরে মনের মধ্যে মিশে থাকে। সেই ইন্দ্রিয় দিয়েই এষা শুঁকে শুঁকে দেখেছে হুবহু বাচ্চার গন্ধ লেগে আছে বালিসে।

বইয়ের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা উল্টালো, তারপর হঠাৎ আবার বন্ধ করে দিলো। শেষে হাই তুলে, আড়মোড়া ভেঙে, জানলায় এসে তাকিয়ে রইলো বড়ো রাস্তার দিকে। খানিক বাদেই দেখা গেলো পদ্মার মাথাঠা শাড়ির আঁচল উড়ছে। ঐ তিনি আসছেন দয়া করে। খুব বকবে এলে। বাচ্চা দিয়ে কি তার বাবা এষার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করছে নাকি যে এতোক্ষণ ধরে পরের বাড়ির আয়াকে আটকে রেখেছে? বিপদে পড়েছে বলেই দয়া করে এখানে রেখে যেতে বলা হয়, অমনি আস্পর্ধা পেয়ে গেছে। আজ আছে আসুক, আর নয়। গলা দিয়ে যার দিনরাত সিংহনিনাদ উত্থিত হচ্ছে শ্রীমানকে দেখি একবার, ব্যস, এই শেষ।

জানলা থেকে সরে এলো। হাতেপায়ে কেমন একটা অস্থিরতা। মনটা অকারণে ছলছল করছে। অকারণে ভরা-ভরা লাগছে—প্রত্যাশিত কিছু যেন পেয়ে যাচ্ছে হাতের নাগালে। উত্তেজনা সংযত করে আবার সে আগাথা ক্রিস্টি

হাতে নিলো। নিয়েই মনে হলো যা ডাকাত ছেলে, এসে আবার বই ধরে না টান দেয়। ঘরভর্তি তো ছড়ানো বই, কে জানে কোন্‌টার পাতাটাতা ছিঁড়ে দেবে, বকবে এসে শুভেন্দু। শুভেন্দুর আর কি! সারাদিন বাড়ি থাকবে না, কেবল কম্পিউটার আর কম্পিউটার, এসে চ্যাঁচামেচি করলেই হলো। বাচ্চাটাচ্চা ঘরে থাকলে যে গোলমাল হবেই, তা সে বুঝবে নাকি?

ছায়া পড়লো দরজায়। আয়া এসেছে। বই থেকে চোখ তুলছে না এষা, শুধু অনুভব করছে। গম্ভীর গলায় বললো, শোনো, শোবার ঘরে যেন চ্যাঁচামিচি না হয়, গেস্টরুমে নিয়ে যাও, খেলাটেলা দাও। বরং মনোহারী দোকানটায় গিয়ে বলটল বা বন্দুক যা চায় কিনে দাও, ঐ নিয়ে থাকবে। দু'পাতা ক্যাডবেরিও সেই সঙ্গে কিনে এনো, কান্নাকাটি করলে দেবে। আর হ্যাঁ, দুধটুধ কখন কি খায়—

না দিদি—

এতক্ষণে চোখ তুললো এষা, কী?

বাচ্চু আসেনি।

আসেনি? আসেনি? কেন?

চলে গেলো।

চলে গেলো? কোথায়?

বাচ্চুর মামা এসেছে, নিয়ে গেলো বাচ্চুকে, বাচ্চুর মা হাসপাতাল থেকে বাপের বাড়ি কাশীপুর না কোথায় সোজা চলে যাবে। পাঁচ-ছ'মাস থাকবে, আর বাচ্চুর বাবা ততদিন মেসে থাকবে। তাই বাড়ি তুলে দিলো।

ও—এষা আবার চোখ নামালো। বইয়ের অক্ষরগুলো প্রথমে ঝাপসা ঝাপসা দেখালো, তারপরে হঠাৎ ভোজবাজির মতো ধু-ধু এক সাহারা মরুভূমি। সে মরুভূমি যেমন শুষ্ক তেমনি তপ্ত। তেমনি হতাশায় ভরা। এষা বুঝতে পারলো, এ মরুভূমি সে কোনোদিন পার হতে পারবে না। কোনোদিন না।

নিখাত সোনা

যে ভদ্রমহিলা আমাকে তাঁর বাড়িতে বৈকালিক চায়ে যেতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানিয়ে মেয়ের হাতে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন, তাঁকে আমি চিনি না কিন্তু দেখেছি।

সাধারণত গ্রীষ্মকালে এবং শরৎকালে এই দুই ঋতুতেই দার্জিলিংয়ে এসে কয়েক দিন সম্পূর্ণ বিশ্রামে কাটিয়ে ফিরে যাওয়া আমার বরাবরের অভ্যেস। অর্থাৎ যে ক'বছর যাবত দেশে এসেছি এর মধ্যে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। এখানে আমার পিতামহর বাড়ি আছে। তিনি এখানকারই বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ও ডাক্তার ছিলেন আমার মতো। অথবা আমিই তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ডাক্তার হয়েছি। পশার ছিলো একচেটিয়া, প্রভূত অর্থ উপার্জন করে গেছেন, বাড়িটি প্রায় প্রাসাদ। এখন তিনি আর ইহজগতে নেই, তাঁর স্ত্রী পুত্রও নেই, আছে শুধু এই বাড়িটা আর তাঁর উত্তরাধিকারী আমি।

আমার বাবা তাঁর একমাত্র সন্তান। তাঁকে বিলেত পাঠিয়েছিলেন ব্যারিস্টারি পাশ করতে। তিনি আর ফিরলেন না। পাশ-টাশ করে সেখানেই প্র্যাকটিস জমালেন, সেখানেই বিবাহ করলেন, সেখানেই সেটেল্ করলেন। তবে আমার মা বিদেশিনী ছিলেন না, বাঙালী। যদিও নামেই। কেননা আমার মায়ের বাবা সেই দেশেরই স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। এবং তাঁরা সকলেই খুব সাহেবভাবাপন্ন। মা মারা যান আমার পনেরো বছর বয়সে। আর বাবা গেলেন যখন আমি ছাব্বিশ ছাড়িয়ে সাতাশে পা দিয়েছি। বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন তিনি।

আমার দাদু ঠাকুমাকে বঞ্চিত করে এদেশেই থেকে যাবার দরুণ শেষের দিকে বাবার মনে ভারি একটা কষ্টবোধ কাজ করছিলো। মায়ের মৃত্যুর পরে একবার ফিরে যাবার চেষ্টাও করেছিলেন, হয়নি। ঐ বয়সে নতুন করে গিয়ে হঠাৎ অতিথির মতো আবার কোথায় বসবেন কী করবেন, এই ভেবে ভেবেই যাওয়া স্থগিত হয়ে গেলো। তা ব্যতীত কন্যা বিয়োগে শোকার্ত শ্বশুর শাশুড়ির তিনিই ছিলেন অবলম্বন। আমার দুজন মামা ছিলেন বটে তবে তাঁরা কেউ কাছে ছিলেন না। একজন একটি ডাচ মেয়েকে বিয়ে করে জার্মানীতে বাস করতেন, আর একজন একটি ফরাসী মেয়ের পাণিগ্রহণ করে সেখানেই চলে যান। বলা যায় নিজেদের নিয়েই তাঁরা ব্যতিব্যস্ত, সেখানে পিতামাতার স্থান ছিলো না।

বাবা অল্পবয়সে এঁদেরই মতো যৌবনের জোয়ারে আপন পিতামাতাকে ভুলে নব বিবাহিত স্ত্রী পুত্র এবং পশার নিয়ে যে রকম মেতে থাকতে পেরেছিলেন বেশী বয়সে বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ির দিকে তাকিয়ে তা পারলেন না। তাছাড়া আমার দাদু ঠাকুমাকে নিয়ে দু-চার বছর বাদে বাদেই এসে আমাদের সঙ্গে কয়েক মাস করে থেকে যেতেন। বাবাও দু-একবার যেতেন। দাদুর ইচ্ছেতেই বাবা আমাকে ডাক্তারী পড়িয়েছিলেন।

বাবা মারা যাবার পরে সেই শোক সহ্য করতে না পেরে প্রথমে মারা গেলেন আমার ঠাকুমা, তারপর বছর দুই তিনের মধ্যে দাদামশায় আর দাদুও গেলেন, দুঃখ ভোগ করতে বেঁচে রইলেন দিদিমা।

আমার প্রবাসী জীবনে কোনো আগ্রহ ছিলো না। বাড়ি বিক্রী করে একদিন আমি চলে এলাম আমার স্বদেশ ভূমিতে। এতোকালের বাসস্থান ছেড়ে দিদিমা আসতে চাননি, কিন্তু আমাকে ছেড়ে আসতে পারবেন না বলে এলেন। বিদেশী প্রথায় জীবন যাপন করে এটা বুঝেছেন সেখানে কেউ কারো নয়, মাঝখান থেকে আমার মতো একজন অনুগত নাতিকে ছেড়ে দেওয়া মোটেও বুদ্ধিমতীর কাজ হবে না।

আমি ওখানেই জন্মেছি, ওখানেই বড়ো হয়েছি, ওখানেই লেখাপড়া শিখেছি, পাশ করেছি, কাজ শুরু করেছি, তবু কী আশ্চর্য, আমার মন সর্বদাই আমার মাতৃভূমির প্রতি ধাবিত ছিলো। মা বাবা চলে যাওয়া মাত্রই মনস্থির করতে একদিনও সময় লাগেনি আমার। অবশ্য তখনো অবিবাহিত ছিলাম, নৈলে কী হতো বলা যায় না। বিবাহ বিষয়েও আমার মনে কতোগুলো অদ্ভুত কল্পনা ছিলো। সেই কল্পনার সঙ্গে এ দেশের কোনো মেয়ের একবিন্দু মিল ছিলো না। এমন কি আমার বাঙালী মা দিদিমার সঙ্গেও না। আমার মনে বাঙালী মেয়ের যে চেহারা অঙ্কিত ছিলো তা অন্য রকম। এই ছবি আমাকে কে দেখিয়েছিলো কে জানে। মনে হয় অবোধ বয়সে আমার বাবাই আমার এ বিষয়ের গুরু। আমার বাবাই বাঙালী মেয়ের চলন-বলন চেহারা চিন্তা সব বিষয়েই এক দেবদুর্লভ বর্ণনা পেশ করতেন তাঁর বিদেশী বন্ধুদের কাছে, আমি গা ঘেঁষে বসে শুনতাম, সেটাই মগজে বীজ হয়ে রোপিত হতো। মা আমাকে ছাড়া ছাড়া ভাবে মানুষ করতেন, দরকার মতো প্লে পেনের মধ্যে আটকে রেখে বেরিয়ে যেতেন, ঘুমের সময় হলে পোশাক পরিয়ে, নির্দিষ্ট শয্যায় শুয়ে থাকতে বাধ্য করতেন, খাওয়া নিয়ে গোলমাল করলে সাধ্য সাধনা না করে প্লেটসুদ্ধ খাবার তুলে দিতেন ফ্রীজে, হাজার আবদার করলেও নিজের সঙ্গে বেড়াতে নিয়ে যেতেন না, বন্ধু বান্ধব এলে ঢুকতে দিতেন না সেই ঘরে, কিন্তু বাবা অন্য রকম। বাবা আমাকে নিয়ে শুতেন, বেড়াতেন, খেতেন, গা ঘেঁষে বসে থাকতে দিতেন, আমার মন তাই সব সময় বাবা বাবা করতো। আমাকে মা ড্যাডি ডাকতে শিখিয়েছিলেন, বাবা বলতেন, ধ্যেৎ, ড্যাডি আবার কি? ও সব আমার ভালো লাগে না, আমাকে বাবা ডাকবি। বাবা আমাকে তুই বলতেন, মা বলতেন তুমি। অবশ্য এই তুই তুমির তফাৎ বেশির ভাগ সময়েই ইংরেজি

ভাষার অন্তরালে চাপা পড়ে থাকতো। শুধু বাংলা বললেই এই তারতম্য। বাবা সব সময়েই বাংলা বলতেন, মা সব সময়েই ইংরেজি। বাবা বাংলা আর দিদিমা বাংলা—এই দুজনের বাংলা শুনে শুনেই আমার যতোটুকু বিদ্যা। বস্তুত ইংরেজিই আমার মাতৃভাষার স্থান দখল করেছে। আমার উচ্চারণও সেই ভাষাতেই দক্ষ, মাতৃভাষায় নয়।

তবু 'আমি বাঙালী' এই শব্দটাই বুকের মধ্যে পুষে রাখতাম। ঐ কারণেই ন্যান্সিকে বিয়ে করিনি। শুধু ন্যান্সি কেন, ফ্যানি, হিলডা এরা অনেকেই আমার গলায় মালা দিতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে। সবাই বলে আমি সুপুরুষ এবং এ্যাট্রাকটিভ। হবে। নিজে ঠিক বুঝি না। যা বুঝি তা হচ্ছে আমার ছাত্রজীবন। সেই সব সিঁড়ি আমি হাঁপাতে হাঁপাতে ডিঙোইনি, বড়ো বড়ো পা ফেলে অনায়াসে উঠে গেছি। প্রতিটি পরীক্ষার নম্বর এতোটাই উঁচুতে উঠে থাকতো যে সাদা চামড়ার ছেলেদের চোখ টাটাতো, মেয়েদের প্রতিযোগিতার লাইন লম্বা হতো, মাস্টারমশাইরা যুগপৎ স্নেহ ও সম্মান বিতরণে অকুণ্ঠ হতেন। আর আমার বাবা! আমার সাদাসিধে বাঙালী বাবা! তাঁর ফুর্তির ঢেউ আমাকে অকূলে ভাসিয়ে নিয়ে যেতো।

স্বদেশে এসেছিলাম তিরিশ বছর বয়সে। দার্জিলিংয়ে ম্যালের কাছাকাছি দাদুর বিশাল বাড়ি বেগম ভিলার অধিপতি হয়ে সেখানেই ডাক্তার হয়ে বসবো অথবা কলকাতায় চেম্বার খুলবো ঠিক করতে পারছিলাম না। আমাদের ছোটো পরিবার তাঁদের ছোটো আয়ু নিয়ে দিদিমা ব্যতীত সকলেই চলে যাওয়ায় বান্ধব বর্জিত আমি গুরুজন পরিবৃত হয়ে যে কোন বুদ্ধি পরামর্শ করবো তারও উপায় ছিলো না। আমি এখানে নতুন বাসিন্দা, আমার তিরিশ বছরের দেহে মনে এখানকার কোনো ঋতুই ছায়া ফেলেনি। শিকড়বিহীন গাছের মতো ঘুরেছি এদিক ওদিক।

প্রথমে কলকাতা এসে হোটেলে উঠেছিলাম। কিছু দিন বাদে স্টেট্‌সম্যানে এক বিজ্ঞাপন দেখে দুম করে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে বাড়ি কিনে ফেললাম একটা। পুরনো আমলের বেশ হাত পা ছড়ানো বড়ো বাড়ি। দিদিমা বললেন, দুজন তো মানুষ, কি হবে এতো বড়ো বাড়ি দিয়ে, বরং সামনে বাগানের দিকের ঘরগুলোতেই তোমার চেম্বার করে ফ্যালো না।

বুদ্ধিটা মনে ধরলো। সাজিয়ে গুছিয়ে বসে গেলাম সেখানে। দার্জিলিং আমার দ্বিতীয় বাসস্থান হলো। দুটি বাসস্থানকেই আমি সযত্নে রক্ষা করি। আমার সার্কুলার রোডের বাড়িটিও লোকে বলে দেখার মতো, এখন দার্জিলিংয়ের পড়ে থাকা বেগম ভিলা বাড়িটিও বলে দেখার মতো। বেগম আমার ঠাকুমার নাম ছিলো। বেগমের মতোই দেখতে ছিলেন তিনি।

দুই বাড়িতেই মালি রেখে এমন সুন্দর বাগান করেছি, সবজির ক্ষেত করেছি যে পথিকও দু দণ্ড দাঁড়িয়ে দেখে চোখ জুড়িয়ে চলে যায়। প্রজাপতির ভিড় লেগে যায় মধু খেতে। পশার জমাতে দেরি হয়নি। দু বছরেই লাল।

তারপর থেকে সময় কোথায় অন্য দিকে তাকাবার। উন্মাদের মতো

পড়াশুনো করি, উন্মাদের মতো প্র্যাকটিস করি, উন্মাদের মতো উপার্জন করি, উন্মাদের মতো ডুবে থাকি বাড়ি ও বাগানের সেবায় আর শোভায়।

বন্ধুও হয়েছে কয়েকজন। সত্যিকারের বন্ধু। যারা আমাকে ভালোবাসে এবং আমিও যাদের ভালোবাসি। আত্মীয়ও বেরিয়েছে দুচার ঘর, তারা আমাকে যত্ন করে, খাতির করে, নেমন্তন্ন করে। এই আত্মীয়তাও আমার খুব ভালো লাগে। আমিও তাদের ডাকি, আদর করি, সময় সুযোগ মতো উপঢৌকন দি। আমার নাম অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়। বিলেতে এ্যানি চ্যাটার্জি ছিলাম।

এখানে এসে এই অনিমেষ চট্টোপাধ্যায় নামেই ডাক্তার হয়েছি। রোগীরা, রোগীর অভিভাবকেরা নিশ্চয়ই এই বাঙালী কাণ্ডকারখানার জন্য আমাকে ক্ষমা করতো না। কিন্তু আমি যে গড়গড়িয়ে বাংলা বলতে পারি না, উচ্চারণ একটু ট ট মার্কা তাতেই অনেকটা পাপ ধুয়ে গেছে। তার উপরে চেহারা নাকি সাহেব সাহেব। তার উপরে কয়েক দিনের মধ্যেই জেনে ফেলেছে জন্ম কর্ম বিলেতে, ব্যস, আর যায় কোথায়, ডক্টর এ. চ্যাটার্জী না হলেও তারা ঘাবড়ায় না। অনিমেষ চাটুয্যেকেই ডাকে।

আমার ভীষণ বাঙালী হতে ইচ্ছে করে। আমার ধুতি পরতে ইচ্ছে করে, হাতে মেখে ভাত খেতে ইচ্ছে করে, দাওয়ায় বসে গল্প করতে ইচ্ছে করে, কিন্তু সে ইচ্ছে কোন রকমেই পূরণ হয় না। আমি ধুতি পরতে পারি না। অনেক কিনে এনেছি, থরে থরে সাজানো আছে আলমারিতে, শয়নকক্ষে দাঁড়িয়ে আয়নায় দেখে দেখে প্রায়ই চেষ্টা করি, হয় না ঠিক মতো। কোমরে বেল্ট বেঁধেও ভয় হয় খুলে পড়ে যাবে। অজ্ঞান বয়েস থেকে কাঁটা চামচেতে খেয়ে হাত দিয়ে খেতেও ভীষণ অসুবিধে হয়। আর দাওয়ায় বসে গল্প? তার চেয়ে বাঘের দুধ খুঁজে পাওয়া সহজ। সুতরাং মনের তলায় বাসনা মনের তলাতেই ঘুমিয়ে থাকে। সময় সাংঘাতিক কম। অভ্যাস করার মতো একটি দণ্ডও সেখানে দুর্লভ। 'বাংলার বধূ মুখে তার মধু' বৌও খোঁজার সময় হয়নি। পাবোই বা কোথায়? যাদের চিনি তারা সব অন্য রকম। আমার কল্পনার সঙ্গে কিছু মিল নেই তাদের।

এখন আমার বয়েস আটতিরিশ, জুলপীর চুল একদম পাকা, মাথার চুল যদিও কালো। বেশ আছি। বন্ধু বান্ধবী আত্মীয় রোগী সিগার মদ বাগান কনফারেন্স মিটিং কনসালটেশন সব মিলিয়ে কাজের ঠাসবুনোট। একটা খোপের মধ্যে আটকে আছি যেন, বেরুবার দরকারও নেই, হয়তো বা পথও নেই। বলা যায় একেবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ খোপ।

ভদ্রমহিলাকে বছর চার-পাঁচ আগে প্রথম দেখি। ম্যালের বেঞ্চিতে আনমনে বসে ছিলেন আর মেয়েটি ছুটোছুটি করে খেলছিলো। একেবারে ছবি। ভালো লেগেছিলো। ভেবেছিলাম আমারই মতো আগন্তুক, ঋতুর পাখি। আবার ফিরে যাবে গন্তব্যে। তারপর একবার কে যেন বলেছিলো, আগন্তুক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, তবে চলে যাবার কোন জায়গা আছে কিনা সন্দেহ।

মানে ?

মানে এখানে এসেছে চাকরি নিয়ে, নানা লোকে নানা কথা বলে।

নানা কথাটা যে কি এটা জানতে আমার কোনো কৌতূহল হয়নি সেজন্য জানাও হয়নি। কিন্তু হঠাৎ তিনি আমাকে কেন চায়ের নিমন্ত্রণ করে ডেকে পাঠিয়েছেন বোঝা যাচ্ছে না। মেয়ে তো তাঁর এখনো বিবাহযোগ্যা হয়েছে বলে মনে হয় না। বড়ো জোর তেরো কিম্বা চোদ্দ। তা-ও হবে না। বাড়ন্ত গড়ন, মুখখানা তো একেবারে কাঁচা, কচি। কি সুন্দর মেয়ে!

খুব আশ্চর্য, এই মেয়েকে কিন্তু আজকাল দার্জিলিং এলে কখনো কোথাও দেখি না। মেয়েকেও না মেয়ের মাকেও না। সেই কতো দিন আগে ঝাপসা ঝাপসা দু-একবার ম্যালের রাস্তায় যতোটুকু দেখা। আমি তো দার্জিলিংয়ের বেশ একজন হর্তাকর্তা ব্যক্তি। অর্থাৎ এখানকার বাঙালী সমাজ আমাকে তাই বানিয়েছে। আমি যে তাদের কতো কিছুর মেম্বার, কতো সভার প্রধান, কতো সমিতির পৃষ্ঠপোষক নিজেই জানি না। আসি তো মাত্র দু'বার, থাকি তো মাত্রই কয়েকটা দিন তারই মধ্যে শহরের প্রভাবশালী লোকেদের ভিড় প্রত্যেক সকালে আমাকে ব্যস্ত করে রাখে। অমনি মিটিং ডাকা হয়, নিয়ে যায় সভাপতি করে, সুন্দরী বালিকারা গলায় ফুলের মালা দেয়, তারপর তাঁরা আমাকে দিয়ে তাঁদের কাগজপত্র সই করিয়ে নেন, বলেন, আপনার সই ছাড়া কি আমরা কিছু করতে পারি! আমোদ বলুন, আহ্লাদ বলুন, দুর্গাপুজো কালীপুজো সমাজের ভালো মন্দ, সমিতির উন্নতি সবই তো আপনার অনুমোদন নিয়ে করি আমরা। এই বলে হিসেব দেখান, চাঁদা চান। আমিও দরাজ হাতে দিই।

আমার ভালোই লাগে এ রকম দলবদ্ধ জীবনের সঙ্গে সংশ্রব রাখতে। আত্মীয়তার স্বাদ পাই। এঁরাও বলেন, আপনি (অথবা তুমি) হলেন (অথবা হলে) আমাদের ডাক্তার দাদার নাতি, আপনি তো আমাদের। আপনার উপর আমাদের প্রত্যেকের দাবী আছে। কলকাতা আছে কর্মোপলক্ষে, কিন্তু দেশ বলতে এটাই। জন বলতে আমরাই। আমি বলি, নিশ্চয় নিশ্চয়।

দেবকান্তবাবু এখানকার অবস্থাপন্ন লোক, জলপাইগুড়ির মানুষ কিন্তু ব্যবসা নিয়ে তিন পুরুষের বসবাস দার্জিলিং শহরে। তাঁর ভারি সখ আমাকে জামাই করেন। সখ অবশ্য যাঁর মেয়ে আছে তাঁরই। যে কদিন আছি এ একটা কম উৎপাত নয় আমার পক্ষে। চিঠিও পাই অনেক কলকাতা ফিরে গিয়ে। এঁদের মতে পাত্র হিসেবে আমার তুলনা বিরল। বিলেতে থেকেছি সেটাই তো মস্তো সার্টিফিকেট, তার উপরে এতো বড়ো ডাক্তার, তার উপর মাতামহ পিতামহ এবং পিতা সকলের অর্থ বিত্তের একমাত্র অধিকারী, তার উপর নিজের উপার্জনের সীমা নেই, অনেকে তাঁদের মেয়েদেরও লেলিয়ে দেন, মেয়েরা নিজেরাও কম বেগে ধাবিত হয় না, এ অবস্থা আমার এখানেও কলকাতাতেও, কিন্তু আমার কারো প্রতিই প্রেম হয় না, শারীরিক ভাবে পর্যন্ত কোনো উত্তেজনা হয় না। যদিও মেয়েরা সেভাবে উত্তেজিত করতে

যথেষ্ট উদ্যম খরচ করে। অর্থাৎ আমাকে পতিরূপে পেতে তারা এ-ওর প্রতিযোগী হয়ে সব কিছু করতেই রাজী। আমি দেখেছি মেয়ে বিষয়ে বরাবরই আমি বেশ নিস্পৃহ। এই অনীহা অবশ্যই স্বাস্থ্যসম্মত নয়। কী করা যাবে, কাউকেই যে পছন্দ হয় না, ভালো লাগে না। সবচেয়ে খারাপ লাগে এদের বিলিতি নকল। বিশ্রি। বিশ্রি। নকল সব ক্ষেত্রেই সমান বিরক্তিকর। সব দেশেরই একটা আলাদা ঐতিহ্য আছে, বৈশিষ্ট্য আছে, ব্যক্তিত্ব আছে, বাঙালী মেয়েরা এ রকম কেন? আমি জাপানে গিয়েছি, চীনের মানুষ দেখেছি, দেখলেই বোঝা যায় কার দেশের কোন্ কালচার। শুধু এরাই যেন কেমন।

দেবকান্তবাবু আট বছর ধরে একই আশা শোষণ করে যাচ্ছেন হৃদয়ে, মেয়েকে অবিবাহিত করে রেখে দিয়েছেন। বয়েস কিন্তু কম হয়নি। কিন্তু মিথ্যে করে কমিয়ে বলেন। বিয়ে হবে কী? যা বাছ বিচার! কোনো পাত্রই তাঁদের পছন্দ হয় না। কোনো পাত্রই নাকি তাঁর মেয়ের যোগ্য নয়। একটি ছেলেকে সব রকমে পছন্দ হয়েও হলো না। রং তার শ্যামলা। বলে বেড়ান মনের মতো ছেলে পেলে মেয়েকে তিনি সোনা দিয়ে মুড়ে দেবেন। দশ হাজার টাকা পণ দেবেন। কার্সিয়াংয়ের বড়ো বাড়িটা যৌতুক দেবেন।

আর মেয়ে? মেয়ে সে তো দেখছেই সকলে, এমন দুধের মতো রং আর ননীর মতো গড়ন ক'জন মেয়ের হয়? দেবকান্তবাবু আরো বলেন, আমি আরো দেবো, কথা দিলে, ডাক্তারবাবুর নাতিকে পেলে দশ বছর অপেক্ষা করবো, কুলে শীলে সৌন্দর্যে অর্থে বিত্তে যোগ্যতায় কৃতকার্যতায় এমন পাত্র একশো বছরে একটা হয়। সম্ভবত সেই অপেক্ষাই করছেন।

দিদিমা বলা যায় সারা গ্রীষ্মটাই থাকেন এই ঠাণ্ডার দেশে। গরম একেবারে সহ্য করতে পারেন না। সেজন্য ছ'মাস পাহাড় আর ছ'মাস সমতল। দিদিমাকে খুব দেখাশুনো করেন ওঁরা, দেবকান্তবাবুর মেয়ে এসে অযাচিত ভাবে অনেক সেবা করে যায়, আমার জন্যে নির্দিষ্ট গুছোনো ঘর আবার গুছোয়। দিদিমা খুব খুশি। বলেন, বোকা ছেলে। চুল তো পাকলো আর কি পাবি এ রকম মেয়ে? আমাকে যে কতো করে ওরা সবাই মিলে তার তুলনা নেই। একটা কৃতজ্ঞতাও তো আছে?

সেটা সত্য। আমার দিদিমাকে ওরা যে এমন ভাবে দেখাশুনো করেন সেজন্য আমার নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। থাকতামও যদি না জানতাম এতো বিছুর পিছনে ওদের একটা স্পষ্ট উদ্দেশ্য কাজ করছে।

এই শহরের বেশ বড়ো-সড়ো বাঙালী সমাজটির বিধানকর্তা দেবকান্তবাবু। মনে হয় অত্যন্ত পিউরিটান, যদিও থাকেন বেশ হালে চালে। লরেটোতে পড়া মেয়ে সাজসজ্জায় দুরন্ত, মুখে ইংরেজি বুলির খই ফোটে, ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশায়ও যথেষ্ট স্বাধীন, অন্তত তার সঙ্গে তো নিষেধ শাসনের কোনো গণ্ডী আছে বলেই মনে হয় না। কিন্তু মনের ভিতরে একটাও জানালা নেই, একটু আলো নেই, সব অন্ধকার। আচার বিচার সংস্কারের একটা বাণ্ডিল।

কে কোন্ জাত, কে কতো বড়োলোক, কার মেয়ে কার সঙ্গে প্রেম করে, কোন্ মহিলার কতো চরিত্র দোষ, কে পায়ের যোগ্য মানুষ না হয়েও মাথায় হাত দিয়ে কথা বলে এই সব আলোচনাই হচ্ছে জীবনের প্রধান ব্যসন। উনিই শুধু নন, সমবেত ভাবে বলা যায় সবাই। তবে যেহেতু দেবকান্তবাবু একজন কেষ্টবিষ্টু তাই তিনিই ভূমিকাটা করে দিয়ে গাড়ির মতো চালিয়েছেন আর সবাইকে।

এতো কিছু আমার জানবার কথা নয়। বছরে দু' সপ্তাহের জন্য এসে একদিন আধদিন ফুলের মালা গলায় দিয়ে সভাপতি হওয়ার মধ্যে এই সব জ্ঞানের বিশেষ জায়গা থাকে না। যদি বা আভাষে ইঙ্গিতে এর ওর বিষয়ে কিছু বলার চেষ্টাও করেন, আমি ঠিক বুঝতে পারি না। বোঝার উৎসাহ কম বলে ভালো করে বোঝাতেও ভরসা পান না কেউ। আমার স্বভাব ওঁরা জেনে গেছেন, বুঝে গেছেন এ সব বিষয়ে আমি নিতান্ত মূর্খ।

দিদিমাই আমাকে সব বলেন। দিদিমার বয়েস হয়েছে, সব সময় চড়াই উৎরাই ভেঙে সর্বত্র যেতে পারেন না বলে তাঁর উপস্থিতির জন্য বেগম ভিলাতেই মহিলারা আসেন মিটিং করেন অর্থাৎ মহিলা সমিতির সভা। তখন মিলিত হয়ে সকলে যে সমস্ত আলোচনা করেন তা থেকেই দিদিমা জানতে পারেন সব। ঘরে বসে প্রায় সকলকেই তিনি চেনেন। ইদানিং কারো বিরুদ্ধে যে একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র চলছে সেটাও শুনেছেন। কিন্তু সে যে কে তা জানেন না।

এই বাঙালী সমাজে করুণানিধনবাবুও যথেষ্ট উচ্চপদস্থ। তিনিও চা বাগানের মালিক। তাঁর মেয়েও এতোদিন আমাকেই পতিত্বে বরণ করতে উৎসুক ছিলো, সম্প্রতি দু-এক বছর আগে বিয়ে করে একেবারে ডগোমগো। তবে সেটিই শেষ নয়, আরো তিনটি আছে, তার একটি বলা যায় পূর্ণ-যুবতী। সেও ছিপ ফেলে বসে আছে। মজাই লাগে। ভাগ্যিস সময় নেই নইলে বেশি দিনের জন্য এসে থাকলে কে জানে কার সঙ্গে লটকে যেতাম।

আসলে বিয়েতে আমি বিশ্বাস করি না। দরকারই বা কিসের? যেখানে অবিবাহিত থেকে দায় দায়িত্ব কাঁধে না নিয়েও সব পাওয়া যায় সেখানে আর ঝামেলা পাকিয়ে লাভ কী? অল্প বয়সে তবু এক ধরণের মোহ ছিলো স্ত্রী নামের সম্পর্কটার প্রতি, সেই সময়টা যেন কখন গড়িয়ে গেছে, এখন এই মধ্যবয়সে সে চিন্তা মনকে আকর্ষণ করে না।

আমার কাজের লোকজনেরা খুব ভালো। একেবারে বাবু অন্ত প্রাণ। সাহেব অন্ত নয়। আরম্ভে তারা 'সাব' বলতেই অভ্যস্ত ছিলো। অনেক বলে বলে সেটা ছাড়ানো গেছে। আর ছাড়াবার পরেই সহসা কেমন কাছের মানুষ হয়ে উঠলো। সম্ভ্রমের আড়াল আছে কিন্তু ভয়ের দেয়ালটা খসে গেলো। সাহেবদের কেমন ভয় পাই আমরা। তারা এখন আমাদের প্রভু, স্বাধীনতার এতো বছর পরেও। কী আশ্চর্য! আমি যে একটু সাহেব সাহেব, সেই দেশের জলবায়ু মেখে যে ভাবভঙ্গী কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের মতো হয়ে গেছে, তাতেই এক লাফে অনেক উঁচুতে উঠে আছি। সত্যি সাহেব

হলে আর রক্ষা ছিলো না। এতো সাহেব হয়েও আমি বাংলায় কথা বলি, বাপরে বাপ, সবাই তো একেবারে তাজ্জব! এতো সাহেব হয়েও সকলের সঙ্গে ঘাড়ে পিঠে হাত দিয়ে কথা বলি, সে কি সহজ কথা? জম্মো-কম্মো সে দেশে তবু মাটিতে বসতে পারি, ডাল ভাত খেতে পারি, এলোমেলো করে হলেও মধ্যে মধ্যে বেল্ট বেঁধে ধুতি পরি, সব যাবে কোথায়? এর তুল্য আশ্চর্য মাটির মানুষ আর হয় নাকি?

আমার যে কতো হাসি পায় তা এরা জানে না। কতো যে করুণা হয় তা এরা জানে না। প্রশংসা করতে করতে এরা কানের মাথা খেয়ে ফেলে।

এখন ভাবি ভাগ্যিস কর্মস্থল কলকাতাকে বেছে নিয়েছি, এই মহানগরীতে কে কার কে আমার। পাত্র হিসেবে অবিবাহিত জেনে কিছু পাত্রী অথবা তাদের পিতা-মাতারা জ্বালালেও মোটামুটি আপন মনে আমার অবকাশ অনেক।

মেলামেশার ক্ষেত্র বৃহৎ। পছন্দ মতো সঙ্গ বেছে নেওয়া যায়। নিয়েওছি। আমার বন্ধু বান্ধবরা আত্মীয়রা সবাই আমার মনোমতো। কাজের লোকেরাও মনোমতো হওয়ায় আরো সুবিধে, আমাকে দেখে শোনে যত্ন করে। স্ত্রী হলে কতো ঝগড়া করতো, কাজ না করেও কতো কাজ করে বলে খোঁটা দিতো, আরামে বিলাসে থাকতে থাকতে অতিষ্ঠ হয়ে নতুন জীবনের জন্য লালায়িত হতো। দার্জিলিংয়ে ডাক্তার হয়ে বসলেই হয়েছিলো আর কি। ঐ চৌহদ্দীর মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতেই মরে যেতাম।

কিন্তু এই মহিলা হঠাৎ আমাকে ডাকলেন কেন? আমাকে দিয়ে তার কি দরকার থাকতে পারে?

মহিলার মেয়েটি বড়ো সুন্দর, বড়ো মিষ্টি। কী নরম কোমল লজ্জা লজ্জা ভঙ্গি। একে আমি এবার এসে দু-তিনদিন আগে একদিন দেখলাম। ম্যাল থেকে সিঁড়ি বেয়ে বাজারে নেমেছিলাম। সঙ্গে লটি দত্ত ছিলো। লটি দত্ত কলকাতার এক নাম করা ব্যারিস্টারের স্ত্রী। আমার সঙ্গে রোগিনী হিসেবেই পরিচয়, তারপর বন্ধুতা। স্বামীর সঙ্গে আলাদা থাকে, ডিভোর্স চায়, বলে আমার সঙ্গে প্রেমে পড়েছে, এখন পৃথিবী একদিকে আমি একদিকে। শুনতে মন্দ কী? কিন্তু মহিলাটির প্রতি আমি শুধু যে মনের দিক থেকেই কোনো আকর্ষণ বোধ করি না তাই নয়, অনেক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও দেহের প্রলোভনও হয় না। আমি দেখেছি, এই ধরণের বিবাহিতা মহিলারা এবং বড়োলোকের স্ত্রীরা খুব ডেয়ারিং হয়। অল্প পরিচয়েই এতো কাছে এসে যায় যে হাতটুকুও নড়াতে হয় না। দেশে ফিরে আমার অনেক স্বপ্ন ভেঙে গেছে, তার মধ্যে এটাও একটা।

লটি দত্ত এবার আমার সঙ্গে একত্র বাস করবার মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করেছে। কলকাতায় আমি একজন সাংঘাতিক ব্যস্ত ডাক্তার, চেষ্টা করেও নাগাল পাওয়া কঠিন। তা ছাড়া আমি কখনোই কোন মেয়েকে আমার বাড়িতে রাত্রিবাস করতে দিই না। লটি দত্ত যখনই শুনলো দু'হপ্তার ছুটি নিয়ে দার্জিলিং

আসছি, অমনি ছোট্ট মেয়ের মতো আহ্লাদী ভাব দিয়ে ঢলে পড়লো সে-ও আসবে আমার সঙ্গে। এলোও। আসুক।

লটি কার কাছে শুনেছে বাজারে কোথায় এক সোনার দোকান আছে সেখানে পাক সোনার গয়না মেলে। বলল, চলো দেখে আসি। নেপালী গয়না খুব সুন্দর, কিছু কিনে নিয়ে যাই। তাই গিয়েছিলাম। বাজারের চত্বরে নেমেই এই মেয়েটিকে আমি দেখলাম। দেখেই চিনতে পারলাম সেই ঝাঁকড়া চুলের ছোট মেয়েই এতো বড়ো হয়েছে, এতো সুন্দর হয়েছে। আর তারপরেই চমকে গেলাম। মেয়েটির চোখে মুখে অদ্ভুত এক ভীত সন্ত্রস্ত ভাব, যেন প্রায় দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে সেই ভয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য। কারণটা বুঝতে দেরি হলো না। দুটি ছেলের অশোভন অঙ্গভঙ্গী এবং মন্তব্যই মেয়েটিকে বাঘের ভয়ে হরিণের মতো তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি এগিয়ে সরোষে তাকালাম ছেলে দুটোর দিকে। কিছু শিক্ষা দেবার ইচ্ছেও ছিলো, পূরণ হলো না। কোন দিক দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেলো। মেয়েটি চোখ ভরা জল নিয়ে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকালো আমার দিকে। আমার এতো মমতা হলো। হাত ধরে বললাম, তোমার নাম কী?

অম্বালিকা।

বাবার নাম কি?

আমার বাবা নেই, আমি মায়ের সঙ্গে থাকি।

কোথায় থাক?

কাকঝোরা।

এখানে স্কুলে পড়ো?

হ্যাঁ।

এ সব ছেলেদের তুমি ভয় পাও কেন? ফিরে দাঁড়িয়ে পা থেকে জুতো খুলে ঠাস করে গালে মেরে দিও, তা হলেই ঠিক হয়ে যাবে।

এবার মেয়েটির চোখ ভরা জল আর বাধা মানলো না, গাল ভাসিয়ে বুকে নামলো। আমি তাকে আদর করলাম। আমার আটত্রিশ বছরের ঊষর হৃদয় অদ্ভুত এক বাৎসল্যে পরিপূর্ণ হয়ে গেলো।

আমি বিশেষ কাউকে ভালোবাসি না। আর ভালোবাসার মতো আছেই বা কে আমার। ঐ তো এক দিদিমা। স্ত্রীও নেই সন্তানও নেই। হঠাৎ মনে হলো বিয়ে করলে এরকম মেয়ে আমার আসতে পারতো। হয়তো এই রকমই লাবণ্যে লালিত্যে ভরপুর।

আমি লটিকে বললাম সে কথা। লাফিয়ে উঠে লটি ইংরেজিতে বললো, আমি তোমাকে ঠিক এই বয়সের শতগুণ সুন্দর একটি মেয়ে উপহার দিতে পারি।

তাই নাকি?

তুমি বোধ হয় জানো না অর্থাৎ তোমাকে বোধ হয় বলা হয়নি যে আমার একটি মেয়ে আছে, দেরাদুনে পাবলিক স্কুলে পড়ে, বোর্ডিং-এ থাকে।

লটির যে কোনো সন্তান আছে আর সে যে এতো বড়ো এ কথা এই ছমাসের আলাপে সত্যিই আমি প্রথম শুনলাম। অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম। লটি বললো, আমার কাঁচা চেহারা দেখে বিশ্বাস হয় না, তাই তো? অবশ্য বয়েসও তো খুব বেশি না। অল্প বয়সে হয়ে গেছে আর কি। সহসা বয়েস লুকোতে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লো। তারপরেই অদ্ভুত এক আক্রোশ নিয়ে বললো, তোমার রুচির প্রশংসা করা যাচ্ছে না। একটা স্টুপিডের মতো বিশ্রী গ্রাম্য মেয়েকে দেখে যেমন হামলে পড়ে আদব করছিলে, দেখে তো মনে হচ্ছিলো—

কী মনে হচ্ছিলো?

এবার লটি শুদ্ধ বাংলায় বললো, এর নাই হচ্ছে বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রো অর্থাৎ বুড়ো বয়সের ভীমরতি।

তার মানে?

তার মানে, মেয়েটাকে দেখে তোমার ইয়ে মানে ইয়ে—ইংরেজি বুলি ছাড়লে।

মেয়েটাকে দেখে আমার জিভ নিয়ে লালা গড়াচ্ছিলো।

এ কথা শুনে আমার ভীষণ রাগ হলো, গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললাম, ছিঃ!

ছি তোমাকে।

কী নোংরা মন তোমার!

আমি নোংরা? তা তো বলবেই, সেখানে দাঁড়িয়েই প্রায় চেঁচিয়ে ঝগড়া করতে উদ্যত হলো লটি দত্ত। আমি হন হন করে তাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলাম আর সঙ্গে সঙ্গেই ঘন কুয়াশা আবৃত করে ফেললো চারদিক।

ঝকঝোরায় সুন্দর সাজানো গোছানো ছোট্ট একটি কাঠের বাড়িতে তিনি থাকেন। ভদ্রমহিলার নাম অরুন্ধতী দেবী। এসে যখন দরজা খুলে অভ্যর্থনা জানালেন, আমি চমৎকৃত হলুম। রোগা নন, মোটা নন, ফর্সা নন, কালো নন, আশ্চর্য এক সমন্বিত চেহারা। দেখা মাত্রই মনে হলো এতো দিনে সত্যিকারের একটি বাঙালী মেয়ে দেখে চোখ সার্থক হলো। ফিকে রঙের একটি শাড়ি পরেছেন, গায়ে সেই রঙেরই ব্লাউস। পিঠের উপর লম্বা একটি বেণী। যাকে বলে মৃণাল বাহু, সেই বাহু দুটি তুলে যুক্ত-কর হয়ে বললেন, আসুন।

বসার ঘরে ঢুকেও চোখ জুড়িয়ে গেলো এমন সহজ সুন্দর করে সাজানো। আমাকে বসিয়ে নিজেও একটা মোড়া টেনে বললেন, প্রথমেই ডেকে পাঠানোর ঔদ্ধত্যের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

না না—

আপনি যে এসেছেন সেজন্য কতো যে আনন্দিত বোধ করছি, মানে—

না না—

অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গেই আসতে বলেছিলাম, অনেক ইতস্ততও করেছি, ভেবেছি আমারই যখন প্রয়োজন তখন আমারই আপনার কাছে যাওয়া উচিত।

কিন্তু আমার যাওয়ায় এমন অনেকগুলো বাধা ছিলো যা অতিক্রম করা অসাধ্য। কারণগুলোও বলা যাবে না। তাই প্রায় অদৃষ্টের উপর নির্ভর করেই মেয়েকে পাঠিয়ে ছিলাম।

খুব ভালো করেছেন। ভারি সুন্দর মেয়ে আপনার। আমার খুব ভালো লেগেছে ওকে।

আমার মেয়েও সেই শুক্রবার থেকে সমস্তক্ষণ আপনার কথা বলছে। নিরালা নির্জন রাস্তায় বেচারা বেরুতেই পারে না। সব সময়ে আমিই নিয়ে যাই নিয়ে আসি। আমার শরীরটা খুব খারাপ ছিলো সেদিন, স্কুল থেকে একাই আসছিলো, আপনি না থাকলে মেয়েটার আরো কি দুর্গতি করতো কে জানে। তারপর থেকেই আমার মনে হলো কতগুলো কথা আপনাকে জানানো উচিত।

কি ব্যাপার বলুন তো?

আপনি এখানকার প্রায় সব সভা-সমিতিরই একজন কর্ণধার। হয়তো আমার বিষয়ে সবই শুনেছেন, হয়তো কর্তাব্যক্তিদের বক্তব্য আপনার অনুমোদনও লাভ করেছে, তবু আমারও একটা নিজস্ব জবানবন্দী আছে আপনার কাছে। যদি ধৈর্য ধরে একটু শোনেন কৃতজ্ঞ হবো। কিন্তু তার আগে চা নিয়ে আসি।

মহিলা উঠে গেলেন। আমি সনির্বন্ধ হয়ে বলেছিলাম, চা থাক, পরে হবে, আগে ঘটনাটা শুনি। সমস্ত চোখে মুখে নম্রতা, মধুরতা, আন্তরিকতা, ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা মাখিয়ে চলে যেতে যেতে বললেন, দয়া করে যখন এসেছেন, এই সুখ থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না।

অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরে এলেন চায়ের সরঞ্জাম হাতে নিয়ে। ভোজ্য বস্তু সবই ঘরে তৈরি, স্বল্প কিন্তু অত্যন্ত স্বাদু। এমন স্বাদ আহার আমি কখনো কোথাও গ্রহণ করিনি। পরিচ্ছন্ন দামী কাপে দামী সুগন্ধি চা এগিয়ে দিয়ে নিজেও এক কাপ নিলেন। ফুল কাটা প্লেটে খাবার সাজিয়ে দিলেন।

চায়ের পর্ব শেষ হতে হতে বললেন, দার্জিলিংয়ের সব প্রতাপশালী বাঙালীরা মিলে ঠিক করেছেন, আমাকে আর এই শহরে থাকতে দেওয়া হবে না।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, কেন?

আপনি কি জানেন না?

না তো।

কিন্তু আপনিই সেই মিটিংয়ের সভাপতি ছিলেন।

কোন মিটিং?

দেবকান্তবাবুর বাড়িতে বেটা হলো।

দেখুন, আমাকে ওঁরা ধরে নিয়ে গিয়ে অযথাই সভাপতি সেক্রেটারি ইত্যাদি নাম দিয়ে মালা পরান, সম্মান দেন, মতামত জিজ্ঞাসা করেন। আমি এখানে থাকি না, কিছু জানি না, বুঝিও না অনেক কিছু। আসল মিটিং শুরু হবার অনেক আগেই চলে যাই। ঘটনাগুলো বস্তুত সমস্তই অজ্ঞাত থাকে।

দেবকান্তবাবুর বাড়িতে আমি আসার পরেই যে মিটিংটা হলো, আমার তো ধারণা সেটা কালীপুজো সমিতির ব্যাপার। আমার নামে এক হাজার টাকা চাঁদা ধরেছিলেন, সেটা দিয়েই আমি চলে আসি। তাছাড়া তাঁরাও যেমন এই শহরে বাস করেন, আপনিও তাই। সুতরাং আপনাকে থাকতে দেবে না এ রকম একটা উদ্ভট কথা বলবার কি অধিকার আছে তাঁদের?

আমি এখানে প্রায় পাঁচ বছর হলো এসেছি। প্রথম দু বছর নিরুপদ্রবেই কেটেছিলো। তৃতীয় বছরেই গোলমালটা শুরু হলো।

কিসের গোলমাল?

প্রথম গোলমাল আমি মেলামেশায় তেমন পটু নই। এ সব মফঃস্বল শহরে এটা কম বড়ো অপরাধ নয়। তা ছাড়া আমার চালচলন সাজসজ্জা কোনটাই এঁদের পছন্দসই নয়।

মানে?

মানে এঁরা ঠিক বুঝতে পারছেন না আমি সধবা অথবা বিধবা। এখানে একটা মহিলা সমিতি আছে, আমি সেই সমিতিতে যাইনি, সভ্যও হইনি। আমি জানতাম এ ধরণের মিলনে নানা রকম কথা উঠে পড়ে, কৌতূহলী হয়ে সকলেই সকলের ব্যক্তিগত জীবন জানতে উৎসুক হয়, সন্তোষজনক জবাব না পেলে ক্রুদ্ধ হয়। সেই ভয়েই আমি আরো গুটিয়ে থেকেছি।

কি আশ্চর্য! আপনি তো আপনার রুচিমতোই জীবন যাপন করবেন? আপনি অবশ্যই একজন স্বাধীন নাগরিক।

সব ক্ষেত্রে সে কথা যে খাটে না তার প্রমাণ আমি। একে তো একজন মহিলা একটি মেয়ে নিয়ে একা থাকে সেটাই সমাজগতভাবে একটা মস্তো অপরাধ, উপরন্তু দুষ্টু লোকেরা অরক্ষিত ভেবে সুযোগ নেবার চেষ্টা করে। যেমন অধিক রাত্রে দরজা ধাক্কানো, ঢিল ছোড়া, অশ্রাব্য মন্তব্য, অনুসরণ করা, কী অবস্থায় যে বাস করছি—

ভদ্রমহিলা চুপ করলেন, মুখ নিচু করলেন, পরিত্যক্ত চায়ের সরঞ্জাম ট্রের উপর গুছিয়ে রাখতে লাগলেন। আমি বললাম, দেখুন, আমার জীবনের বড়ো অংশটাই কেটেছে অন্য একটা দেশে, আপন দেশের রীতি নীতি চরিত্র বলা যায় আমার কাছে খুবই অচেনা। একজন মহিলার পুরুষবর্জিত জীবন যে এ রকম কতগুলো অভদ্র মানুষের অসভ্যতায় বিপন্ন হয়, এটা ধারণা করতে পারছি না। শিক্ষিত সজ্জন মানুষও তো আছে কিছু যাঁরা এসে এই অন্যায়কারীদের সাজা দিতে পারেন?

মহিলা অস্ফুটে হাসলেন। তারপর তাকালেন, আমি তাঁর বড়ো বড়ো কালো চোখের সৌন্দর্যে অভিভূত হলাম। সবিনয়ে বললাম, আমাকে যখন ডেকে পাঠিয়েছেন নিশ্চয়ই ভেবেছেন এ বিষয়ে আমার কিছু করণীয় আছে। আমি সত্যি বলছি, আমার যদি তিলমাত্র সাধ্যও থাকে আপনার কোনো কাজে লাগবার তাতে আমি কৃতার্থ হবো।

অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু সব শুনে সেই মন আপনার থাকবে কিনা জানি না।

এর মধ্যে আর শোনবার কী আছে। আমি আজই দেবকান্তবাবুদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলবো। তাঁদের উচিত আপনাকে সমস্ত রকম সাহায্য করা।

মহিলা আবার হাসলেন। গালে টোল পড়লো, সারা ভঙ্গিতে বিষাদের সমুদ্র ঢেউ তুললো। চুপ করে থেকে বললেন, দেবকান্তবাবুরাই মিটিং ডেকে স্থির করেছেন, আমাকে আমার মেয়ে নিয়ে এখান থেকে বিতাড়িত হতে হবে। আমার চাকুরিস্থলে গিয়েও এ নিয়ে দরবার করে এসেছেন। শহরের বাজে ছেলেদের লেলিয়ে দিয়েছেন উত্যক্ত করবার জন্য।

সে কী!

এবং আপনিই সেই মিটিংয়ের প্রধান বলে আমাকে জানানো হয়েছে।

কক্ষনো না।

তা হলে কি ধরে নেবো আপনাকে প্রধান কবে নিজেরাই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?

তা ছাড়া আর কী? আমি তো এ সব কিছুই জানি না।

তাই হবে। আপনাকে দেখে সেটাই সম্ভব বলে মনে হচ্ছে। অম্বুকে আপনি সেদিন যেভাবে রক্ষা করেছিলেন তাতেই আমার মনে হয়েছিলো এ সব ঘোঁট বা ষড়যন্ত্রের মধ্যে আপনি নেই, আপনার অজান্তেই সব কিছু করে যাচ্ছেন এঁরা। অনেক চিন্তা করে সেজন্যই একবার আসতে অনুরোধ করেছিলাম।

উত্তেজিত হয়ে বললাম, ভাগ্যিস ডেকেছেন, নইলে এ সবের বিন্দু বিসর্গও তো আমি জানতে পারতাম না। আপনার বিরুদ্ধে আমি কেন ষড়যন্ত্র করবো? আমি তো আপনাকে চিনিই না। দেখেছি দু-চারবার শুধু এইটুকু। এরপরেই বোকার মতো বললাম, তবে যে উপলক্ষ্যেই হোক আপনাকে কাছাকাছি দেখে চোখ সার্থক হলো। আশৈশব বাঙালী মেয়েরা আমার কাছে একটা স্বপ্ন। এতো দিনে জানলাম সে স্বপ্ন শুধুই স্বপ্ন নয়। বলেই আমি মনে মনে জিভ কাটলাম, ছি ছি ছি, এটা বলা নিশ্চয়ই অত্যন্ত গর্হিত হয়েছে। হয়তো উনি ভাবলেন সুযোগ পেয়ে আমিও এ সব বলে অপমান করছি। এর মধ্যে আমার যে সত্যি কোন উদ্দেশ্য নেই তা উনি কেমন করে জানবেন। তৎক্ষণাৎ আবার বললাম, আমার ভাষাটা বোধ হয় ঠিক হলো না, মাতৃভাষায় আমি খুব দক্ষ নই, অপরাধ হলে ক্ষমা করে নেবেন। আজ উঠি। কিন্তু আপনার মেয়েকে তো দেখলাম না, কোথায়?

পাশের ঘরে পড়ছে। ইচ্ছে করেই ডাকিনি। কী হবে এ সব মন খারাপ করা কথার মধ্যে ওকে রেখে।

এবার একটু ডাকুন।

প্রায় ছুটে এলো অম্বালিকা, গা ঘেঁষে দাঁড়ালো, মিষ্টি করে বললো, যাচ্ছো?

তার মা সংশোধন করলেন, যাচ্ছো নয়, বলো যাচ্ছেন?

আমি হা হা করে উঠে বললাম, না না, ও সব আপনি আজ্ঞে নয়, ও আমাকে তুমিই বলবে। তারপর আদর করে বললাম, শোনো অম্বালিকা, তুমি

কাল সকালে আমার সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খাবে। আমি এসে নিয়ে যাবো না কি তুমি নিজে নিজে যাবে? মাকে বলে দাও আমি তোমার গড ফাদার হতে চাই।

এই প্রথম অরুন্ধতী দেবীর মুখে বিষাদের বদলে একফালি রোদের মতো এক টুকরো সুস্মিত হাসি ভেসে উঠলো। তিনি দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন, আমি বিদায় নিলাম।

আমি অরুন্ধতী দেবীর বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম দেবকান্তবাবুদের। বিরক্তির ভঙ্গিতে বলেছিলাম, আপনারা এ সব কী করছেন বলুন তো?

ওঁরা অবাক হয়ে বললেন, কী?

অরুন্ধতীদেবীকে নাকি এ শহরে থাকতে দেবেন না স্থির করেছেন।

অরুন্ধতীদেবী! ও, সেই স্ত্রীলোকটা? তাকে তুমি কি করে চিনলে?

যে ভাবেই চিনে থাকি, সেটা জানা জরুরী নয়। যেটা এই মুহূর্তে জরুরী সেটা হচ্ছে এই যে কোনো সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলাকে স্ত্রীলোকটা বলে উল্লেখ করা ঠিক ভদ্রজনোচিত নয়।

তিন চারজন তথাকথিত বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন সেখানে, সকলেই একযোগে কিছু বলতে উদ্যত হলেন। দেবকান্তবাবু থামিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ধীর হয়ে বললেন, অনিমেষ, তুমি একজন বিদ্বান বুদ্ধিমান বিজ্ঞ ছেলে। তোমাকে বোঝাবার বিশেষ কিছু নেই আমাদের। ভদ্রমহিলাকে যে ভদ্রমহিলা বলে উল্লেখ করতে হয় তা আমরা জানি। এবং একটা স্ত্রীলোককে যে স্ত্রীলোক বলেই উচ্চারণ করা দরকার তা-ও আমরা মানি।

কি বলতে চান?

বলতে চাই সমাজে বাস করতে হলে এবং পারিবারিক জীবন যাপন করতে হলে যেমন তেলে জলে মেশে না তেমনি কোনো অসৎ চরিত্র স্ত্রীলোককেও সকলের সঙ্গে এক আসনে বসিয়ে রাখা চলে না।

মানে?

মানে বুঝে নাও। মেয়েটা কার? ওর বাপ কোথায়? কে ওর বাপ? মুখে একটা কুটিল হাসি ফুটিয়ে তুলে মাথা নাড়লেন, বাপু হে, তোমার চেয়ে বয়েস আমাদের কিছু বেশিই, ও সব চলানি পাড়ানিতে আমরা ভুলি না। তুমি সরল মানুষ, বুঝেছি এবার তোমাকে ধরেছে। আর খবরটা যে কানে আসেনি তা-ও নয়। সোজা ভাষায় ঐ অরুন্ধতীটি একটি প্রসটিটিউট। ওর ওই মেয়ে কার দ্বারা জগতে এসেছে পারো তো জিজ্ঞেস করে দেখো, আর এ-ও বলি, পারো তো ঐ পাড়া মাড়িও না। আমরা তোমাকে ভালোবাসি, সন্তানের অধিক জ্ঞান করি, তুমি আমাদের পূজনীয় ধন্বন্তরী নীতিশ ডাক্তারের নাতি, বেগম ভিলার মালিক, তোমার হিতসাধন আমাদের কর্তব্য। তুমি যে ঐ মেয়েমানুষটির বাড়ি গিয়েছিলে, ছেলেরা এসে বলেছে সে কথা। কাল সকালে যে ঐ বেজন্মা মেয়েটা তোমার কাছে এসেছিলো তাও আমরা জানি। তুমি যদি আজ না আসতে আমরাই যেতাম সব কথা তোমাকে বলতে।

খুব রেগে গিয়ে বললাম, তা হলে সত্যিই আপনারা মহিলার পিছনে কুকুর লেলিয়েছেন? ছি ছি ছি। জানবেন আপনাদের এ সমস্ত চক্রান্তের মধ্যে আমি নেই। বলে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে। বাড়ি ফিরলাম না, নেমে গেলাম কাকঝোরায়। দরজায় টোকা দিলাম, মহিলাই দরজা খুলে দিলেন। আমাকে দেখে অবাক হয়ে স্বল্পকাল তাকিয়ে থেকে বললেন, আসুন।

রেগে গিয়ে আমি যে কেন এখানে চলে এসেছি জানি না। প্রায় কাঁপছিলাম। এতোক্ষণে সম্বিৎ ফিরলো। লজ্জিত ভাবে বললাম, ক্ষমা করবেন। হঠাৎ কোনো খবর না জানিয়ে এভাবে আসবার জন্য আমি নিজেও প্রস্তুত ছিলাম না। ঠিক আছে, আমি বরং যাই।

তিনি মৃদু হাস্যে পর্দা সরিয়ে ধরে আবার বললেন, আসুন।

আমি ঢুকলাম। বললেন, চা না কফি?

কিছু না।

তা কখনো হয়?

আপনার কাজে যেতে হবে না?

আজ রোববার।

ও, তাই তো।

খুব উদভ্রান্ত দেখাচ্ছে। বাড়িটা বড় নীচে, আসতে পরিশ্রম হয়েছে বোধ হয়।

না, আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েই ছুটে এসেছি এখানে। বলতে পারেন নিজের অজ্ঞাতসারে আমার পা আমাকে এখানে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

ক্রুদ্ধ! মহিলা চকিত হলেন, আমিই কি সেই ক্রোধের কারণ?

ঠিক তাই। আমি দেবকান্তবাবুদের ওখান থেকে আসছি।

ও। চোখ নামালেন তিনি।

বড় বড় নিশ্বাসে বললাম, তাঁরা অনেক যা-তা কথা বলছেন। আমি কক্ষনো তাঁদের ক্ষমা করবো না।

আস্তে আস্তে মুখ তুললেন, অস্ফুটে বললেন, হয়তো মিথ্যে বলেননি।

আমি তেমনি উত্তেজিত ভাবে বললাম, ও সব সত্য মিথ্যা নিয়ে ওঁদের মাথা ঘামাবার দরকার কী? আপনি আপনার মনে থাকবেন, ওঁরা ওঁদের মনে থাকবেন, কী সাহসে ওঁরা—না, এ সব আমি বরদাস্ত করতে রাজী নই। মাঝখান থেকে আমার নামটাও ব্যবহার করছেন। কী অন্যায়।

শান্ত হয়ে বসুন, আমি চলে যাওয়াই স্থির করেছি।

কেন? এঁদের ভয়ে?

থাকতে পারবো বলে মনে হচ্ছে না।

আমি আপনাকে প্রোটেক্ট করবো।

আপনার মেয়াদ এখানে ক'দিন? হাসলেন, তা ছাড়া আমিই বা আপনাকে এ সব দুর্নাম দুর্ভোগের মধ্যে জড়াবো কেন?

একটু থমকে গেলাম। সত্যিই তো, আমার মেয়াদ আর ক'দিন। আমি

চলে গেলে ওঁরা এঁকে আরো নির্যাতন করবেন। কিন্তু কেন, কেন? আমার হাত কামড়াতে ইচ্ছে করলো। ভেবে নিয়ে বললাম, এক কাজ করবেন?

কী?

আমার সঙ্গে কলকাতা যাবেন?

এবারেও হাসলেন তিনি, গিয়ে?

আমার ওখানে থাকবেন। আমি তো মাত্র একটা ঘরেই থাকি, তিনটে ঘর আরো পড়ে থাকে, অম্বালিকাকে ওখানে স্কুলে ভর্তি করে দেবো—

আর আমি?

আপনিও থাকবেন।

খাবো কী?

এইবার আমার খেয়াল হলো এই প্রস্তাব কতো মূর্খের মতো হয়েছে। অপ্রস্তুত ভাবে চুপ করে ছিলাম। উনি বললেন, আমি যে বছর বি. এ. পাশ করলাম, মামা বাড়ির সঙ্গে দেওঘর বেড়াতে গিয়েছিলাম। তখন বছর দু' আগে আমি পিতৃহীন হয়েছি। আমার মায়ের কপালটা একেবারেই ভালো নয়। আমার আগে পরে আরো দুটি সন্তান ছিলো তাঁর। একজন দশ বছর বয়সে মারা যায়, আর একজন সাত বছরে। বৈধব্যও অকাল বৈধব্য বলতে পারেন। বাবার অবর্তমানে আমরা মামাবাড়িতেই ছিলাম। আমার দুই মামা। দুজনই পাগলাবাবা ভোলাশংকরের শিষ্য, সাংঘাতিক ভক্তি। তাঁদের ধারণায় ভোলা-শংকর প্রকৃতই মানবরূপী শিব। অনেক জায়গায়ই তাঁর আশ্রম আছে, যখন যেখানে খুশি থাকেন। তবে যখন যেখানেই থাকুন না কেন, ভক্তবৃন্দরা সেখানে গিয়েই জড়ো হয়ে তাঁর ভজনা করতে থাকে। আমার এবং আমার মায়ের হয়তো বা আমার বাবার প্রভাবেই এই সব ভগবানের প্রতিভূ জাতীয় ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষ সুনজর ছিলো না। তবু মামাদের পাল্লায় পড়ে একদিন গেলাম। অর্ধ উলঙ্গ হয়ে বসে আছেন বাবা, মহিলারা পদসেবা করছেন, পুরুষেরা গদগদ চিত্তে দাঁড়িয়ে আছেন জোড়হাত করে। বাবাকে দেখে আমার কোন চিত্তবিকলন না ঘটলেও বাবা আমার দিকে যথেষ্ট মনোযোগের দৃষ্টিতে তাকালেন। বললেন, ঘরে যেন পদ্ম গন্ধ পাচ্ছি, মা মাগো, তুই কোথা থেকে এলি?

এই হলো ভূমিকা। মামারা ভাগ্নির গৌরবে ঠাকুরের পদলেহন করলেন এবং পরের দিনও নিয়ে এলেন, তার পরের দিনও, কি উপলক্ষে জানি না, বাবা সেদিন রুদ্ধকক্ষে কুমারী বরণ করলেন। তাঁর বরণের ধর্ষণে আমি হতচেতন হয়ে গেলাম। বাবা দরজা খুলে বেরিয়ে যাবার পরে সবাই আমায় অচেতন অবস্থায় দেখে বললো, আহাহা কী ভাগ্যমানী, দেখো কেমন দশায় পড়েছে।

সেই দশাই আজ আমাকে এই দশায় এনে ফেলেছে। ভোলাশংকর জগৎপতি, সুতরাং আমাকে সেই পতিত্বের অংশ দিয়ে আশ্রমসেবিকা করে রাখতে তাঁর কোন আপত্তি ছিলো না। আসলে সেই উনিশ কুড়ি বছরের যুবতীটিকে মাত্র একদিন ভোগ করেই তাঁর বাসনা চরিতার্থ হয়নি। মামারা

বলেছিলেন অনেক সেবিকাই তাঁকে পতিরূপে পাবার জন্য স্বেচ্ছায় শরীর দান করে, তাতে কোনো দোষ নেই। সে তো দেবতার ভোগ। আমাকেও সেই ভাবে সেবিকা হতে বলেছিলেন। ঘৃণায় আমার সর্বশরীর শিউরে উঠেছিলো। প্রথমে আমি আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিলাম। মায়ের জন্য পারিনি। মা বললেন, আমার কাছে তোমার বাবার রেখে যাওয়া খুদকুড়ো যা অবশিষ্ট আছে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে থাকলে কেটে যাবে দিন।

সবিস্তারে বলে লাভ নেই, মোট কথা মামাদের সঙ্গে মন কষাকষি করে মা আমাকে নিয়ে হুগলি জেলার এক অতি গণ্ডগ্রামে চলে যান সেখানেই অম্বালিকার জন্ম। বছর পাঁচেক সেই গ্রামেই ছিলাম, মা এমন একটা ভান করতেন গাঁয়ের লোকেদের কাছে যেন আমি স্বামী পরিত্যক্তা। তারা তা বিশ্বাস করেছিলো। ঐ পাঁচ বছরের মধ্যেই আমি বি. টি. পাশ করি, লাইব্রেরিয়ানশীপ পাশ করি। এবং এ সবের পিছনে যে আমার কতো পরিশ্রম কতো চেষ্টা কতো উদ্যম খরচ করতে হয়েছে তার কোন বর্ণনা নেই। কখনো ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে কখনো মেসে কখনো হস্টেলে থেকে কখনো খেয়ে কখনো না খেয়ে—যাকগে সে সব কথা, সাত বছরের মাথায় চাকরিও পেলাম একটা। আমার মা আমার মেয়েকে নিয়ে গ্রামেই থাকতেন, তিনিই লেখাতেন পড়াতেন, একটু বড়ো হতে একটি গরীব ছেলেকে মাস্টার হিসেবে রেখে দিয়েছিলেন। অম্বু মেধাবী, সহজে গ্রহণ করতে পারে, স্মরণশক্তি প্রখর। বাড়ি বসে বসেও বেশ ভালো রকমই লেখাপড়া শিখেছিলো। চাকরিটা পেয়েছিলাম আমি শ্রীরামপুরে। ছোটো চাকরি, অতি কম মাইনে। তবুও সেখানেই একটা ছোটো বাড়ি ভাড়া করে মাকে আর মেয়েকে নিয়ে এলাম। মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করবার প্রশ্ন উঠলো। সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন উঠলো সন্তানের পিতার নাম কি দেওয়া হবে? কুমারীর গর্ভজাত সন্তানের পিতার নাম কি দেওয়া হবে? মা আমার দিকে তাকালেন, আমি মায়ের দিকে তাকালাম। অনেক পরে বললাম, যা সত্য তাই দেবো। মা বললেন, ভোলাশংকরের শিষ্য সেবক সর্বত্র ছড়ানো। যদি এসে মিথ্যেবাদী বলে বাড়ি চড়াও হয়? প্রমাণ কি? খুব অসম্ভব কথা নয়। মা অধিকতর চিন্তিত হয়ে আবার বললেন, এখানে আবার সবাই জানে বিধবা।

হুগলিতেও মা একটা প্রচ্ছন্ন মিথ্যার মধ্যেই আমাকে ঢেকে রেখেছিলেন, আমি ও প্রতিবাদ করিনি। কী করবো বলুন, বাঁচতে হবে তো? বাচ্চাটাকে তো রক্ষা করতে হবে? কিন্তু আবার এই ভোল পাল্টানো ব্যাপারটাতে আমার বুকের ভিতরে যে কী রকম করতে লাগলো বলতে পারি না। এই মিথ্যা অস্তিত্ব নিয়েই কি তবে সমস্ত জীবন কাটবে আমার? শেষ পর্যন্ত মেয়েকে আর কোন বাংলা স্কুলেই নিয়ে গেলাম না। ফাদার আব্রাহামের কাছে গেলাম। তাঁকে আমি সব বললাম, তিনি আমার নামেই ভর্তি করে নিলেন তাঁর স্কুলে। ফাদার আব্রাহাম ওখানে একজন খুব বিখ্যাত লোক। ধার্মিক এবং পণ্ডিত বলে সবাই ভক্তি শ্রদ্ধা করতো, মান্য করতো, একডাকে চিনতো। সকলের বিপদ আপদেই তিনি ছিলেন বন্ধু, অর্থ সামর্থ্য সব

নিয়েই উপস্থিত হতেন।

বছর চারেক বাদে তিনিই আমাকে এখানকার কলেজের লাইব্রেরীয়ান করে পাঠালেন। অম্বুকে প্রাণতুল্য ভালোবাসতেন, নিজে এসে ভর্তি করে দিয়ে গেলেন স্কুলে। কি করে যে কার মুখ থেকে বাঙালী সমাজ জেনে ফেলেছে অম্বু আমার কুমারী অবস্থার সন্তান আমি জানি না। আমি আমার মাকেও এখানে নিয়ে এসেছিলাম। বছর তিনেকের মধ্যেই মারা গেলেন তিনি। আর সেই সময় থেকেই শুরু হলো উৎপাত। এ ভাবে কি থাকা যায়, বলুন?

সমস্ত বৃত্তান্ত বলে অরুন্ধতীদেবী চুপ করলেন। আমি বললাম, আপনি কখনো বিয়ে করার কথা ভাবেননি?

ভেবেছি।

তবে করেননি কেন? তা হলে তো এ রকম বিশ্রী বিশ্রী লোকগুলো এ রকম অভদ্রতা করবার অবকাশ পেতো না।

মহিলা হাসলেন।—চিরকাল বিদেশে থেকে এ দেশের কিছুই জানেন না দেখছি।

কেন? জানবো না কেন?

প্রথমত আমি কলঙ্কিনী, তার উপরে—

কলঙ্কিনী! মানে?

সোজা ভাষায় অসৎ চরিত্র।

আপনি অসৎ চরিত্র? আর সেই স্কাউন্ড্রেল—

তিনি সাধু, সব রমণীর পতি।

অবনক্‌সাস্‌।

সুতরাং অসৎ চরিত্র স্ত্রীলোককে কে বিয়ে করবে? উপরন্তু পাপের ফসলটি আমি বিনষ্ট করিনি।

কি বলছেন! অমন সুন্দর একটা মেয়ে—জানেন, আপনার মেয়েকে দেখে প্রথমেই আমার মনে হয়েছিলো সময় মতো বিয়ে করলে আমারও একটা ও রকম মিষ্টি মেয়ে আসতে পারতো।

মহিলা বিস্মিত চোখে তাকিয়ে বললেন, আপনি বিয়ে করেননি? কিন্তু আমি যে সেদিন সন্ধ্যাবেলা আপনাকে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে জিমখানা ক্লাবের রাস্তায় দেখতে পেলাম।

আমি সভয়ে হাত তুলে বললুম, রক্ষে করুন, আমি যাকে আমার স্ত্রী বলে নির্বাচন করবো তার সঙ্গে ঐ রকম শার্ট প্যাণ্ট পরা মহিলার কোনো মিল থাকবে না। কিন্তু এবার উঠি, আর তার আগে জিজ্ঞেস করি, আপনি যে বলছেন এখান থেকে চলে যাবেন, কোথায় যাবেন?

ফাদার আব্রাহামের কাছে লিখেছিলাম, আপাতত তাঁর কাছে গিয়েই উঠবো।

আর চাকরি?

সে তো একটা মস্তো ভাবনাই।

আমি বলছি আপনি যাবেন না।

এদের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমি হেরে গেছি। আমার ভয় হচ্ছে, আমার মেয়ের জীবনেও না এরা শেষে আমার জীবনটাকেই ঘনিয়ে আনে।

মেয়েকে বিনষ্ট না করে, সেই ভণ্ডটার সঙ্গে না থেকে যে শক্তি যে সাহসের পরিচয় আপনি দিয়েছেন তারপরে এই ভয় আপনাকে মানায় না।

অম্বুকে ওরা একদিন যাকে বলে হরণ করা তাই করতে পাবে বলে আমার ধারণা। আমি পাগল হয়ে যাবো। আমাকে পালাতেই হবে ডক্টর চ্যাটার্জি।

কোথায় পালাবেন? পালিয়ে পালিয়ে কতো দূরে যাবেন? সর্বত্রই দেবকান্তদের দল তাড়া করবে আপনাকে।

তা হলে আমি কী করবো?

মহিলার ভয়ার্ত ব্যাকুল দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আমার ভীষণ কষ্ট হলো। তাঁকে রক্ষা করা আমি কর্তব্য বলে মনে করলাম। মনুষ্যত্ব হিসাবে গণ্য করলাম। সম্পূর্ণ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বললাম, আপনার নিবাপত্তার কোনো ব্যবস্থা না করে আমি দার্জিলিং ছাড়বো না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি গিয়েই আমার দারোয়ান মনবাহাদুরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে এখানে দিনরাত পাহারা দেবে। আপনি বা আপনার মেয়ে যখন যেখানে যাবেন, ওকে সঙ্গে নেবেন। তারপর আমি দেখছি কি করা যায়।

বাড়ি ফিরতে বেশ বেলা হয়ে গিয়েছিলো। দেখলাম, আগুনের মতো মুখ নিয়ে লটি দত্ত বসে আছে বসবার ঘরে। দু'দিনের জন্য কালিম্পং গিয়েছিলো, ফেরার কথা ছিলো আজ সকালে। আমার অনুপস্থিতিতে ক্ষিপ্ত হয়ে রাগতো মুখে ঝেঁকে উঠে বললো, তুমি কি জানতে না আমি দশটা থেকে বারোটার মধ্যে এসে পৌঁছবো?

অম্লান বদনে বললাম, নিশ্চয়ই জানতাম।

তুমি কি জানতে না ফিরে এসে আমরা একসঙ্গে খাবো কথা ছিলো?

হ্যাঁ, তাও জানতাম।

তা হলে?

তা হলে কী?

তা হলে তুমি কোথায় ছিলে এতক্ষণ? গলা চড়ে উঠলো।

ওর এই স্ত্রীসুলভ অধিকারগত ভাব আমার একটুও ভালো লাগলো না। জোঁকের মত আঁকড়ে থাকাটাও অনেক সময়েই বিরক্তি উৎপাদন করে। কিন্তু আজ অসহ্য বোধ হলো। বললাম, তোমার কি ধারণা তোমাকে এণ্টারটেইন করা ছাড়া আর আমার কোনো কাজ থাকতে পারে না?

আমি জানি তুমি আজকাল কোথায় গিয়ে মাথা মুড়োও।

মাথা মুড়োও মানে?

ঐ বেশ্যাটার ঘরে গিয়েছিলে?

ঠোঁটে দাঁতে রং মাখা লেখাপড়া জানা সমাজের উঁচুতলার একজন ভদ্রমহিলার মুখে এই শব্দ শুনে আমি বজ্রাহত হলাম। লটি দত্তকে আমি এর চেয়ে অনেক মার্জিত বলেই ভেবেছিলাম। আমার কাছাকাছি অথবা

দু-চার বছরের বড়ো এই মহিলার বন্ধুতা আমার কাছে মাঝে মাঝেই বেশ রিফ্রেশিং মনে হতো। আঁবড়ে থাকাটাকে আমি ওর গভীর প্রেম বলেই ধরে নিয়ে অনুকম্পা করতাম। দাঁতে কাঁকর পড়ার মতো শিউরে উঠে আমার নীচু গলা উচ্চগ্রামে পৌঁছে গিয়ে বলে উঠলো, শাট আপ!

ততোধিক উঁচু গলায় লটি বললো, ইউ শাট্ আপ! এতো দিন আমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে আশা দিয়ে এখন স্বমূর্তি ধরছো, না? তোমার চরিত্র এখানে কে না জানে? তুমি অনেক মেয়ের সর্বনাশ করেছো, একসঙ্গে অনেককে আশা দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছো। ভেবেছো ডুবে ডুবে জল খেলে একাদশীর বাপও তা জানতে পারবে না। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। সবাই এসেছিলো, সব বলে গেছে আমাকে। তারা আবার আসবে এখুনি। তুমি যে দিনে রাত্রে ওখানে গিয়ে পড়ে থাকছো তার বিহিত তাঁরাও করবেন, আমিও করবো।

আমি সাধারণত শান্ত স্বভাবের মানুষ। কম্প্রোমাইজিং। ঝগড়াঝাটি বিরোধ বিতর্ক সব সময়েই এড়িয়ে চলি। কিন্তু এই মুহূর্তে অপরিমিত রাগে কেঁপে উঠলাম। কথা বলতে পারছিলাম না। তখনই কলিং বেল টিপে সুধাকান্ত গোঁসাই সে ঘরে ঢুকলেন। বাঙালী সমাজে যাঁর সবচেয়ে বেশী প্রতিপত্তি, বড়ো আসন এবং যিনি একবাক্যে সম্মানিত একচ্ছত্র সমাজপতি। মন্দের ভালো এঁর কোনো মেয়ে নেই. তাই আমার সঙ্গে তেমন দেখাশুনো হয় না। অতি সংকটের সম্মুখীন হলেই এঁর ডাক পড়ে, তাৎক্ষণিক মিটিং বসে, তিনি হাত তুলে যেদিকে ভোট পাওয়ার দেন সকলেই নির্বিচারে তা মেনে নেয়।

এইটুকু সময়ের মধ্যে ব্যাপার যে অনেক দূর গড়িয়েছে, তা বোঝা গেলো এই লাল টুকটুকে বৃদ্ধকে দেখে।

আসুন। এক মিনিট—এই বলে আমি বাইরে এলাম, মনবাহাদুর সেলাম করে উঠে দাঁড়ালো। আমি দ্রুত স্বরে বললাম, শোনো, এক্ষুনি তুমি কাকঝোরায় অমুক বাড়িতে চলে যাও। সেখানে এক মাইজি আছেন আর তাঁর লেড়কি আছে, পাহারা দেবে তাদের, কেউ যেন ত্রিসীমানায় না ঢুকতে পারে।

জী হাঁ—বলে চলে গেলো মনবাহাদুর। আমি ঘরে এলাম। বললাম, কি ব্যাপার? এই অসময়ে? আপনি?

এই এলাম একটু খবরাখবর করতে, অনেক দিন দেখা হয় না। খানিক আগেও এসেছিলাম, আমার সঙ্গে করুণানিধান, দেবকান্ত, বিজন সেন এঁরাও এসেছিলেন। এখানকার কয়েকটি যুবকও এসেছিলো। তাদের নাকি কি সব কথা আছে বলবার। আর বলো কেন, যা চলছে কালে কালে, এখন গেলেই রক্ষে।

হঠাৎ লটি গৃহস্বামিনীর মতো উঠে দাঁড়িয়ে বিনীত স্বরে বললো, আজ খুব ঠাণ্ডা পড়েছে, দু-দুবার কষ্ট করে এলেন, একটু চা বা কফি—

একেবারে সনির্বন্ধ হয়ে বললেন, না মা লক্ষ্মী, না। এখুনি দেবকান্তরাও

আসবে, বরং তাদের দিও। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, কালে কালে কোথায় চলেছে সমাজ। অনাচার, অনাচার। অনাচারে ভরে গেলো সংসার।

আমি চুপ করে রইলাম। লটির বধূসুলভ অভিনয় দেখে আমার গা জ্বলে যাচ্ছিলো। কে জানে এঁদের এই মেয়ে কি বুঝিয়েছে, হয়তো বলেই বসেছে ও আমার ভাবী স্ত্রী। লজ্জা সম্ভ্রম বলে তো কোনো জিনিস আছে বলে মনে হচ্ছে না।

সুধাকান্ত গোঁসাই গলায় কার ঝোলানো বুক পকেটে রাখা ঘড়িটি বার করে চোখ বুলোতে বুলোতে বললেন, বাবাজীর খাওয়া দাওয়া হয়েছে?

বললাম, না।

লটি আবার অধিকারিণীর মতো বললো, কখন হবে, এই তো এলো সেখান থেকে। তাই নিয়েই আমি ঝগড়া করছিলাম।

তা তো করতেই পারো মা, তা তো করতেই পাবো। দু'দিন বাদে তোমাকেই যখন সব ভার নিতে হবে তখন তুমি ছাড়া আর কে সামলাবে।

আমি ভুরু কুঁচকে বললাম, দু'দিন বাদ উনি আমার ভার নেবেন—এটা কি রকম কথা হলো?

সুধাকান্ত গোঁসাই দুই হাতের আঙুলে দুই হাতের আঙুল ঢোকাতে ঢোকাতে ঠাকুর্দা সুলভ রসিকতার ভঙ্গিতে বললেন, বুঝবে বুঝবে, সবই বুঝবে। এতো বড়ো খবরটা লুকিয়ে রেখেছো কেন? ভেবেছো মিষ্টান্ন বিতরণ না করেই পার পাবে?

আমি স্তম্ভিত। স্তম্ভিতই বা কেন? আমি তো লটি দত্ত বিষয়ে এই ধরণেরই একটা অনুমান করছিলাম। প্রতিবাদ করে বললাম, আমার কোনো খবর নেই, থাকলে আমি সারা দার্জিলিং শহরকে নিমন্ত্রণ করতাম।

লটি গা মুচড়ে লজ্জিত হাসির ভঙ্গিতে কি একটা বলতে যাচ্ছিলো, আবার কলিং বেল বাজলো, দেবকান্তবাবু আর করুণানিধনবাবু ঢুকলেন, এই যে অনিমেষ, ফিরেছো দেখছি।

উদ্ধত হয়ে বললাম, ফিরেছি, কিন্তু এখনো স্নান খাওয়া করিনি। হঠাৎ আপনারা সবাই মিলে এই অসময়ে—কি ব্যাপার বলুন তো?

এই জবাবে দেবকান্তবাবুর চোখে রাগ ঘনালো, জলদ গম্ভীর স্বরে বললেন, ব্যাপার অনেক। আশা করি তুমি তা অনুমান করতে পেরেছো বলেই বিরক্ত বোধ করছো।

ঠিক ধরেছেন। আপনাদের বক্তব্য তো আমি সব শুনেছি, আর কি বলবার আছে?

দেখো, বলবার আমাদের অনেক কিছু আছে। আমরা তোমাকে খুব সৎ চরিত্র ছেলে বলেই জানি—

আমিও তাই জানি।

ও, তার আগে আর একটা কথা বলে নি, তুমি যে এর সঙ্গে শীঘ্রই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে যাচ্ছো, আমাকে তো বলনি। বরং আমাকে এবং আমার মেয়েকে তুমি আর তোমার দিদিমা অন্য রকম কিছু বুঝতেই সাহায্য করেছো।

আমি উত্তেজিত ভাবে বললাম, অনেকগুলো প্রশ্ন আপনি একসঙ্গে করেছেন। আপনার প্রথম প্রশ্নের জবাব, ইনি কলকাতার একজন বিখ্যাত ব্যারিস্টারের স্ত্রী, আমার সঙ্গে দার্জিলিং বেড়াতে এসেছেন, তার সঙ্গে বিবাহের কোনো সম্পর্ক নেই। আর, আপনাকে এবং আপনার মেয়েকে অন্তত আমি এমন কিছু বুঝবার তিলমাত্র অবকাশ দিইনি, যাতে এই অভিযোগ আমাকে করতে পারেন। আমি রীতিমত অসম্মানিত বোধ করছি।

আমরা করছি না? আমরাও করছি। করুণানিধনবাবুর গলা কর্কশ শোনালো, একটা নষ্ট স্ত্রীলোক নিয়ে তুমি যা আরম্ভ করেছো, আমাদের সব বাঙালীর মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে।

একজন নিরপরাধ স্ত্রীলোকদের বিরুদ্ধে আপনারা যা আরম্ভ করছেন তাতে আমি নিজে বাঙালী বলে আমারও মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে।

কী বললে! এবার গোঁসাই লাঠি ঠুকলেন, তোমার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে? ভেবো না বিলেতে থেকেছো বলে মহা সাহেব হয়ে গেছো। দেশের দশের জাতের কোনো মর্যাদাকেই তুমি গ্রাহ্য করবে না?

আপনারা কেউ দেশ দশ বা জাতের মধ্যে পড়েন বলে আমি মনে করি না। আপনারা আপনাদের নিজস্ব জগতেই হিংসা দ্বেষ আর বিদ্বেষের কুণ্ডলি পাকিয়ে ফোঁস ফোঁস করছেন। না, ওটা আমি হতে দেবো না।

তোমার স্পর্দ্ধার কোনো সীমা নেই অনিমেষ। দুটো টাকার গরমে ধরাকে তুমি সরা জ্ঞান করছো। তোমার আধুনিকতা তুমি তোমার বিলেতে গিয়ে দেখিও, এখানে চলবে না। আর এই যে তুমি একজন বিবাহিতা মহিলাকে ফুসলে বার করে নিয়ে এসেছো-

কী! কী বললেন?

নিশ্চয়ই! চেঁচিয়ে উঠলো লটি, তোমার সঙ্গে আমার অন্য রকম আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং ছিলো। এখন একটা খারাপ স্ত্রীলোকের পাল্লায় পড়ে—

লটি দত্ত, তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, যাকে তুমি চেনো না জানো না তার বিষয়ে কোন অসম্মানজনক কথা আমার সামনে উচ্চারণ করবে না। আপনাদেরও বলছি, আমি করজোড়ে অনুরোধ করছি এই অধর্মাচরণ থেকে আপনারা বিরত হন।

ধর্ম অধর্মের তুমি কী জানো হে? লম্বা লম্বা কথা? চোখের উপরই তো দেখতে পাচ্ছি ডাইনির মন্ত্র কাকে বলে। স্ত্রীলোকটা তো তোমাকে তুক করেছে। তোমার মতো খদ্দেরকেই যখন বাগাতে পেরেছে, এখন তো মা মেয়ে ব্যবসা [illegible]তে সারা দার্জিলিং শহর জ্বালাবে। এদের পুড়িয়ে মারা উচিত। এতোদিন দয়া করেছি, এবার আর নয়। চল হে, ওঠো। আমরা যা করবার করবো। গোঁসাই উঠে দাঁড়ালেন।

আমি বললাম, হ্যাঁ, তাই করবেন। জানবেন, আপনাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আমি একা আছি।

দাঁতে দাঁত পিষতে পিষতে বললেন, তা হলে তোমাকেও আমরা দেখে নেবো।

চেষ্টা করুন।

সবাই চলে গেলে লটির সঙ্গে আমার আর একপ্রস্থ অশ্রাব্য কুশ্রাব্য বাক্যের বিনিময় হলো। আমি বলতে বাধ্য হলুম প্রসটিটিউট যদি কাউকে বলতেই হয় তবে তাকেই তা বলা উচিত। আরো বললুম সে যেন অবিলম্বে আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। এই বলে বেরিয়ে গেলুম। হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলুম ঘুমের দিকে। বাতাসিয়া লুপের কাছে এসে দেখলুম দেশলাই বাক্সের মতো ছোট্ট ট্রেন ছোটোদের ট্রেনের মতোই ঝিক ঝিক করে সরীসৃপের গতিতে উঠছে, উপরের দিকে। লাফিয়ে সেই ট্রেন ধরে সোজা কার্সিয়াং।

কার্সিংয়াংয়ে আমার এক বন্ধুও বেড়াতে এসেছিলো কয়েক দিনের জন্য। এক দু' দিনের ব্যবধানেই আমরা রওনা হয়েছিলাম কলকাতা থেকে। তার বাড়িতে এসে তাদের অবাকও করে দিলাম খুশিও করলাম, আমার নিজেরও মন শান্ত হলো। তারা আমাকে কিছুতেই ফিরতে দিতে চাইছিলো না সেই রাত্রে। আমি আমার দিদিমার কথা ভেবে একটু ইতস্তত করছিলাম, না ফিরলে নিশ্চয়ই তাঁর ভীষণ চিন্তা হবে। শুনে বন্ধুর স্ত্রী বললেন, ফোন করে দিন না। সেটাই সমীচিন মনে হলো এবং ফোন করতেই দিদিমা ক্রন্দন বিজড়িত গলায় জানালেন, সন্ধ্যাবেলা জনাকয়েক ছেলে এসে নাকি ভীষণ ভাবে শাসিয়ে গেছে আমাকে। লটি দত্ত বিকেলেই বেরিয়ে গেছে তার গাড়ি নিয়ে, এখনো ফেরেনি। মনবাহাদুরকেও ডেকে ডেকে পাওয়া যাচ্ছে না।

যখন ফোন করেছিলাম রাত তখন প্রায় ন'টা। আমি দার্জিলিংয়ে নিজের গাড়িতে আসিনি। লটি দত্তর গাড়িতেই এসেছিলাম। কিন্তু বন্ধু এসেছিলো তার গাড়ি করে। আমি তাকে এক রাত্রির জন্য আমাকে গাড়িটা ধার দিতে বললুম। শুধু গাড়িটা নয়, তার পিস্তলটাও ধার চাইলাম। তারা স্বামী স্ত্রী অবাক হয়ে বললো, কী ব্যাপার, হঠাৎ পিস্তল নিয়ে গাড়ি নিয়ে—

দয়া করে দাও, প্রশ্ন কোরো না। কাল সকাল দশটার মধ্যেই সব ফেরৎ পাবে।

বন্ধু বললো, ফেরতের জন্য নয়, তোমার মতো ঠাণ্ডা মাথার মানুষ হঠাৎ এই পাহাড়ী শহরের রাত দশটায় এমন অগ্নিমূর্তি হয়ে উঠলে কেন?

সব কাল এসে বলবো।

আসলে দিদিমার কাছে আমাকে শাসাতে এসেছিলো জেনে আমার যতো না রাগ হয়েছিলো, ঐ মহিলার জন্যে চিন্তা হয়েছিলো তার চেয়ে বেশি। গুণ্ডা লেলিয়ে আমাকে ভয় দেখাতেই যাদের সাহসে কুলোয় গুণ্ডা লেলিয়ে মহিলার মেয়েটিকে সত্যিই ছিনিয়ে নিয়ে যেতে বাধা কোথায় তাদের। শেষে কি উপকার করতে গিয়ে আমিই তাঁর সর্বনাশের কারণ হবো?

হঠাৎ আমার বন্ধুর স্ত্রী বললেন, আচ্ছা, আপনাদের বাড়িতে কি লটি দত্ত বলে কোন মহিলা এসে উঠেছেন?

অবাক হয়ে বললাম, কেন বলুন তো?

ওঁর স্বামী অনেক দিন আমার বাবার জুনিয়ার ছিলেন, সেই থেকেই চিনি। কিন্তু মহিলার সঙ্গে মাত্রই সপ্তাহ দুয়েক আগে আলাপ হলো।'

কোথায় ?

লাইটহাউসে। আমি আমার দাদা বৌদির সঙ্গে গিয়েছিলাম, ওঁরা দুজনও গিয়েছিলেন। ইনটারভেলে দেখা। কথা প্রসঙ্গে আমরা কার্সিয়াং আসছি শুনে বললেন আমিও দার্জিলিং যাচ্ছি—বেগম ভিলা জানেন? সেখানে উঠবো। আমার তখন খেয়াল হয়নি, পরে মনে হলো ওটা তো আপনার বাড়ি।

আমি তাকিয়ে থেকে বললাম, খুব আশ্চর্য! লটি দত্ত কিন্তু আমাকে বলেছেন স্বামীর সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই, তিনি আলাদা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকেন এবং ডিভোর্সের চেষ্টা করছেন। লায়ার! যাকগে, তোমার গাড়িটা আর পিস্তলটা আমাকে দাও অতীন।

অতীন বললো, চলো, আমিও যাচ্ছি সঙ্গে।

না না, তোমার যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

নিশ্চয়ই ওঠে। নিশ্চয়ই এমন কিছু ঘটেছে যাতে তোমার মতো মানুষও এতো ক্ষিপ্ত হয়ে গাড়ি নিয়ে পিস্তল নিয়ে এই রাত করে—

আমি অস্থির ভাবে বললুম, তবে চলো, তাড়াতাড়ি [illegible]।

পথে আসতে আসতে সব বললুম তাকে। শুনে অতীন একেবারে হতভম্ব।

অল্পক্ষণের মধ্যে পেঁছে গেলুম দার্জিলিং। স্টেশন ছাড়িয়ে উপরের দিকে আমার বাড়ির উদ্দেশ্যেই যাচ্ছিলাম, বন্ধু বললো, একবার কাকঝোরাটা হয়ে গেলে হয় না। কে জানে দুর্বৃত্তরা আজই কোনো কুকীর্তি করে বসবে কিনা। ভাববে হয়তো একদিন দেরি করলেও পুলিশ টুলিশ নিয়ে তুমি গণ্ডগোল পাকিয়ে বসবে। হয়তো সেজন্যই সন্ধ্যাবেলা দল বেঁধে আটকাতে গিয়েছিলো। যাকে বলে ঘেরাও। জানে তো তুমিও কম ক্ষমতাশালী নও এবং নিরস্ত্রও নও। আর লটি দত্ত বিষয়ে যা বললে সে তো এক ভীষণ স্ত্রীলোক। সেই গিয়ে হয়তো খবর দিয়েছে তুমি দুপুরেই কোথায় বেরিয়ে গিয়েছো তখনো ফেরোনি। ভেবে নিতেই পারে খবরাখবর করে নিশ্চয়ই তুমি কোনো বন্দোবস্ত করছো ওদের নিরাপত্তার জন্য।

ঠিক। ঠিক বলেছো।

গাড়ি ঘুরলো আবার। যথাস্থানে গাড়ি থামিয়ে চাবি দিয়ে এক সিঁড়ি নেমেই বাড়ির দরজায় গিয়ে পেঁছুলুম। বোধ হয় কৃষ্ণপক্ষ। গাঢ় অন্ধকারে কাছের মানুষও দেখা যাচ্ছিলো না, একটি জনপ্রাণী নেই কোথাও, সব কেমন থমথম করছে আর সেই সঙ্গে তীব্র কেরোসিনের গন্ধ। আঁৎকে উঠে দেখলাম দপ করে এক ঝলক আগুন প্রজ্বলিত হয়ে চারদিক আলোকিত করে দিলো। সঙ্গে সঙ্গেই দুপদাপ অনেকগুলো পায়ের শব্দ। অর্থাৎ আগুনটা লাগিয়েই পালাচ্ছে।

সর্বনাশ! আমি এক লাফে বারান্দায় উঠে গিয়ে চিৎকার করে ডাকতে লাগলাম, আগুন, আগুন, শীগগির বেরিয়ে আসুন দরজা খুলে। আমি অনিমেষ বলছি। কাঠের বাংলো শাঁ শাঁ করে ধরে উঠেছে ততক্ষণে। একটা

জানলা খুলে মুখ বার করলেন অরুন্ধতীদেবী, আমাকে দেখলেন, দ্রুত হাতে দরজা খুলে মেয়ে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। অন্ধকারে অতীন একটা গুলি ছুড়লো।

বললো, দলটা ছুটে আসছিলো আবার আমাদের আক্রমণ করতে গুলির শব্দে এগুতে সাহস পেলো না। শীগগির গাড়িতে ওঠো গিয়ে।

গাড়িতে উঠে আমার মনবাহাদুরের কথা খেয়াল হলো। নেমে যাচ্ছিলাম। অতীন গাড়িতে স্টার্ট দিতে দিতে বললো, আবার কোথায় যাচ্ছো? এ জায়গা এখন একটুও নিরাপদ নয়। তোমাকে ওরা খুন করে ফেলবে।

আমি ব্যাকুল ভাবে বললাম, কিন্তু মনবাহাদুর? আমি তো তাকে এখানেই পাহারা দিতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, সে কোথায় গেলো?

নিশ্চয়ই ঘরের মধ্যে কোথাও ঘুমিয়ে পড়েছে—

না—এতক্ষণে পাথর হয়ে থাকা অরুন্ধতীদেবীর গলার আওয়াজ শোনা গেলো, লোকেরা বলাবলি করছিলো বেগম ভিলায় গুণ্ডারা মারপিট করছে, আমি তাকে তখুনি চলে যেতে বললাম।

অতি দ্রুত গাড়ি চালিয়ে পৌঁছুনো গেলো বাড়ি। অতীন কোনো কথা শুনলো না, কিছুতেই থাকলো না, বললো, যা অবস্থা দেখছি এ সব জায়গায়, সারারাত রেবাকে (ওর স্ত্রী) একলা রাখতে ভরসা হচ্ছে না।

কথাটা অসঙ্গত নয়। আমারও তো রীতিমতো ভয় ঢুকে গেছে। অতএব আর জোর না করে তাকে বিদায় দিয়ে অরুন্ধতীদেবী আর তার মেয়েকে নিয়ে বাড়িতে ঢুকলাম। দিদিমার পুরোনো আয়া কাঞ্চি দরজা খুলে দিলো। প্রয়োজন মতো সমস্ত বন্দোবস্তও করে দিলো। দিদিমা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে গেলেন। অম্বালিকাও তাদের জন্য নির্দিষ্ট শয়ন কক্ষে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। আমি অরুন্ধতীদেবীকে বললাম, আপনিও শুয়ে পড়ুন, কিছু ভয় নেই, আমি আছি।

চুপ করে থেকে অরুন্ধতীদেবী বললেন, সেটাই ভয়। আমি তো কাল সকাল ন'টার সময়েই চলে যাবার টিকিট কেটেছি। কিন্তু আপনাকে এই বিপদের মধ্যে কেমন করে ফেলে রেখে যাবো। সমস্ত অনর্থের মূল তো আমিই।

হেসে বললাম, তা হলে যাবেন না।

অতি দুঃখে তিনিও হাসলেন, বাড়ি-ঘর পুড়ে এতক্ষণে নিশ্চয়ই ভস্মস্তূপে পরিণত হয়েছে। বেরিয়ে এসেছি এক কাপড়ে, শুধু এই ব্যাগটা আর ব্যাগের মধ্যে মাইনের টাকাটা, কোথায় থাকবো?

এ বাড়িতেই থাকবেন।

এতো কিছুর পরেও?

সব মূল্যবান বস্তুই বহু মূল্যে পেতে হয়। আমি যদি সর্বসমক্ষে অম্বালিকার পিতৃত্ব গ্রহণ করি আপনার আপত্তি আছে?

কী!

দয়া নয়, করুণ নয়, বীরত্ব দেখানো নয়, বিশুদ্ধ স্নেহ, আপনার কন্যাকে

আমি কন্যারূপে পেলে কৃতার্থ হবো।

এ কথা শুনে মহিলা অপলকে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার চোখে চোখ রেখে আমার হৃদয় কম্পিত হলো, আমি আবার বললাম, দয়া নয়, করুণা নয়, বীরত্ব দেখানো নয় বিশুদ্ধ প্রেম। কন্যার মাতাকেও আমি বিবাহিতা স্ত্রী রূপে পেলে জীবন ধন্য মনে করবো।

অরুন্ধতী দু'হাতে মুখ ঢাকলেন। আঙুলের ফাঁক দিয়ে তাঁর দুই চোখের জল গাল ভাসিয়ে গলা ভাসিয়ে বুকের কাপড়ে মিশলো। আমি আমার এতো কালের সঞ্চিত সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা আনন্দ স্বপ্ন এবং ভালোবাসার সার্থকতা নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে মথিত হতে লাগলাম। কোনো নারীর কাছ থেকে এই অনুভূতিই আমি এতোদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম।

আয়না

দিদিমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তেরো বছরের নাতনী উজ্জয়িনী বলে উঠলো, দিদান, তুমি যখন আমার মতো ছিলে, তখনো কি তুমি এতোই সুন্দর ছিলে ?

একথা শুনে কাজকর্ম রেখে পরমাদেবী নাতনীকে আবেগের সঙ্গে চুমু খেলেন। বললেন, আমার মিষ্টুনি পাখি, তখন যে আমার তুমি ছিলে না, তাই কেউ কখনো আমায় সুন্দর দেখেনি।

তারা কী বলেছে ?

বলেছে অমুকবাবুর শ্যামলা রংয়ের রোগা মেয়েটা তো বেশ গান করে।

এমা, তারা কী খারাপ।

কেন ?

তোমাকে বলেছে শ্যামলা রংয়ের রোগা মেয়ে ? তাদের কি চোখ ছিলো না ?

মিথ্যে বলেছে নাকি ?

খুব মিথ্যে। ভীষণ মিথ্যে। তুমি তখন এখনকার চেয়েও বেশি সুন্দর ছিলে।

ঠিক বলেছো।

তোমার দিদান ছিলো ?

না !

ঈশ্‌শ্‌ ! কী কষ্ট। যাদের দিদান নেই, তাদের জন্য আমার দুঃখ হয়। দিদান—

সোনা—

তুমি তখন কী গান করতে ?

ভুল সুরে রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, ডি. এল. রায়—

যা—

যা কেন ?

ভুল সুর বললে কেন ?

পদ্মার ওপারে থাকতুম যে, যার নাম এখন বাংলাদেশ। ওটা ছিলো পূর্ব বাংলা আর এটা হলো পশ্চিম বাংলা। পশ্চিম বাংলা থেকেই তো গানগুলো যেতো, যেতে যেতে পদ্মা পার হয়ে সুরগুলো সব জলে বাতাসে ভিজে উড়ে অন্যরকম হয়ে যেতো।

উজ্জয়িনী হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লো, গলা জড়িয়ে ধরলো, তারপর বললো, আর কী করতে ?

লুকিয়ে লুকিয়ে খুব উপন্যাস পড়তুম।

লুকিয়ে কেন ?

তা নৈলে সবাই বকতো, বলতো পাকা হয়ে যাবে, লেখাপড়া হবে না।

স্কুলে যেতে ?

তা তো যেতেই হতো।

ভালো লাগতো ?

একটুও না।

কেন ?

লেখাপড়ায় ভালো ছিলুম না, তার মধ্যে সুধাদি নামে একজন টিচার একদিন খুব অপমান করে দিলেন।

অপমান ! তোমাকে ? উজ্জয়িনীর চোখ লাল, কী অপমান করলেন ?

পুজোর ছুটিতে সব মেয়েদের একটা ভ্রমণ কাহিনী লিখতে বলেছিলেন, ছুটির পরে যখন স্কুল খুললো, সবাই দেখালো, আমিও দেখালাম, আমারটা দেখে উনি গরম গলায় বললেন, এই মেয়ে, চুরি করে লিখেছো কেন ?

বললো ! তারপর ?

আমি তো একটু বোকা বোকা ছিলুম, ভয় খেয়ে তো-তো করছিলুম, সুধাদি গলাটা আরো একটু চড়িয়ে বললেন, আবার ন্যাকামো হচ্ছে। তুমি বলতে চাও এটা তোমার নিজের লেখা ? এই বলে খাতাটা ছুড়ে মারলেন আমার দিকে —

উজ্জয়িনীর চোখে জল এসে গেলো, তখন—তখন তুমি কী করলে ?

লজ্জায় দুঃখে অপমানে বসে রইলুম মাথা নিচু করে, আরো রেগে বললেন, ওঠো, দাঁড়িয়ে থাকো, প্রতিজ্ঞা করো আর কখনো চুরি করে লিখবে না অথবা বড়োদের কাউকে দিয়েও লেখাবে না।

কী সাংঘাতিক ! তোমার সেই টিচারটা এখন কোথায় বলো তো ?

কী করবে ? মারবে নাকি ?

তুমি কেন তখন ঝগড়া করলে না ?

কী ঝগড়া করবো ?

বলবে তো, ওটা তোমারই লেখা ?

তা বলতেও আমার অপমান লাগছিলো।

কেন ? যা সত্য তা তো সত্যই !

যা সত্য তা সত্য বলেই প্রমাণ করতে আমার খারাপ লাগছিলো। আমাকে কেউ মিথ্যেবাদী ভেবেছে এর চেয়ে বড়ো কষ্ট আর কিছু আছে নাকি ?

ও আমার দিদান, ও আমার দিদুয়া—উজ্জয়িনী তার দিদানের বুকে মুখ ঘষলো।

তারপর কী হলো জানো ? পরমাদেবী তাঁর প্রস্ফুটিত কমলের মতো

সুন্দরী নাতনীর ঘন কালো চুলে হাত বুলোলেন।

কী হলো?

স্কুল ছেড়ে দিলাম।

ছেড়ে দিলে? বেশ করলে।

আর ভাবলাম—

কী ভাবলে?

যখন বড়ো হবো, যখন আমার খুব নাম ডাক হবে—

ওমা, তখন থেকেই বুঝি জানতে যে তোমার খুব নাম ডাক হবে?

জানতাম না, ওরকম ভাবতে আমার খুব ভালো লাগতো।

তখন?

তখন যদি কখনো সুধাদিকে দেখি, একটা কথা বলবো না ভয় পাবো না, এক ঝটকায় মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলবো, এ কে? একে তো আমি চিনি না।

মাত্র এই?

তারপর কি হলো শোনো, বেশ কয়েক বছর আগে ঠিকই একদিন একটা সভায় দেখি সামনের আসনে সুধাদি বসে আছেন। আমাকে জোরজার করে ঐ সভার লোকেরা নিয়ে গিয়েছিলো, অনেক আগড়ুম বাগড়ুম বক্তৃতাও দিতে হয়েছিলো, সভা ভাঙতে দেখি কি মরি পড়ি করে উঠে আসছেন সুধাদি। বেশ বয়েস হয়েছে, অনেক চুল পেকেছে, এসেই দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমি সুধাদি, সেই যে তুমি আমাদের স্কুলে পড়তে মনে নেই? স্কুলে পড়তে মনে নেই? আমি তখনি জানি, এই মেয়ে একদিন হবে।

তখন তুমি কী করলে? উজ্জয়িনী উত্তেজিত।

খুশিতে ডগোমগো হয়ে বললাম, ওমা সুধাদি এই বলে অটোগ্রাফ খাতা লেখাবার ছেলেমেয়েদের ভিড় সরিয়ে তাড়াতাড়ি প্রণাম করলাম।

প্রণাম করলো?

আমার মনে যে ততোদিনে কোনো রাগ ছিলো না, ততোদিনে সব তো স্মৃতি হয়ে গেছে।

স্মৃতি হয়েছে তো কী? তা বলে প্রতিশোধ নেবে না?

স্মৃতিরও তো বয়েস আছে একটা? ঘটনাটা ঘটেছিলো আমার বারো বছর বয়সে, দেখা হলো তার তিরিশ বছর বাদে, এই সুধাদি আমাকে তখন আমার বারো বছরের কৈশোরে নিয়ে গেলেন যে—কতো ভালো লাগলো আমার। শুনলুম দেশ বিভাগের পরে কলকাতা এসে খুব কষ্টে পড়েছেন, আত্মীয় নেই, স্বজন নেই, বিয়েও করেননি—

বেশ হয়েছে, তোমাকে ওরকম বলেছিলেন বলেই ভগবান এই সাজা দিয়েছেন। আমার কাছে কোনো সিমপ্যাথি পাবে না। উজ্জয়িনী রীতিমতো গম্ভীর।

একটু পরে দিদান।

বলো।

কী তুমি সারাক্ষণ কাজ করো, শোনো না—

শুনছি তো।

না, তুমি ওটা রাখো—

চালে যে বড্ড কাঁকর সোনামণি, না বাছলে খাবার সময়ে দাঁতে পড়বে না ?

পড়ুক।

তখন দাঁত ভেঙে যাবে না ?

ভাঙুক।

এমন ডালিমদানার মতো দাঁত যদি ভেঙে যায়, আমি তো তবে কেঁদেই মরে যাবো।

এক ঝাঁক উড়ে যাওয়া পাখির আনন্দ ছড়িয়ে শব্দ করে হাসলো উজ্জয়িনী, দিদানটা যে কী বলে।

ভুল বলেছি নাকি ?

আমি আয়না দিয়ে দেখেছি আমার দাঁত খুব বিচ্ছিরি। সবচেয়ে সুন্দর তোমার দাঁত।

তাতো ঠিকই।

তোমার গায়ের গন্ধও খুব সুন্দর।

আর ?

যখন তুমি আমেরিকায় ছিলে, তোমার জন্য আমার খুব কষ্ট হতো, মধ্যে মধ্যে মায়ের গায়ে তোমার গন্ধ পেতুম, মা বলতো, তুই তো আমার মেয়ে নোস, তুই তোর দিদানেরই মেয়ে।

বলতো বুঝি ?

বাবা বলতো, তোমার দিদিমা দেশে ফিরে এলে তুমি তাঁর কাছেই থেকো। কিন্তু কথা কি রাখলো, বলো ?

কাছে কাছেই তো আছো সোনামণি, এই তো শনিবারে শনিবারে এসে সোমবার পর্যন্ত থেকে যাচ্ছো, আমি যাচ্ছি মাঝে মাঝে—

না, ওতে হয় না, আমার সব সময় তোমার কাছে থাকতে ইচ্ছে করে।

মা বাবা ভাইকে ছেড়ে এলে দেখো, তখন আবার মন কেমন করবে।

তাতো জানি। বাবা তো কাজের জন্য এখানে ওখানে যায়, দু'চারদিন থেকে আসতে হয়, আমার তখন এতো বিশ্রী লাগে—আর মাকে ছেড়ে তো থাকিইনি কখনো।

তবে ?

কিন্তু তোমাকে তো ঐ রকমই ভালোবাসি, তার চেয়ে বেশিই বাসি, তবু কেন তোমাকে ছেড়ে থাকতে হয় ?

তোমার মা তো আমার মেয়ে, সেও তো আমাকে ছেড়ে আছে ? ঐ রকমই হয়।

আমার মা যখন তোমাকে ছেড়ে বিয়ে করে চলে গেলো তখন তোমার কষ্ট হয় নি ?

হয়নি !

কেঁদেছো ?

কাঁদিনি !

তবে মা বিয়ে করলো কেন ?

নইলে তোমাকে পেতাম কী করে ?

আর তুমি না বিয়ে করলে আমিই বা মা পেতাম কী করে ?

তাই তো।

সব এক রকম, না ?

সব এক রকম।

ঠিক ঢেউয়ের মতো। আসছেই, আসছেই, যাচ্ছেই, যাচ্ছেই—

ছোটারা বড়ো হয়, বড়োরা বুড়ো হয়, তারপর তারা মরে যায়—

যেমন আমি যাচ্ছি—

না না না উজ্জয়িনীর গলায় কান্নার বেগ. তুমি কক্ষনো বুড়ো হওনি, তুমি কোনোদিন বুড়ো হবে না, কোথায় তুমি বুড়ো, কোথায় তোমার চুল পেকেছে—

পাগল ! পরমাদেবী হাসলেন, আমাকে বুড়ো বানায় এমন সাধ্য কারো আছে নাকি ? আমি ভগবানকে আগেই বলে দিয়েছি, ওসব বুড়োফুড়ো কিন্তু করতে যেয়ো না আমাকে, সেটা ভালো হবে না।

উজ্জয়িনী আবার পাখির গলায় হাসলো।

দিদান।

বলো।

আমার মতো বয়সে তুমি কী বই পড়তে ?

তোমার মতো বয়সে রবীন্দ্রনাথ প্রায় শেষ করে এনেছি, তার আগে শরৎচন্দ্র শেষ, তার আগে—

মা বলে শরৎচন্দ্র পড়বার নাকি একটা নির্দিষ্ট বয়েস আছে, সে বয়সে না পড়লে মজাই পাওয়া যায় না।

ঠিক বলেছে। তুমি শরৎচন্দ্র পড়োনি ?

উঁহুঁ।

একটাও না ?

শুধু একটা—

কোনোটা ?

ঐ সিনেমা হয়েছিলো, পরিণীতা—

শেষে সিনেমার দয়ায় তুমি তাঁকে পড়লে ? এ দুঃখ রাখি কোথায় ? জানো, আমার যখন এগারো বছর বয়েস, আমার এক দিদির বিয়ে হলো, তার তখন চোদ্দ—

সে কী ! চোদ্দো বছরে মানুষের আবার বিয়ে হয় নাকি ?

তখন হতো। সেই দিদির বিয়েতে দিদি আঠেরোখানা বই পেয়েছিলো। বলতে গেলে সবই শরৎচন্দ্রের বই। তার মধ্যে এই পরিণীতাও ছিলো, আমি

পনেরোবার পড়েছিলাম বইটা, তবু আমার আবারো পড়তে ইচ্ছে করতো। তারপরে দেবদাস, চন্দ্রনাথ, চরিত্রহীন—উঃ সেই সব সুখের কথা ভাবলে এখনো বুক কাঁপে। ভালো বই পড়ার মতো ভালো আর কি কিছু আছে নাকি ?

আর রবীন্দ্রনাথ পড়লে কবে ?

ঐ বছরই, কেমন করে আমার হাতে একটা গল্পগুচ্ছ এলো, পাগলের মতো বসে রইলুম সে বই নিয়ে।

বই পড়তে আমারো খুব ভালো লাগে, তবে তোমার মতো অত নেশা নেই আমার।

তুমি বুঝি বাংলা বই একেবারেই পড়ো না ?

পড়ি, কিন্তু ইংরেজি পড়তে ভালো লাগে বেশী।

কার কার পড়েছো ? শুধু ব্রাইটন, না ?

মোটেও না। অস্কার ওয়াইল্ড পড়েছি, চেখব পড়েছি, মোপাসাঁ পড়েছি, ডি এইচ লরেন্স পড়েছি, তারপর এই সেদিন এমিলি ব্রণ্টির বইটা পড়লাম, ঐ যে একজন গভর্নেস এসে প্রেমে পড়লো—এখানে একটু লাল হলো উজ্জয়িনী, চোখ নিচু করে বললো, আচ্ছা দিদান, প্রেমে পড়া কি খুব খারাপ ?

পরমাদেবী তাকিয়ে থেকে হেসে বললেন, কেন, প্রেমে পড়েছো নাকি ?

ভ্যাট।

আমার তো মনে হয় পড়েছো, নইলে ফিসফিসে গলায় একঘণ্টা ধরে কাকে ফোন করো ?

শোনো নাকি তুমি ?

তা তো একটু শুনি।

কেন শোনো ? উজ্জয়িনী ঠোঁট গোল করলো।

পরমাদেবী বললেন, কানে আসে, কী করবো ?

দিদান

বলো

তুমি কখনো কাউকে নেজেল দিয়েছো ?

নেজেল ! নেজেল কী ?

বারে, নেজেল জানো না ? ঐ নাকি করে কথা বলা ?

ন্যাকামি ?

ঠিক।

না।

কোনোদিন না ? কারো কাছে কোনো আবদার করতে হলেও কখনো নেজেল দাওনি ?

কখনো দিয়েছি কিনা, সে কি আর এখন মনে আছে ?

তবে কী মনে আছে ?

কী তুমি শুনতে চাও ?

যখন আমার সমান ছিলে তখন তোমার ইয়ে—মানে—ইয়ে—মানে তোমার

হার্টথ্রপ কে ছিলো ?

হার্টথ্রপ ! ও, পরমাদেবী শব্দ করে হাসলেন, সে তো বহুকাল আগের কথা। চিন্তা করতে হবে একটু।

মানুষ খুব ভুলে যায়, না ?

তাতো যায়ই।

অথচ তখন মনে হয় ও ছাড়া আর কিছু ভালো না।

সব্বোনাশ ! বলো দেখি এর মধ্যে ক'বার আছাড় খেয়েছো ?

আমার ফার্স্ট হার্টথ্রপটাকে তো তুমি দেখেছো, মনে নেই ? সেই যে যোধপুর পার্কের ফেল করা ছেলেটা যার জন্য আমি কিছুতেই ঐ বাড়িটা বদলাতে চাইনি। মা বাবার কাছে কতো কান্নাকাটি করেছি—

ও, সেই সোমেনটা তোমার ফার্স্ট হার্টথ্রপ ? তখন তো তুমি বেশ ছোটো ছিলে, কতো বয়েস ?

বারো। কেন বারো বছরে বুঝি ওরকম হয় না ? কিন্তু আমি তো ইচ্ছে করে কিছু করিনি, নিজে থেকেই তো কী রকম হলো, ওকে দেখলে যা ভালো লাগতো না—

সোনা সোনা, নির্মলহৃদয় আপাপবিদ্ধ নাতনীটিকে পরমাদেবী বুকে জড়িয়ে ধরলেন, আমারো ওরকম বয়সে ওরকম হয়েছিলো—

নিশ্চয়ই ঐ সোমেনটার মতো বাজে না।

সে ছিলো এক বাজনাদার, সার্কাসের বাজনাদার—

সার্কাসের বাজনাদার তুমি পেলে কোথায় ?

সার্কাস দেখতে গিয়ে।

তারপর ?

তখন ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছি, বেশ বুড়ো বড়ো ভাব হয়েছে মনের মধ্যে, ঐ ছোকরাটা ম্যাণ্ডোলিন বাজাচ্ছিলো ব্যাণ্ডপার্টির সঙ্গে, আমরা সামনের আসনে বসেছিলাম, ঠিক আমাদের বাঁয়েই নীল কাপড় ঘিরিয়ে একটু উঁচু প্ল্যাটফর্ম করে বাজাচ্ছিলো ওরা, হঠাৎ কেমন করে যে একবার চোখাচোখি হয়ে গেলো, আর অমনি দারুণ ভালো লেগে গেলো। সার্কাস টার্কাস ভুলে আমি বারে বারে ওর দিকেই তাকাচ্ছিলাম, ও-ও বাজনা ভুল করে কেবল আমার দিকে তাকাচ্ছিলো।

তারপর ?

তারপর আমার কথাটি ফুরোলো, নটে গাছটি মুড়োলো।

মাত্র ঐ ?

মাত্র ঐ।

এমা—

কেন, তোমার কদ্দিন ছিলো ?

পুরো একমাস।

পুরো একমাস ! সাংঘাতিক তো।

ও একদিন পথে নির্জনে দাঁড়িয়ে বলেছিলো, তোমাকে আমি ভালোবাসি।

তুমি কী বললে ?

আমারো তো সেটাই কথা, তবু আমি বললাম, বাসোগে, আমার তাতে কী ! এই বলে গটমট করে চলে এলাম।

চমৎকার।

আর তারপর বাড়ি বদলে এসে একদম ভুলে গেলাম।

তারপর কখনো দেখোনি ?

হ্যাঁ……এ্যাঁ

গড়িয়াহাটার মোড়ে।

তুমি সেখানে কী করছিলে ?

স্কুল ছুটি হয়ে গেলো, আমরা ক্লাশের ছেলেমেয়েরা সবাই আলেয়ায় সিনেমা দেখতে গেলুম যে—

ওমা, তাই নাকি ? ছুটি হলে অমনি সিনেমা দেখতে যাও. মা বাবা বকেন না ?

না তো। মাকে ফোন করে দিলুম, মা বললো যাও, তা বলে একা ফিরো না, অপেক্ষা কোরো, আমি নিয়ে আসবো।

তা হলে মা তো খুব ভালো।

কেন, তুমি হলে বকতে ?

না না, বকবো কেন ? সিনেমা দেখা কি খারাপ নাকি ?

ঠাট্টা করছো।

ঠাট্টা করবো কেন ?

জানি তুমি সিনেমা সিনেমা করলে একটু গম্ভীর হয়ে যাও।

কবে।

কবে বলবো ?

বলো।

সেই যে একদিন বললুম, আমার নাম উজ্জয়িনী রাখলে কেন, শর্মিলা রাখলে না কেন, হেমা মালিনীও রাখতে পারতে—তখন তুমি খুব মন দিয়ে বই পড়তে লাগলে, আমার দিকে আর তাকালেই না। আমি বুঝি বুঝি না কিছু।

কই, মনে নেই তো।

খুব আছে, কেবল চালাকি। সেই যে রাজেশ খান্নার ছবি কেটে কেটে পড়ার টেবিলে জড়ো করতুম, একদিন তুমি বললে এসব ছবি বাথরুমের দরজায় সেঁটে দিও না, বেশ দেখাবে, দরজাটা রং চটে খুব ময়লা হয়ে গেছে, ঢাকা পড়ে যাবে।

তা ভালোই তো বলেছিলুম, বাথরুমে ছবি সাঁটতে আমি খুব ভালোবাসি।

মোটেও না।

বা, আমার বাথরুমের দেয়ালে দ্যাখোনা, কী ভালো দুটো ছবি রেখেছি, একটা মদিলেয়ানি, একটা রুয়ো—

তা তো রেখেছো, কিন্তু ওটা তোমার ঠাট্টা ছিলো স্যর।

তোমার তাই মনে হয়েছে?

মারও।

কী বলেছে মা?

মা বলেছে, সারাদিন কেবল হিন্দি সিনেমার ছেলেমেয়েগুলোর কথাই বলিস কেন রে? কোথায় শত্রুঘ্ন, কোথায় রাজেশ, কে ডিম্পল, আবার পায়ের পাতায় লিখে রাখিস সঙ্গম, কী বিশ্রী। দেখলি তো সেদিন দিদান কেমন ঠাট্টা করলেন তোকে?

তারপর?

আমি বললাম, দিদানি মোটেও ঠাট্টা করেনি। বললাম, কিন্তু তখুনি বুঝলাম এইসব করলে তোমার মুখটা কেমন অন্য রকম হয়ে যায়, একদিন তুমি ব্যাড্‌টেস্ট শব্দটাও ব্যবহার করেছিলে।

য্‌যা, কবে?

আমার বিষয়ে না, নিরঞ্জন কাকার মেয়ের বিষয়ে।

তাই বুঝি?

কিন্তু এখন আমি সম্পূর্ণ ভুলে গেছি সেসব, এখন আর আমাকে মোটেই সিনেমাপাগল বলতে পারবে না, এখন আমি সব সময়ে ইনটেলেকচ্যুয়েল ভাব দিয়ে থাকি।

পরমাদেবী হাসতে হাসতে লাল হয়ে গেলেন, উজ্জয়িনীও হাসির ফোয়ারা ছুটালো, বললো, সেদিন কি হয়েছে শোনো না, স্কুল থেকে তা ফিরছি, দেখি নিরঞ্জন কাকার বউ মিলি কাকিমাও কোথা থেকে ফিরছেন, আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, আরে উজ্জয়িনী এসো এসো, চলো আমার বাড়িতে চলো, তোমার বন্ধুরা বাড়িতেই আছে—

বন্ধুরা কে?

ওর দুজন মেয়ে, বিউটি আর স্যুইটি—

বিউটি আর স্যুইটি! নিরঞ্জন শেষে এই নাম রেখেছে মেয়েদের। এদিকে আমার কাছে এসে যে নাম চেয়েছিলো, আমি মৃত্তিকা আর ঋত্বিকা রেখে দিলাম।

সে বোধ হয় পোশাকী নাম! লোরেটোতে ভর্তি করার সময়ে এই নাম রেখেছে। ওরা তো কক্ষনো বাংলা বলে না, শুধু ওদের যে বাসন মাজে হারানের মা তার সঙ্গে একটু একটু বলে, তরকারিকে বলে টোরকারি, আর লুচিকে বলে লুশি, নিরঞ্জন কাকা বলেন, দেখেছ ওদের জিবটা কেমন ইংরেজদের মতো হয়ে গেছে, বাংলাটা আর আনতেই পারে না।

মা বাবার সঙ্গেও বাংলা বলে না?

সম্ভবত লুকিয়ে বলে। একদিন আমি হঠাৎ গিয়ে পড়েছিলুম, একতলা ফ্ল্যাট তো, জানলা খোলা ছিলো, পর্দার ফাঁকে দেখলুম ওরা ওদের মায়ের সঙ্গে খুব ঝগড়া করছে বাংলায়, মিলি কাকিমাও খুব বকছেন।

নিরঞ্জন তো তা হলে মেয়েদের খুব সুশিক্ষিত করেছে দেখছি।

মিলি কাকিমা কী রকম সিনেমাখোর জানো ?

মিলি কি তোমারও কাকিমা নাকি ? তোমার মা তো ডাকে মিলি কাকিমা আর নিরঞ্জন কাকা, তোমার চেয়েও ছোট বয়েস থেকে ওদের দেখেছে তোমার মা।

ঐ তো, মা ডাকে বলেই তো আমি ডাকি। মিলি কাকিমার কতো পাকা পাকা চুল আছে। আমাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়েই বলেন কি, বলো, সিনেমার খবর বলো। রাজেশ তো বিয়ে করে ফেললো, ডিম্পলের তো বাচ্চা হবে। আরে ঐ বাচ্চাটা হবে বলেই তো বিয়ে করতে বাধ্য হলো। বাবা, স্যুইটি বিউটির যা মন খারাপ, প্রায় নাওয়া খাওয়া ত্যাগ। তুমি কবে নামছো ?

তুমি ! তুমি সিনেমায় নামবে নাকি ? পরমাদেবী সচকিত।

হ্যাট! দিদানটা যে কী। আমি নামবো কেন ? মিলি কাকিমা দেখা হলেই ওকথা বলেন।

তুমি কী বললে ?

আমি তখন ভুরু কুঁচকে বললুম, তাই নাকি ? কিন্তু আমি আবার কোথায় নামবো ? মিলি কাকিমা বললেন, তুমি দেখছি কিছুই খবর রাখো না। আমি সব কাটিং রেখে দিয়েছি, কবে বিয়ে হলো, কেমন করে হলো, কে কে এসেছিলো, রাজেশের আসল প্রেমিকা কতো কাঁদলো, কিন্তু তুমি নামছো কবে সেটা আগে বলো দেখি।

আমিও তো তাই জিজ্ঞেস করছি, কোথায় নামবার কথা বলছো।

আহা ন্যাকা, স্যুইটি এগিয়ে এসে ইংরেজিতে বললো, যেন জানো না, বোঝো না, এই চেহারা নিয়ে আবার মানুষ কোথায় নামে ? সিনেমায় গো সিনেমায়, হলো ?

এই সময়ে আমি পুরো ইনটেলেকচ্যুয়েল ভাব দিয়ে বললুম, সিনেমা ! হুঁহ্। যাকগে বাড়ি যাই, মা ভাববে।

তারপর !

তারপর সত্যি আমি বাড়ি ফিরে এলুম, আমার খুব বিশ্রী লেগেছিলো সেদিন ওদের। সেই থেকেই ঠিক করেছি আর সিনেমা সিনেমা করবো না, ভালোও লাগে না আজকাল।

তা হলে সেদিন কী সিনেমা দেখলে আলেয়ায় ?

সিনেমার জন্য তো সিনেমায় যাইনি, সবাই মিলে হৈ চৈ করবো সেটাই আসল। অসময়ে ছুটি হয়ে গেল কিনা ? বাজারের কাছটায় দাঁড়িয়ে চিনেবাদাম কিনছিলাম, দেখি কি সোমেনটা পানের দোকান থেকে সিগারেট কিনছে। আমি তখন বন্ধুদের বললুম, দ্যাখো দ্যাখো, ঐ আমার ফার্স্ট হার্টথ্রপ। সন্দীপন তখন আমার চুল টেনে দিয়ে বললো, এ রাম এই তোমার রুচি ? এই দোকানদারটাকে দেখে তোমার বুক কেঁপেছিলো ? ছি ছি ছি।

পরমাদেবী বললেন, তোমার তখন ওর জন্য খুব দুঃখু হলো, না ?

না। উজ্জয়িনী ব্যথিত চোখে তাকালো, একটুও হলো না। কেন হলো না দিদান? অথচ একমাস ধরে ওকে আমি কতো ভেবেছি, ভাবতে কতো ভালো লেগেছে।

ওরকমই হয়।

তোমারও হতো?

আমার হার্টথ্রপেই হয়নি।

মিথ্যে কথা। বলো না লক্ষ্মীটি।

আমার বয়েস কতো জানো?

জানি।

তবে? হিসেব করে দ্যাখো তো সে কতোকাল আগের কথা, কখনো মনে থাকে?

হ্যাঁ থাকে। বলো না--

আচ্ছা রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে চিন্তা করবো, তারপর বলবো। কিন্তু তার আগে শুনে নিই, আবার কাকে দেখে তোমার বুক কেঁপেছে।

অশোককে দেখে।

সে আবার কে?

ঐ যে গান গায়, আমাদের ক্লাশে উর্মিমালার দাদা—

অশোক! অশোক গাঙ্গুলি?

হ্যাঁ।

ভাব হয়েছে তার সঙ্গে?

একদিন আলাপ করিয়ে দিলো উর্মিমালা, ওকে নিতে এসেছিলো গাড়ি নিয়ে—

তখুনি প্রেমে পড়ে গেলে?

মোটেও না।

তবে?

অশোকটাই কেবল আমাকে ডায়েলগ দেয়।

ডায়েলগ! ডায়েলগ কী!

তুমি কিচ্ছু জানো না। ঐ সব বানিয়ে বানিয়ে আজে বাজে কথা—

কী রকম?

অশোকটাই তো ফোন করে, বলে, কী করছো? আমাকে ভাবছো? আমি তো সমস্তক্ষণ তোমাকে ভাবি।

এর নাম ডায়েলগ?

স্প্যানিশ আইজ বলে, হানি বলে—

স্প্যানিশ আইজ!

গান করে বলে যে, ও মাই স্প্যানিশ আইজ মাই প্রেশাস, মাই হানি—

এতো!

ঠাট্টা ঠাট্টা ভাব দিয়ে এসব করে—

তুমি কী করো?

আমিও দি—

তুমিও ডায়েলগ দাও ?

আগে কিন্তু খুব ভালো লেগেছিলো, এখনও ভালো লাগে, তবে অন্যরকম।

মানে আর হার্টথ্রপ হয় না ?

না।

নতুনও কেউ হয়নি ?

উজ্জয়িনী মিষ্টি করে হাসলো।

একটু পরে, দিদান—

বলো।

তুমি সুমন সেনকে চেনো ?

ওই যে ছবি আঁকে ?

হ্যাঁ।

তোমাদের বাড়িতে তো দেখেছি দু-একদিন।

ওঁকে তোমার ভাল্লাগে ?

বেশি তো চিনি না।

দেখতে ভালো ?

মন্দ কী !

আর আঁকেন কেমন ?

সে তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস করো, আঁকার আমি কী বুঝি ?

হ্যাঁ, বোঝো, বলো না।

লোকেরা তো বেশ প্রশংসা করে।

আমিও করি।

তুমিও করো ? তা হলে তো ঠিক আছে।

আমি ওঁর কাছে ছবি আঁকা শিখি যে—

ও মা, কবে থেকে ?

সুমন কাকা বলেছেন, ভালো ছবি আঁকতে হলে ভালো করে আগে ড্রইংটা শিখতে হয়।

ঠিক কথা।

আমি জানি তুমিও আমার মতো বয়সে ছবি আঁকতে।

কে বলেছে ?

মা।

তোমার মা তার মা বিষয়ে আর কী গল্প বলে আমাকে বলে দিও তো।

গল্প আবার কী ? সত্য কথা। তোমার আঁকা একটা ছবি তো আমাদের বাড়িতে আছে।

তাই নাকি ?

মুছে মুছে গেছে, মা বলেন এটা তোমার নিজের কুকুরের পোর্ট্রেইট।

তুমি কী বলো ?

আমারো তো কুকুরই মনে হয়।

কিন্তু এটা যখন নতুন আঁকা হয়েছিলো, একজন প্যাঁচা বলেছিলো, একজন ভালুক বলেছিলো, একজন শুয়োর বলেছিলো, তা হলেই বুঝে দেখো, কী ভয়ংকর আঁকিয়ে আমি, এক জন্তুর ছবিতে সব জন্তু এঁকে ফেলতে পারি।

যা, তোমার কেবল ইয়ে।

আমার মা ভেবেছিলেন, মেয়ে তাঁর সর্ববিদ্যাবিশারদ হবে, কোথা থেকে কার চেনায় একটা কোঁকড়া চুলের সাদা ছেলেকে ধরে এনে আমার মাস্টার বানিয়ে দিলেন।

কেন, ছেলেটাকে তোমার পছন্দ ছিলো না?

কী করে পছন্দ হবে, একদিন আমায় 'তুমি' বললো যে।

তুমি বললো তো কী হয়েছে?

একটা পুঁচকে, ছবি আঁকার স্কুলে মাত্র সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে, আগে বেশি আসতো, বসতো, চুপচাপ আঁকা শিখিয়ে চলে যেতো, দু-একমাস যেতেই বলে কিনা, পরমা, এক গ্লাশ জল দাও তো। শুনে আমি আপাদমস্তক রাগে লাল। জল ঠিকই এনে দিলাম, কিন্তু বললাম, আমাকে আর কক্ষনো তুমি বলবেন না।

তারপর?

তারপর সেই যে গেলো, আর এলো না। আমিও সর্ববিদ্যাবিশারদ হওয়ার হাত থেকে বেঁচে গেলাম।

এ মা, তুমি কী। আমি তো সুমনকাকাকে খুব ভালোবাসি।

বাসবেই তো, সুমনকাকা আর ও কি এক রকম নাকি?

সুমনকাকাকে দেখলেই আমার দুঃখ সরে যায়। আমি কী ভেবেছি, জানো?

কী?

আমি কক্ষনো বিয়ে করবো না।

তবে?

সারাজীবন সুমনকাকার কাছে ছবি আঁকা শিখবো। তাকে এখন আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে।

তাই নাকি?

আমাদের বাড়ির কাছেই বাড়ি তো? কী সুন্দর একা একা একটা ঘরে থাকেন, কতো ছবি, কতো রেকর্ড, কতো বই—আমাকে তো প্রায়ই সকালে ওঁর সঙ্গে গিয়ে ব্রেকফাস্ট করতে ডাকেন।

তুমি যাও?

যাই না আবার। না ডাকলেই চলে যাই, তা আবার ডাকলে যাবো না।

গিয়ে কী করো?

ডিম সেদ্ধ করি, আলু সেদ্ধ করি, রুটিতে মাখন লাগাই, সুমনকাকা দুধ দিয়ে কফি তৈরি করেন, আমি টেবিলে দুজনের কাপ, প্লেট, ন্যাপকিন সাজিয়ে দি—

ওরে বাবা, বাড়িতে তো কই কিছু করো না।

বাড়িতে? বাড়িতে ও রকম লাগে না যে।

এজন্যেই আজকাল আর দিদানের কাছে বেশি আসার সময় হয় না, না?

না, মোটেও না—

সবেগে প্রতিবাদ করলো উজ্জয়িনী। পরমা হাসলেন।

আচ্ছা দিদান—

বলো—

তুমি যখন আমার মতো, তোমারও কি এরকম বেশি বয়সের কোনো বন্ধু ছিলো?

তা বোধ হয় ছিলো—

তোমাকে তাঁরা খুব পাত্তা দিতেন?

একটু আধটু দিতেন বই কি।

না, সে রকম না।

তবে কী রকম?

বলবো?

নিশ্চয়ই।

ধরো তোমার থেকে যে প্রায় কুড়ি বছরের বড়ো, অথচ তোমাকে সঙ্গী পেলে আর কারোকে চায় না, কিছু চায় না। তুমি যা বলো তাই শোনে, তাই করে তোমার জন্যই—

চাল বাছায় হাত থামলো পরমা দেবীর, একটি গাঢ় সন্ধ্যার ধু-ধু স্মৃতি মনে পড়লো তাঁর। মফঃস্বল শহরের নিস্তরঙ্গ জীবনে সেই সন্ধ্যাটি বেশ বড়ো রকমের একটি ঢেউ তুলেছিলো সেদিন। বাংলাদেশের একজন বহুমান্য অতিথি তাদের ঘরে পদার্পণ করেছিলেন। পরমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, তোমার সঙ্গেই দেখা করতে এলাম।

আমার সঙ্গে! পরমা উত্তেজনায় বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন। এর চেয়ে আশ্চর্য ঘটনা আর কী হতে পারে!

আমার অনুমান যদি মিথ্যে না হয়, তা হলে তুমিই নিশ্চয় দিলদারের ছাত্রী?

পরমা নিঃশব্দে মাথা নাড়লেন।

দিলদার আমার বন্ধু। জানো তো গানটান ছেড়ে সে কোথায় কোন্ আশ্রমে সাধনা করতে চলে গেছে।

শুনেছি।

খুব দুঃখের কথা, তাঁর মতো একজন গুণবান মানুষের এভাবে নিষ্ক্রমণ— না না এটা সে ঠিক করেনি, না।

ভীষণ আপত্তির সঙ্গে মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, তার কাছে আমি তোমার কথা অনেক শুনেছি, তার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মনে হয় তুমিই সকলের চেয়ে বেশি প্রিয়। তার ধারণা, যোগ্য শিক্ষা পেলে ঠুংরিতে তোমার কোনো জুড়ি থাকবে না।

পরমা কুণ্ঠিত হলেন।

আমি মাত্র কাল এ শহরে এসেছি, সাতদিন থাকবো, এই সাত দিনের মধ্যে আজকের সন্ধ্যা ছাড়া আমার হাতে আর একটি দিনও অবশিষ্ট নেই। আজও বলতে গেলে লুকিয়ে পালিয়ে এই ছেলেটির সাহায্যে চলে এলাম—

সঙ্গের অল্পবয়সী যুবকটির দিকে তিনি ফিরে তাকালেন, এ তোমার খুব অ্যাডমায়ারার, কী বলো ইয়ুসুফ?

ইয়ুসুফ হাত কচলে হাসলো।

আমি শুনেছি, তোমাদের এই শহর গানের শহর, অলিতে গলিতে সব গাইয়েরা থাকেন, আমি যে গান-পাগল মানুষ, তা দিলদার জানে, সে আমাকে আরো দুটো ঠিকানা দিয়ে দিয়েছে, জানি না শেষ পর্যন্ত সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করে উঠতে পারবো কি না—তা না পারি, তার বিশেষ ছাত্রীটির সঙ্গে যে দেখা করা গেল সেটাও মন্দ নয়। বলাই বাহুল্য, শুধু মাত্র দেখা করা নয়, গান শুনতেও এসেছি। সরল চোখে তাকিয়ে হাসলেন।

মা বাবা এমন মানুষের পদার্পণে নিজেদের যথেষ্ট সম্মানিত মনে করছিলেন, মেয়ের গান শুনতে চাওয়ায় একেবারে বিগলিত হয়ে গেলেন।

বসে গেল আসর, জমে গেলো আড্ডা, দেখতে দেখতে কখন রাত দশটা বেজে গেলো। যাবার মুখে বললেন, জানতাম তোমার বয়েস খুব কম, কিন্তু এতো কম জানতাম না। জানতাম তুমি ভালো গান করো, এতো ভালো জানতাম না। মাথায় হাত রেখে আদর করলেন তিনি। চলে গেলে সবাই বললো, মানুষ তো নয়, যেন দেবতা। সাধে কি আর এতো বড়ো হয়েছেন? পিসতুতো ভাই সন্তোষ বললো, মাত্র বত্রিশ বছর বয়েস, এরই মধ্যে পাঁচবার জেল খেটেছেন, তিন মাস সেলে থেকেছেন, ডেটিনিউ ছিলেন এক বছর—ব্রিটিশ সরকারকে একেবারে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ছেন না?

পরমার ঘুম পেয়েছিলো, ঘুমিয়ে পড়লেন।

কিন্তু গানের নেশায় দুদিন বাদে আবার তিনি এলেন। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, তোমাদের শাকচির রাজবাড়িতে আজ চায়ের নেমন্তন্ন ছিলো, উঃ কন্যা দুটির মার্গ সঙ্গীতে আমার জান প্রাণ একেবারে জর্জরিত হয়ে গেছে। আগে এক গ্লাশ জল দাও, তারপর কান জুড়োও।

এই কান জুড়োতেই তিনি আবারো এলেন, তারপর আবার, আবার।

কথা ছিলো সাত দিন থাকবেন, কিন্তু যাবার তারিখ রোজই পিছোতে লাগলো। তারপর বললেন, নাঃ, আর নয়, এই বিষ্যুৎবার আমি যাবোই যাবো। আবার সব কাজকর্ম পণ্ড হতে বসেছে। সব এই মেয়েটার জন্য, সব। হাতের মুঠোয় হাত নিয়ে খুব ঝাঁকানি দিলেন। তেরো বছরের পরমা সেই বত্রিশ বছর বয়সের সারা বাংলা বিখ্যাত মানুষটির এই সহজ সরল উক্তির এবং স্পর্শের মধ্যে বিদ্যুতের সংঘর্ষ অনুভব করলেন।

তারপরে সেই নির্ধারিত বিষ্যুৎবারেও দেখা গেল তিনি যাননি। বাড়ির লোকেরা অকৃত্রিমভাবে খুশি হয়ে উঠে বললেন, তা হলে আছেন?

আছি। হাত রাখলেন পরমার কাঁধে, কী পরমেশ্বরী, সুখি না দুঃখিত?

পরমা জবাব দিলেন না। লজ্জিত ভঙ্গিতে চোখ নামালেন!

এই করে করে একমাস চলে গেল, ততোদিনে প্রায় ঘরের মানুষ হয়ে গেছেন, বলতে গেলে অধিকাংশ সময়ই কাটান তাঁদের সঙ্গে। একাই একশো হয়ে তুলনাহীন এক আনন্দময় অস্তিত্বে ভরে রাখেন সারা বাড়ি। বাড়ির সব কটি মানুষের প্রতিই তাঁর সমান মনোযোগ, এমন কি তা থেকে বাড়ির রাঁধুনি ননীবালাও বাদ পড়ে না। তবু সব কিছুর উপরে আসল আসক্তির কেন্দ্র-বিন্দুটি যে পরমা, মানুষটি যে তাঁর খ্যাতি, অখ্যাতি, ভালো মন্দ, এবং উদ্দামতা সব সংহত করে তাঁর আদ্ধেকেরও কম বয়সী সেই মেয়েটির পায়েই ঢেলে দিয়েছেন এ সত্য উপলব্ধি করে পরমা শিহরিত হন। তাঁর কাঁচা ভীরু অপ্রস্তুত মন এক আশ্চর্য সুখ এবং সংবেদনে থরথর করতে থাকে। বুঝে উঠতে পারেন না এই ভীষণ দানের তিনি কী প্রতিদান দেবেন।

কিন্তু ঘুম ভাঙতে ভাঙতেই একদিন সেই মানুষটি কাউকে কিছু না বলে আবার ফিরে গেলেন। যাঁর অতিথি হয়ে ছিলেন, তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে খোঁজ নিতে এসে পরমাদেরও কম উদ্বিগ্ন করলেন না। বললেন, নিশ্চয়ই পুলিসে ধরেছে, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের জন্য যা ধরপাকড় চলেছে শহরে! ওঁর পেছনে তো টিকটিকি লেগেই আছে বারোমাস।

শুনে পরমা কেঁদে ফেললেন। কয়েকদিন যে কী মন খারাপ হয়ে থাকলো। তারপর যখন প্রায় শান্ত হয়ে এলেন, তখন চিঠি পেলেন একটি—

পরমেশ্বরী শোনো, বিদায় নিয়ে না আসার জন্য রাগ করো না। ওই বিদায়-টিদায় নিতে গেলে আর জীবনে ফিরে আসতে পারতাম না। কয়েকটা দিন তোমার সংস্পর্শে ভারি সুন্দর এক পবিত্র সংবেদে সময় কেটেছে। আমি সেজন্য কৃতজ্ঞ। কিন্তু কার প্রতি? তোমার না ঈশ্বরের? ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

আসলে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর এক আকর্ষণে জড়িয়ে পড়ছিলুম বলেই পালিয়ে এলাম। আমি বড়ো অস্থির চরিত্র, আমাকে কোনো রকমেই নিষ্ঠাবান লোক বলা চলে না, কিন্তু নিষ্ঠার যে কী স্বাদ তা আমি অনুভব করেছি। আপাতত সে নিষ্ঠা একটি জায়গায় বন্ধক রেখে আসার দরুন আমার নিজস্ব কর্মকাণ্ডে ঠিক আগের মতো উন্মাদ আগ্রহে ঝাঁপিয়ে পড়া যাচ্ছে না, তাই কিছুকালের জন্য দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছি। আশা করছি, হারানো সম্পদ ঠিকই আবার হাতের মুঠোয় পেয়ে যাবো। ভালো থেকো। মা বাবা কেমন আছেন? তুমি—

দিদান—

উঁ—

কী ভাবছো এতো?

ভাবছিলাম নাকি?

আবার জিজ্ঞেস করছো?

পিছু হেঁটে হেঁটে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম যে—

কতো দূরে ?

পরমা হাসলেন, প্রায় পূর্বজন্মে।

কী দেখলে ?

সব ঝাপসা।

বলো না—

তুমি কী বলছিলে সেটা শেষ করো দেখি।

আমি ? কী বলছিলাম ? বুঝেও না বোঝার ভান করলো উজ্জয়িনী।

পরমা বললেন, সেই কুড়ি বছরের বড়ো একজন বন্ধু—

না, আর বলবো না। থেমে, হেসে আচ্ছা বলি, কানের কাছে মুখ এনে এই যে সুমনকাকা আমাকে এতো ভালোবাসেন, আর আমার তাঁকে এতো ভালো লাগে, এর নামই কি সত্যিকারের ভালোবাসা ?

পরমা স্পষ্ট করে বললেন, না।

তবে এটা কী ?

এটা তোমার গন্তব্যে পৌঁছুবার অনেকগুলোর মধ্যে একটা তীরক্ষেপ।

তারপর ?

তারপর একদিন আসল তীরন্দাজকে চিনতে পারবে।

তুমি পেরেছিলে ?

পারিনি ! বলতে বলতেই একটা অকথা কষ্টে বুক ভরে গেল পরমার, চোখ ছাপিয়ে জল এলো।

তাকিয়ে উজ্জয়িনীর বুকের ভিতরটাও মুচড়ে উঠলো সমান কষ্টে। দিদান তাঁর জীবনে যে কেমন তীরন্দাজ চিনে নিয়েছিলেন তা কি সে জানে না ? কী বোকার মতো প্রশ্ন করেছে ? কিন্তু ম্যাজিকের মতো কোথায় চলে গেল সেই অব্যর্থ তীরন্দাজ ! কোথায় ? মানুষ কোথায় যায় ? কেন যায় ? কেন ? কেন ? দু হাতে দিদিমাকে জড়িয়ে ধরে সেও ব্যাকুল কান্নায় ফুঁপিয়ে উঠলো।